তীর্থ পরিচয়

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

নবপত্র প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ ঃ ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮

প্রকাশক ঃ প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট / কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক ঃ সুরেন্দ্রনাথ দাস
বাণীরূপা প্রেস
৯এ মনমোহন বসু স্ট্রীট / কলিকাতা-৭০০০০৬

আলোকচিত্র ঃ লেখক ও ডক্টর সীতাংশু মিত্র

প্রচ্ছদ ঃ সুবোধ দাশগুপ্ত

কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সংপদ্যতে চরন্॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি।

—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭. ১৫. ৪

ঘুমিয়ে থাকার নামই কলিকাল,
ত্রেতায় মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়ায়,
দ্বাপর হল জেগে থাকার নাম,
সত্য যুগে চলার গান গায়—
এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

এই লেখকের লেখা

ছোট গল্প

অয়ি অবগুণ্ঠনে, কী মায়া, গল্প শুধু গল্প

●

ভ্রমণের গল্প

সুন্দর নেহারি, কেরালার উপকূলে

●

ভ্রমণ কাহিনী

তীর্থের পথে, রূপমতীর দেশে, কানাড়া দেখা হল না

●

ভ্রমণ সঙ্কলন

শ্রীসুষমা চক্রবর্তীর সহযোগিতায়

শতবর্ষের পথযাত্রা

●

ভ্রমণ উপন্যাস

মণিপদ্ম, তুঙ্গভদ্রা, একজন লামা ও মানস সরোবর, আরও আলো, কুটিল কুমায়ুন,

কাশ্মীরী বাহার, তিন পাহাড়, অন্য এক দেশ

●

ব্যঙ্গ উপন্যাস

কুম্ভীপাক বীক্ষা

●

উপন্যাস

রূপম ? সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত, একটি আশ্বাস, জনম জনম, মেঘ, কল্কির বাচ,

আয় চাঁদ, তারার আলোর প্রদীপখানি, বাঁধ ভেঙে দাও, মৌন মন,

তারা ভেসে চলেছে, চোখের আলোয় দেখেছিলেম, একটি

নাটক নিয়ে, তিনজন নায়িকা (যন্ত্রস্থ)

●

ছোটদের জন্য

আমাদের দেশ

উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মহিশূর ও তামিলনাড়ু

●

শাশ্বত ভারত

দেবতার কথা, ঋষির কথা, অসুরের কথা, উপদেবতার কথা, তীর্থের কথা,

●

বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, কল্কি পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, দেবী ভাগবত (যন্ত্রস্থ)

●

কোথায় ঈশ্বর

●

রুম্যানি বীক্ষা

সূচীপত্র

অবতরণিকা

তীর্থ

তীর্থ-যাত্রার পূর্বে তীর্থ শব্দটির অর্থ জানা দরকার। সংস্কৃত তৃ ধাতুর মানে উত্তীর্ণ হওয়া। তরতি পাপাদিকং যস্মাৎ: যা পাপাদি থেকে উত্তীর্ণ করে তারই নাম তীর্থ। যজুর্বেদের একটি মন্ত্রে আছে: নমস্তীর্থায় চ। এই তীর্থ হলেন ভগবান। অথর্ব বেদে আমরা একটি সুন্দর শ্লোক পাই:

দিবং ব্রূমো নক্ষত্রাণি ভূমিং যক্ষাণি পর্বতাম।
সমুদ্রানদ্যো বেশন্তাস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ॥

হে ঈশ্বর, তুমি এই পুণ্যক্ষেত্র পৃথিবীর বুকে বাস কর, পর্বতে, সমুদ্রে, নদী ও সরোবরে আছ অধিষ্ঠিত, তাই আমি এ সবের স্তব করি। তুমি সর্বব্যাপী বলে যদি না জানতাম, তাহলে এ সবের স্তব করতাম না। তুমি আমাদের পাপমুক্ত কর, বিশুদ্ধ কর মন।

কিন্তু তার আগে নিজেকে জানা দরকার। কুলার্ণব তন্ত্রে আছে: আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং মুক্তির্বরাননে। শিব পার্বতীকে বলছেন, বরাননে, আত্মতীর্থ না জানলে মুক্তি আসবে কোথা থেকে!

নানা দিক বিচার করে তীর্থকে ত্রিবিধ বলা হয়েছে: জঙ্গম, মানস ও স্থাবর। জঙ্গম শব্দের অর্থ সতত গতিযুক্ত, গতিশীল।

ব্রাহ্মণা জঙ্গমং তীর্থং নির্মনং সর্বকামিকং।
যেষাং বাক্যোদকেনৈব শুদ্ধ্যন্তি মলিনাঃ জনাঃ॥

জগতে ব্রাহ্মণেরা হলেন জঙ্গম তীর্থ। ব্রাহ্মণের বাক্যোদকে মলিনজন পবিত্র হয়। মানস তীর্থ হলো মানুষের মন। কাশীখণ্ডে আছে:

সত্যং তীর্থং ক্ষমা তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
তীর্থানামপিতত্তীর্থং বিশুদ্ধির্মনসঃ পরা॥

শুধু তপস্যা ব্রহ্মচর্য ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ নয়, সত্য ক্ষমা ধৈর্য জ্ঞানদান দয়া ও প্রিয়বাদিতাও মানস তীর্থ। পদ্ম পুরাণে আছে :

ইন্দ্রিয়াণি বশে কৃত্বা যত্রতত্র বসেন্নরঃ।
তত্র তস্য কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগং পুষ্করং তথা॥

এই জন্যেই কুলার্ণব তন্ত্রে আছে : ইদং ইদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ। তমো ভাবাপন্ন মানুষেই নানা তীর্থে ছুটোছুটি করে বেড়ায়। তাই কবীর বলেছেন :

দূর খেলন্ মৎ জাও ভইয়া, দূর খেলন্ মৎ জাও।
ঘট্ হি মে গঙ্গা, ঘট্ হি মে যমুনা, ঘট্ হি মে নাহাও॥

ওবে ভাই, দূরে খেলতে যাবার কোন দরকার নেই। ঘটেই আছে গঙ্গা-যমুনা, ঘটের জলেই তুমি স্নান কর।

একই কথা বলেছেন শঙ্করাচার্য : যা কাশিকাহং নিজবোধ রূপা। কাশ্ ধাতুর অর্থ প্রকাশ। তাই আত্মবোধই কাশী।

তীর্থ বলতে আমরা যা বুঝি, তা হলো স্থাবর তীর্থ। কাশীখণ্ডে আছে :

প্রভাবাদদ্ভুতাদ্ ভূমেঃ সলিলস্য স তেজসঃ।
পরিগ্রহাণ মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতা॥

ভূমি সলিল ও তেজের অসাধারণত্ব এবং মুনিদের বাসস্থানই পুণ্যতীর্থ বলে গণ্য হয়েছে।

হিন্দুধর্ম

তীর্থের সঙ্গে ধর্মের একটা ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র আছে। তীর্থ মানেই ধর্মাচরণের স্থান। ধর্ম শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো, যা ধারণ যা পোষণ করে। মানুষেব গুণ বা নৈতিক চরিত্র অর্থেও এই শব্দের ব্যবহার আছে। কিন্তু সাধারণভাবে ধর্ম বলতে আমরা রিলিজিয়ন বুঝি—ঈশ্বর, দেবতা, তাঁদের পূজা-উপাসনা। পাপ-পুণ্য, ইহলোক-পরলোক। সামাজিক জীবনযাত্রার নিয়ম-কানুন—এ সবই ধর্মের অঙ্গ। দেশে দেশে যুগে যুগে এই ধর্মের ব্যাখ্যা বদল হয়েছে। কখনও ঈশ্বরের অবতার এই ধর্মের প্রবক্তা, কখনও ঈশ্বর কোন মানুষকে প্রেরণ করেছেন ধর্মের ব্যাখ্যার জন্য, কখনও বা কোন ঋষি মহাপুরুষ বা সিদ্ধপুরুষ এই কাজ করেছেন।

বেদের ঋষিরা বলেছেন : পৃথিবীং ধর্মনা ধৃতাং। ধর্মই পৃথিবীকে ধারণ

ধরে আছে । [illegible] যে সব গুণের অধিকারী [illegible] কল্পনা থেকে বেদের ঋষিরা ধর্মের লক্ষণ নির্ধারণ করেছিলেন—

সত্যং বৃহদ্ ঋতম্ উগ্রং
দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তি
যা নো ভূতস্য ভব্যস্য পত্ন্যুরুং লোকং
পৃথিবী নঃ কৃণোতু ॥

এটি অথর্ব বেদের শ্লোক। সহজ ভাষায় এর মানে হলো, পৃথিবীকে ধারণ করে আছে বৃহৎ সত্য, উগ্র মত, দীক্ষা, তপ, ব্রহ্ম বা প্রার্থনা এবং যজ্ঞ। আমাদের অতীত ও ভবিষ্যতের পত্নী সেই পৃথিবী আমাদের জন্য একটি প্রশস্ত বিশ্ব রচনা করুন।

এক ঈশ্বরকেই আমরা নানা রূপে দেখি। ঈশ্বরের কল্পনা এমন বিশাল একজনকেই অনেক রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এ কথার ধারণা আছে ঋগ্বেদে :

একং সৎ বহুধা বদন্তি।

অথর্ব বেদেও এই রকম কথা আছে :

সবিতা সত্য ধর্মা।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের মধ্যেই এই সত্য নিহিত আছে। আর এই সত্যকেই ঋষিরা নানা নাম দিয়েছেন।

কবয়ঃ একম্ সন্তম্ বহুধা কল্পয়ন্তি।

এ শুধু হিন্দুধর্মের কথা নয়, সমস্ত ধর্মেই আছে ঈশ্বরের সম্বন্ধে একটা গভীর উপলব্ধির কথা। সেই উপলব্ধি থেকেই ধর্ম সম্বন্ধে একটি ধারণার জন্ম হয়েছে।

অন্যান্য ধর্ম

ভারত একসময়ে হিন্দুর দেশ ছিল। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বর্ধমান মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ এই ভারতে জন্মগ্রহণ করে তাঁদের নূতন ধর্ম প্রচার করেছিলেন বিশ্বে। অগণিত হিন্দু সেদিন সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম। যীশুখ্রীষ্ট ও হজরত মহম্মদের জন্ম বিদেশে। তাঁদের প্রবর্তিত খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্ম বিদেশ থেকে ভারতে এসেছে। পার্সিরাও তাদের ধর্ম এনেছে বিদেশ থেকে। আবার অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে

গুরু নানক থেকে গুরু গোবিন্দ সিংহ পর্যন্ত দশজন গুরু যে খাল্‌সা বা শিখ ধর্মের প্রবর্তন করেন, তার জন্ম ভারতের মাটিতেই। এই কারণেই তীর্থের কথা বলতে হলে প্রথমে হিন্দু তীর্থের কথা বলতে হয়, তারপরে জৈন, বৌদ্ধ ও শিখ তীর্থের কথা। পার্সী, খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মেরও অনেক পবিত্র স্থান এ দেশে আছে এবং সেগুলিও উপেক্ষা করবার মতো নয়। তাই সকল তীর্থের কথাই এই গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।

হিন্দু দেবদেবী

অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের বিশেষ পার্থক্য হলো হিন্দুরা এক ঈশ্বরে সন্তুষ্ট না হয়ে তেত্রিশ কোটি দেবতার কাহিনী রচনা করেছে। পুরাণে এই সব দেবদেবীর সবিস্তার বর্ণনা আছে এবং বহু পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে আমরা শৈশব থেকেই পরিচিত। তীর্থ দর্শনে বেরোতে হলে মুখ্য দেবদেবীর প্রাথমিক পরিচয় ও কিছু পৌরাণিক কাহিনী আমাদের জানা থাকা খুবই প্রয়োজন। তা না হলে অনেক সময়েই কিছু বাধার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন, বৈদ্যনাথধামের মন্দির দর্শনে গেলে পাণ্ডা বলবেন, বৈদ্যনাথধাম হৃদয় পীঠ, দেবী জয় দুর্গা ও বৈদ্যনাথ তাঁর ভৈরব। কিংবা কেরালার কোন মন্দিরে শোনা যাবে, হরিহরসুত সস্তার মূর্তি।

প্রধান দেবদেবীর সংখ্যা বেশি নয়। ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ত্রিমূর্তিতে প্রকাশিত। তিনি ব্রহ্মা রূপে সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু রূপে পালন করেন এবং সংহার করেন শিব রূপে। খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে ভারতে ব্রহ্মার পূজা সীমাবদ্ধ এবং তাঁর মন্দির বিরল। একমাত্র পুষ্করেই ব্রহ্মার মন্দির সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। বিষ্ণু ও শিব সর্বত্র সমান আদৃত। কোথাও বিষ্ণুর প্রাধান্য, কোথাও শিবের। ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মী বিষ্ণুর স্ত্রী, তাঁদের পুত্র কন্যা নেই। শিবের পত্নী সতী তাঁর পিতা দক্ষের যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগ করে পরজন্মে হিমালয় কন্যা পার্বতী নামে পুনরায় শিবকে বিবাহ করেন। তাঁর পুত্র গণেশ সিদ্ধিদাতা এবং কার্তিক দেবসেনাপতি। পার্বতীর নামই অন্নপূর্ণা, দুর্গা নামেও ইনি পূজিতা। সাধারণভাবে লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গার দুই কন্যা। কিন্তু পুরাণের মতে লক্ষ্মী ভৃগু মুনির কন্যা। সরস্বতী কোথাও ব্রহ্মার, কোথাও বা বিষ্ণুর পত্নী। আসলে তিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

বিষ্ণুর অন্য নাম নারায়ণ। গৃহস্থের ঘরে নারায়ণ শিলার উপরে তাঁর

পূজা হয়, কিন্তু মন্দিরে তাঁর চতুর্ভুজ মূর্তি। কিন্তু শিবের পূজা সর্বত্র হয় পাথরের লিঙ্গের উপরে। দক্ষিণ ভারতের অনেক মন্দিরে নটরাজ শিবের মূর্তিও দেখা যায়। দেবী দুর্গা কোথাও অষ্টভুজা, কোথাও বা দশভুজা। কালী, তারা প্রভৃতি তাঁরই ভিন্ন রূপের নাম। কালী মূর্তির পূজাই সর্বাধিক প্রচলিত। গণেশ বা বিনায়ক সিদ্ধিদাতা দেবতারূপে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সসম্মানে পূজা পাচ্ছেন। কিন্তু কার্তিকের মন্দির উত্তর ভারতে বিরল এবং দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানে তিনি সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত আছেন। কার্তিকের সুব্রহ্মণ্য, বিশাখ, ষড়ানন, ষন্মুখম, মুরুগণ, প্রভৃতি নামে বিষ্ণু ও শিবের মতো তিনি সমান সম্মানের অধিকারী। পুরাকালে সূর্য পূজার প্রচলন ছিল। উড়িষ্যার কোণারকে, গুজরাতের মাধরায় ও কাশ্মীরের মার্তণ্ডে তার প্রমাণ আছে। অগ্নির উপাসনা করেন পার্সিরা। শনি ও শীতলার পূজাও প্রচলিত আছে। দক্ষিণ ভারতের কেরালা রাজ্যে হরিহরসুত সস্তা বা আইয়াপ্পাস একজন সর্বজনপূজ্য দেবতা। বিষ্ণুর মোহিনী স্ত্রীমূর্তির সঙ্গে শিবের মিলনের ফলে এই দেবতার জন্ম হয় সমুদ্র মন্থনের অব্যবহিত পরে।

এ ছাড়াও আরও অনেক দেবতার মন্দির আছে এই সুবিশাল দেশে। যথাস্থানে তাঁদের পরিচয় দেওয়া সম্ভব হবে।

দশাবতার

অবতার কথাটি এসেছে অবতরণ শব্দ থেকে। পৃথিবীর সঙ্কট কালে বিষ্ণু বারে বারে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর এইসব রূপের নাম অবতার। এ যাবৎ মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম ও বুদ্ধ এই নয়টি অবতার হয়ে গেছে। বাকি আছে দশম অবতার। বর্তমান কলি যুগের শেষপাদে তিনি কল্কি রূপে অবতীর্ণ হবেন। কল্কিপুরাণে সে কাহিনীও লেখা হয়ে আছে।

প্রথম কাহিনী মৎস্য অবতারের। কল্প দিয়ে পৌরাণিক কালের গণনা। বর্তমান কল্পের নাম শ্বেত বরাহ কল্প, শাসন বৈবস্বত মনুর। ইনিই সপ্তম মনু। প্রলয়ের পূর্বে ইনি দ্রাবিড় দেশে বিষ্ণুভক্ত রাজা ছিলেন। এই রাজা অযুত বর্ষ কঠিন তপস্যা করেছিলেন, প্রথমে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে, পরে অধোমস্তকে অনিমেষ নয়নে। একদিন যখন তিনি কৃতমালা বা তমসা নদীতে তর্পণ করছিলেন, তখন তাঁর অঞ্জলিতে একটি সফরী উঠল। এই পুঁটি মাছটির

প্রার্থনায় রাজা তাকে কলসীতে ভরে নিজের আশ্রমে নিয়ে এলেন।

একরাত্রে সেই মাছ এমন বড় হলো যে কলসীতে আর রাখা যায় না। রাজা তাকে কূপে বা মলিকচ্ছ জলে নিক্ষেপ করলেন। আরও বড় হলে রাজা তাকে সরোবরে নিয়ে গেলেন। সেখানে সে আরও বড় হলো। বিস্ময়াপন্ন রাজা তাকে এক জলাশয় থেকে অন্য জলাশয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে সমুদ্রে নিয়ে গেলেন। রাজার মনে তখন সংশয় জেগেছিল, বললেন, আমাকে তুমি ছলনা করছ কেন প্রভু?

মৎস্য স্বীকার করলেন যে তিনি নারায়ণ, মহাপ্রলয়ের সময়ে সৃষ্টি রক্ষার জন্য তাঁকে উপদেশ দিতে এসেছেন। বললেন, সাতদিন পরে প্রলয় পয়োধি জলে পৃথিবী হবে নিমগ্ন। তার আগে, হে রাজা, তুমি সমস্ত বীজ ওষধি প্রাণী মিথুন ও ঋষিদের নিয়ে একত্র হবে। প্রলয়ের জলে আমি একটি বিরাট নৌকা পাঠাব, তোমরা সেই নৌকায় আরোহণ করে আমার জন্য অপেক্ষা কোরো।

রাজা তাই করলেন। প্রলয়ের জলে যে নৌকা ভেসে এল, সকলের সঙ্গে রাজা তাতে উঠে বসলেন। তারপর শৃঙ্গযুক্ত সুবর্ণময় মহামৎস্যের আবির্ভাব হলো। রাজা মহাসর্পের রজ্জু দিয়ে মৎসের শৃঙ্গে নৌকা বাঁধলেন। মৎস্য হিমালয়ের দিকে উজিয়ে চলল। হিমালয়ের একটি শৃঙ্গ তখনও জলের উপরে জেগে ছিল। সেই শৃঙ্গে রাজা নৌকা বাঁধলেন। প্রলয়ের অবসানে দেখা গেল, তাঁরই নৌকায় সৃষ্টি রক্ষা পেয়েছে।

দ্বিতীয় অবতার কূর্ম। মৎস্য অবতারের মতো এ কোন প্রাকৃতিক মহাপ্রলয় নয়। এ দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনের কাহিনী। দুর্বাসা মুনি দেবরাজ ইন্দ্রকে শাপ দিয়েছিলেন। সেই শাপে লক্ষ্মী স্বর্গ ও ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করে পাতালে বরুণালয়ে নেমে যান। অসুররা পরাক্রান্ত হয়ে দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করে। দেবতারা ব্রহ্মাকে নিয়ে বিষ্ণুর কাছে গেলেন। বিষ্ণু বললেন, এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে সমুদ্র মন্থন করে অমৃত তুলতে হবে। প্রথমে সমস্ত ওষধি ক্ষীরোদ সাগরে নিক্ষেপ কর, মন্দর পর্বতকে কর মন্থনদণ্ড ও বাসুকীকে রজ্জু। তোমরা একদিকে ধর, অন্যদিকে অসুররা ধরুক। মন্থনের বেগে পৃথিবী যাতে রসাতলে না যায়, তার জন্য কূর্মরূপে আমি মন্দরকে ধারণ করব।

সমুদ্রমন্থনের জন্যই বিষ্ণুর কূর্ম অবতার। এই মন্থনে সমুদ্র থেকে যা উঠেছিল, তা আমাদের জানা।

বরাহ তৃতীয় অবতার। এই অবতারে বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষ বধ করেছিলেন, কিন্তু তাকে বধ করবার জন্য তিনি অবতার হন নি। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবী উদ্ধার। প্রথম মনু স্বয়ম্ভুর জন্মের পর তাঁর পিতা ব্রহ্মা তাঁকে আদেশ করেছিলেন, তুমি সংসারী হয়ে পৃথিবী শাসন কর।

কিন্তু পৃথিবী কোথায়! সমস্ত সৃষ্টি তো জলময়! ঠিক এই সময়ে ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র থেকে এক অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বরাহ বহির্গত হলো। আকাশে তার আকার হলো পর্বতপ্রমাণ বিরাট। বজ্রের মতো গর্জন করে উঠল বরাহ। পিতাপুত্র নিঃসংশয় হলেন যে বিষ্ণুই বরাহ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। বেদ আবৃত্তি করে ব্রহ্মা বরাহের স্তব করলেন। বরাহ আর একবার গর্জন করে সমুদ্রে প্রবেশ করল।

প্রলয় কালে যে পৃথিবী তাঁর কোলে ছিল, এখন তা রসাতলে। বরাহ সমুদ্রের একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত চিরে ফেলে দন্তাগ্রে পৃথিবীকে বাহির করল।

হিরণ্যাক্ষর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো এই সময়ে। হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু কশ্যপ ও দিতির দুই পুত্র। হিরণ্যাক্ষ বরাহের সঙ্গে যুদ্ধ প্রার্থনা করে নিহত হলো।

চতুর্থ নৃসিংহ অবতার হিরণ্যকশিপু বধের জন্য। ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদে শোকার্ত হয়ে হিরণ্যকশিপু কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছে বর লাভ করলেন। ব্রহ্মার সৃষ্ট কোন প্রাণীর হাতে তাঁর মৃত্যু হবে না, দিবসে রাত্রিতে না, জলে স্থলে অন্তরীক্ষেও না। বিষ্ণুকে তিনি পরম শত্রু জ্ঞান করলেন। অথচ তাঁর পুত্র প্রহ্লাদ হলো বিষ্ণুভক্ত। প্রহ্লাদকে বধ করবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর হিরণ্যকশিপু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে তোমাকে বারে বারে রক্ষা করে? প্রহ্লাদ সংক্ষেপে বলল, হরি। হরি একটি স্ফটিক স্তম্ভের মধ্যেও আছেন শুনে তিনি সেই স্তম্ভটি ভেঙ্গে দেখলেন।

কী আশ্চর্য! ভক্তের ভগবান সেই স্তম্ভ থেকেই বেরিয়ে এলেন। ব্রহ্মার সৃষ্ট কোন প্রাণী নয়, মানুষ নয়, দেবতাও নয়। অভূতপূর্ব নরসিংহ মূর্তি, নরদেহে সিংহের মুখ। তখন দিবস নয় রাত্রিও নয়, সায়াহ্নের অন্ধকারে সংগ্রাম শুরু হলো। নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুকে নিজের উরুর উপরে ফেলে নখ দিয়ে তাঁর কুক্ষি বিদীর্ণ করে বধ করলেন।

প্রহ্লাদের পৌত্র বলিকে শাসনের জন্য বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার। তার

নাম বামন অবতার। বেশি ভালো হয়ে বলি, দেবতাদের বিদ্বেষের পাত্র হয়েছিলেন। বিষ্ণু কশ্যপ-অদিতির পুত্র হয়ে জন্মালেন বামন রূপে। উপনয়নের পরে তিনি বলির নিকটে এলেন দান নিতে। মাত্র ত্রিপদ পরিমিত জমি পেলে তিনি সেখানে ছত্রদণ্ড রেখে তপস্যা করবেন। দৈত্য গুরু শুক্র বললেন, এই বামন বোধহয় ছলনা করতে এসেছেন। কিন্তু বলি নির্ভয়ে বললেন, আমি সত্য পালন করব।

তারপর বামন হলেন এক বিরাট পুরুষ। সমস্ত বিশ্বব্যাপী তাঁর অবয়ব। এক পা তিনি উর্ধ্বলোকে রাখলেন, আর এক পা অধোলোকে। তারপর নাভিদেশ থেকে তৃতীয় পদ বার করে বললেন, এই পা কোথায় রাখব বলো। বলি বললেন, আপনার ঐ পা আমার মাথায় রাখুন। বিষ্ণু হেসে বললেন, ধন্য তুমি। অধোলোক আমি তোমাকে ফেরৎ দিলাম, তুমি পাতালে বাস কর।

এর পরে পরশুরাম, রাম ও বলরাম। বলরাম ও কৃষ্ণ দুজনেরই জন্ম বিষ্ণুর অংশে। পরশুরাম কুঠার দিয়ে একুশবার ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করেছিলেন। রাম রাক্ষস বধ করেছিলেন এবং বলরাম ও কৃষ্ণ অনেক অসুর বধ করেছিলেন। অযোধ্যার রাম ও মথুরা-বৃন্দাবন-দ্বারকার কৃষ্ণও দেবতায় পরিণত হয়েছেন। বুদ্ধও অবতার। দশম অবতার কল্কি এখনও জন্মগ্রহণ করেন নি

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে এই অবতারবাদ জড়িত আছে। বিশ্বের জন্মকালে শুধু জল ছিল। তাই ঈশ্বরকে মৎস্য রূপে কল্পনা করা হয়েছে। সেই জল থেকে পৃথিবী যখন জাগছে, তখন ঈশ্বর দেখা দিলেন উভচর কূর্ম মূর্তিতে। পঙ্কিল পৃথিবীতে এল বরাহ। তারপর সিংহরূপী মানুষ ও বামন। পরশুরাম কুঠার হাতে নিয়ে পৃথিবীকে মনুষ্যবাসের উপযোগী করতে চেয়েছিলেন শত্রুনিপাত করে, রামের জন্ম রাক্ষস বধের জন্য। তারপর হলধারী বলরাম কৃষিকর্ম শেখালেন হলকর্ষণ করে এবং কৃষ্ণ আধ্যাত্মিক চিন্তার সূত্রপাত করলেন গীতা রচনা করে। বুদ্ধের অহিংসা ধর্মকেও আমরা গ্রহণ করলাম।

দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে এই সব অবতারের মন্দির আছে।

দশ মহাবিদ্যা

বিষ্ণু যেমন দশ অবতার রূপে পৃথিবীতে এসেছিলেন, শিবের পত্নী সতী

তেমনি দশ মহাবিদ্যার রূপ ধারণ করেছিলেন। এই সব রূপের নাম কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা। এই সমস্ত রূপেই দেবীর পূজা হয়।

সতী কেন এই সব রূপ ধারণ করেছিলেন তার একটি পৌরাণিক কাহিনী আছে। সতী ছিলেন দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। দক্ষ এক যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। তাতে বিশ্ববাসীকে নিমন্ত্রণ করলেন, সংবাদ দিলেন না শুধু তাঁর কন্যা ও জামাতা শিবকে। তার কারণ ছিল। একদা বিশ্বস্রুজের সত্রে দেবতা ও ঋষিরা সমবেত হয়েছিলেন। দক্ষ যখন সেই যজ্ঞে এলেন, দেবতা ও ঋষিরা সবাই উঠে দাঁড়ালেন। বসে রইলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। শিব তাঁর জামাতা হয়ে তাঁকে সম্মান করলেন না দেখে অহংকারী দক্ষ শিবকে গালাগালি করে বললেন, দেবতাদের সঙ্গে শিব আর যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করতে পারবেন না। কিন্তু শিবহীন যজ্ঞ করার সাহস কারও হলো না বলে যজ্ঞ করাই বন্ধ হয়ে গেল। তাই দেখে দক্ষ নিজেই শিবহীন বৃহস্পতি যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন।

দেবর্ষি নারদের মুখে এই সংবাদ পেয়ে সতী বাপের বাড়ি যাবার জন্য স্বামীর অনুমতি চাইলেন। কিন্তু শিব বললেন, বিনা নিমন্ত্রণে যাওয়া চলে না। শিব যখন কিছুতেই সম্মত হচ্ছেন না, সতী তখন কালী মূর্তি ধারণ করলেন। সেই করাল মূর্তি দেখে ভীত শিব পালাবার চেষ্টা করতেই বাধা পেলেন দশ দিক থেকে—দশ মূর্তিতে সতী শিবকে ঘিরে দাঁড়ালেন। কোন দিকে সুন্দরী ষোড়শী মূর্তি, কোন দিকে কালীতারা ছিন্নমস্তার মতো ভয়ঙ্কর মূর্তি। এই দশ মহাবিদ্যার রূপে বিহ্বল হয়ে শিব বললেন, আমাকে আর ভয় দেখিও না, তুমি যেখানে খুশি যাও।

এর পরে সতী এলেন দক্ষালয়ে। আর তাঁকে দেখেই দক্ষ শিবকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে লাগলেন। স্বামীর নিন্দা সইতে না পেরে সতী দুঃখে ও অপমানে দেহত্যাগ করলেন এবং নারদ ছুটে গিয়ে শিবকে সেই মর্মান্তিক সংবাদ দিলেন। ক্রুদ্ধ ও শোকার্ত শিব মাথার একটি জটা ছিঁড়ে মাটিতে ফেলতেই সেই জটা থেকে বীরভদ্রের জন্ম হলো! বীরভদ্র দক্ষালয়ে গিয়ে দক্ষযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করে দিলেন।

পীঠস্থান

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের ললিতোপাখ্যানে 'পঞ্চাশৎ পীঠরূপিণী' এই উল্লেখ থেকে

প্রথমে পঞ্চাশ ও পরে একান্ন মহাপীঠ ও ছাব্বিশ উপপীঠের কল্পনা করা হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে বৌদ্ধ ও অনার্য তীর্থগুলিকে উপপীঠ বলে বা কোন উপাখ্যান রচনা করে হিন্দুর পবিত্র তীর্থে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

কিন্তু এই সব পীঠস্থান নিয়ে নানা মত প্রচলিত আছে। তন্ত্র চূড়ামণি নামক গ্রন্থে ঠিক একান্নটি পীঠস্থানের নাম, সতীর অঙ্গ, শক্তি ও ভৈরবের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু দেবী ভাগবতে একশো আটটি পীঠের উল্লেখ দেখা যায়। বিদ্রূপিনী সতীকে চিতায় দগ্ধ হতে দেখে শিব তাঁর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে নানা দেশ ভ্রমণ করতে লাগলেন। তাই দেখে দেবতারা চিন্তিত হলেন এবং বিষ্ণু সেই দেহের অঙ্গচ্ছেদ করতে লাগলেন। যেখানে সেই সব অঙ্গ পড়ল শিব সেখানে নানা মূর্তি ধারণ করে দেবতাদের বললেন, এই সব স্থানে যাঁরা সতী বা শক্তির আরাধনা করবেন, তাঁদের দুর্লভ কিছু থাকবে না।

তন্ত্র চূড়ামণির মতো দেবী ভাগবতে কোন পীঠস্থানের উল্লেখ না দেখে জন্মেজয় বেদব্যাসকে এই প্রশ্ন করেছিলেন। বেদব্যাস তাঁকে একশো আটটি পীঠস্থান ও দেবীর নাম দিয়েছিলেন।

কুব্জিকা তন্ত্রেও আমরা অনেকগুলি পীঠস্থান ও অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম পাই। তার সংখ্যা একশো আঠাশ। এর পরে আরও ছাব্বিশটি নাম পাওয়া যায়।

পরিতাপের বিষয় যে এই সব নামের মধ্যে কোন ঐক্য নেই। সব-গুলিকে পীঠস্থান বলে মানতে হলে সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে। কিন্তু শিবচরিত নামে একখানি গ্রন্থে এই সব নামের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হয়েছিল এবং এরই ফলে পীঠস্থানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাতাত্তর, তার মধ্যে একান্নটি মহাপীঠ ও উপপীঠ ছাব্বিশটি।

শিবচরিতের মতে পীঠস্থানের পূর্ণ বিবরণ নিচে দেওয়া হলো :

মহাপীঠ

সতীর অঙ্গ	পীঠস্থানের নাম	দেবীর নাম	ভৈরবের নাম
১। ব্রহ্মরন্ধ্র	হিঙ্গলা	কোট্টরী	ভীমলোচন
২। ত্রিনেত্র	সর্কর	মহিষমর্দিনী	ক্রোধীশ
৩। নেত্রাংশ তারা	তারা	তারিণী	উন্মত্ত
৪। বামকর্ণ	করতোয়া তট	অপর্ণা	বামেশ

সতীর অঙ্গ	পীঠস্থানের নাম	দেবীর নাম	ভৈরবের নাম
৫। দক্ষিণ কর্ণ	শ্রীপর্বত	সুন্দরী	সুন্দরানন্দ
৬। নাসিকা	সুগন্ধা	সুনন্দা	ত্র্যম্বক
৭। মনঃ	বক্রনাথ	পাপহরা	বক্রনাথ
৮। বাম গণ্ড	গোদাবরী	বিশ্বমাতৃকা	বিশ্বেশ
৯। দক্ষিণ গণ্ড	গণ্ডকী	গণ্ডকী চণ্ডী	চক্রপাণি
১০। উর্ধ্ব দন্ত	অনল	নারায়ণী	সংক্রুর
১১। অধো দন্ত	পঞ্চসাগর	বারাহী	মহারুদ্র
১২। জিহ্বা	জ্বালামুখী	অম্বিকা	বটকেশ্বর বা উন্মত্ত
১৩। কণ্ঠ	কাশ্মীর	মহামায়া	ত্রিসন্ধ্যা
১৪। গ্রীবা	শ্রীহট্ট	মহালক্ষ্মী	সর্বানন্দ
১৫। ওষ্ঠ	ভৈরব পর্বত	অবন্তী	নম্রবর্ণ
১৬। অধর	প্রভাস	চন্দ্রভাগা	বক্রতুণ্ড
১৭। মর্ম	প্রভাস খণ্ড	সিদ্ধেশ্বরী	সিদ্ধেশ্বর
১৮। চিবুক	জনস্থান	ভ্রামরী	বিকৃতাক্ষ
১৯। দ্বিহস্তাঙ্গুলি	প্রয়াগ	কমলা	বেণীমাধব
২০। বাম হস্তার্ধ	মানসরোবর	দাক্ষায়ণী	হর
২১। দক্ষিণ হস্তার্ধ	চট্টগ্রাম	ভবানী	চন্দ্রশেখর
২২। বাম স্কন্ধ	মিথিলা	মহাদেবী	মহোদর
২৩। দক্ষিণ স্কন্ধ	রত্নাবলী	শিবা	শিব বা কুমার
২৪। বাম মণিবন্ধ	মণিবন্ধ	গায়ত্রী	শঙ্কর বা সর্বান
২৫। দক্ষিণ মণিবন্ধ	মণিবেদ	সাবিত্রী	স্থাণু
২৬। বাম কনুই	উজানি	মঙ্গলচণ্ডী	কপিলাম্বর
২৭। দক্ষিণ কনুই	রণখণ্ড	বহুলাক্ষী	মহাকাল
২৮। বাম বাহু	বহুলা	বহুলা	ভীরুক
২৯। দক্ষিণ বাহু	বক্রেশ্বর	বক্রেশ্বরী	বক্রেশ্বর
৩০। বাম স্তন	জালন্ধর	ত্রিপুরমালিনী	ভীষণ
৩১। দক্ষিণ স্তন	রামগিরি	শিবানী	চণ্ড
৩২। পৃষ্ঠ	বৈবস্বত	ত্রিপুটা	শমনকর্মা
৩৩। হৃদয়	বৈদ্যনাথ	নবদুর্গা বা জয়দুর্গা	বৈদ্যনাথ
৩৪। নাভি	উৎকল	বিজয়া	জয়
৩৫। জঠর	হরিদ্বার	ভৈরবী	বক্র
৩৬। কোঁক (কুক্ষি)	কোঁকামুখ	কোঁকেশ্বরী	কোঁকেশ্বর

সতীর অঙ্গ	পীঠস্থানের নাম	দেবীর নাম	ভৈরবের নাম
৩৭। কাঁকালি (কটি)	কাঞ্চীদেশ	বেদগর্ভা	রুরু
৩৮। বাম নিতম্ব	কালমাধব	কালী	অসিতাঙ্গ
৩৯। দক্ষিণ নিতম্ব	নর্মদা	সোণাক্ষী	ভদ্রসেন
৪০। মহামুদ্রা	কামরূপ	কামাখ্যা বা নীলপার্বতী	উমানন্দ
৪১। বামজানু	মালব	শুভচণ্ডী	তাম্র
৪২। দক্ষিণ জানু	ত্রিস্রোতা	চণ্ডিকা	সদানন্দ
৪৩। বাম জঙ্ঘা	জয়ন্তী	জয়ন্তী	ক্রমদীশ্বর
৪৪। দক্ষিণ জঙ্ঘা	নেপাল	মহামায়া বা নবদুর্গা	কপালী
৪৫। বাম পদ	ত্রিহুত	অমরী	অমর
৪৬। দক্ষিণ পদ	ত্রিপুরা	ত্রিপুরা	নল
৪৭। দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ	ক্ষীরগ্রাম	যোগাদ্যা	ক্ষীরখণ্ড
৪৮। দক্ষিণ পদাঙ্গুলি	কালীঘাট	কালিকা	নকুলেশ
৪৯। বাম গুল্ফ (গোড়ালি)	বিভাস	ভীমরূপা	কাপালী
৫০। দক্ষিণ গুল্ফ	কুরুক্ষেত্র	সম্বরী বা বিমলা	সম্বর্ত
৫১। বাম পদাঙ্গুলি	বিন্ধ্যশেখর	বিন্ধ্যবাসিনী	পুণ্যভাজন

উপপীঠ

১। কিরীট	কিরীটকোণা	ভুবনেশী	কিরীটী
২। কেশ	কেশজাল	উমা	ভুতেশ
৩। কুণ্ডল	বারাণসী	বিশালাক্ষী বা অন্নপূর্ণা	কালভৈরব বা বিশ্বেশ্বর
৪। বাম গণ্ডাংশ	উত্তরা	উত্তরিণী	উৎসাদন
৫। দক্ষিণ গণ্ডাংশ	নলস্থান	ভ্রমরী	বিরূপাক্ষ
৬। ওষ্ঠাংশ	অট্টহাস	ফুল্লরা	বিশ্বনাথ
৭। দন্তাংশ	সংহর	শূরেশী	শূরেশ
৮। উচ্ছিষ্ট	নীলাচল	বিমলা	জগন্নাথ
৯। কণ্ঠহার	অযোধ্যা	অন্নপূর্ণা	হরিহর
১০। হারাংশ	নন্দীপুর	নন্দিনী	নন্দীশ্বর
১১। গ্রীবাংশ	শ্রীশৈল	সর্বেশ্বরী	চর্চিতানন্দ
১২। শিরোংশ	কালীপীঠ	চণ্ডেশ্বরী	চণ্ডেশ্বর
১৩। অস্ত্র	চক্রদ্বীপ	চক্রধারিণী	শূলপাণি
১৪। পাণিপদ্ম	যশোহর	যশোরেশ্বরী	প্রচণ্ড

সতীর অঙ্গ	পীঠস্থানের নাম	দেবীর নাম	ভৈরবের না
১৫। করাংশ	সতীচল	সুনন্দা	সুনন্দ
১৬। স্কন্ধাংশ	বৃন্দাবন	কুমারী	কুমার
১৭। বসাচর্বি	গৌরীশেখর	যুগাখ্যা	ভীম
১৮। শিরানলী	নলহাটী	শেফালিকা	যোগীশ
১৯। কক্ষাংশ	সর্বশৈল	বিশ্বমাতা	দণ্ডপাণি
২০। নিতম্বাংশ	শোণ	ভদ্রা	ভদ্রেশ্বরী
২১। পদাংশ	ত্রিস্রোতা	পার্বতী	ভৈরবেশ্বর
২২। নূপুর	লঙ্কা	ইন্দ্রাক্ষী	রক্ষেশ্বর
২৩। চর্মাংশ	কটক	কটকেশ্বরী	বামদেব
২৪। লোম	পুণ্ড	সর্বাক্ষীণী	সর্ব
২৫। লোমখণ্ড	তৈলঙ্গ	চণ্ডদায়িকা	চণ্ডেশ
২৬। ভগ্নাংশ	শ্বেতবন্ধ	জয়া	মহাভীম

পীঠস্থানের এই দীর্ঘ তালিকা ভালো করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে সমস্ত পীঠস্থানের বর্তমান অবস্থান খুঁজে বার করা দুরূহ। এগুলি লোক চক্ষে প্রকাশেরও কোন সফল প্রয়াস এ যাবৎ হয় নি। কাজেই এই তালিকার অনেকগুলি নামই এখন হারিয়ে গেছে। তার জন্যে দুঃখ করার কোন কারণ নেই এই জন্যে যে কেবল পদ্ম পুরাণেই সাড়ে তিন কোটি তীর্থের উল্লেখ আছে। এসব তীর্থের মধ্যে অল্প ক-টি নামই এখন শুনতে পাওয়া যায়। মনে হয় যে পুরাকালে সকল পবিত্র স্থানকেই তীর্থ বলা হত। যেখানে কোন মন্দির ছিল, বা কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করে বসবাস করেছিলেন, সেই সমস্ত স্থানই তীর্থ বলে গণ্য হয়েছিল। হিন্দুর বিশ্বাস থেকেই তো তীর্থের জন্ম।

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ

এর পরেই শিবের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের কথা বলতে হয়। এই জ্যোতির্লিঙ্গের উৎপত্তি বিষয়ে শিবপুরাণে একটি কাহিনী আছে। পুরুষ ও প্রকৃতি নারায়ণ ও নারায়ণী নামে সৃষ্টি কার্যে প্রবৃত্ত হলে নারায়ণের নাভি পদ্ম থেকে ব্রহ্মা উৎপন্ন হলেন। নারায়ণ তাঁকে বললেন, জগতের সৃষ্টির জন্য তুমি আমার দেহ থেকে উৎপন্ন হয়েছ। ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তোমারও তো একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন! এই নিয়ে দুজনে বিবাদ আরম্ভ

হলে সেই বিবাদ ভঞ্জনের জন্যই জ্যোতির্লিঙ্গের আবির্ভাব হয়। তাঁর ক্ষয়-বৃদ্ধি, আদি-অন্ত নেই।

শিব পুরাণে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের নামও আছে। সৌরাষ্ট্রে প্রভাস-পত্তনে সোমনাথ, শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুন, উজ্জয়িনীতে মহাকাল, নর্মদায় ওঙ্কারেশ্বর, অমরেশ্বর বা অমলেশ্বর, হিমালয়ে কেদারনাথ। মহারাষ্ট্রে নেরাল স্টেশনের নিকটে ভীমশঙ্কর, কেউ বলেন ভীমশঙ্কর আসামে গৌহাটির নিকটে ব্রহ্মপুর পাহাড়ে। বারাণসীতে বিশ্বনাথ, নাসিকের নিকটে ত্র্যম্বকেশ্বর। বৈদ্যনাথ কেউ বলেন হায়দ্রাবাদের নিকট পার্লিতে, আবার কেউ বলেন বিহারের দেওঘরে। নাগেশ্বরও কেউ বলেন সৌরাষ্ট্রের দ্বারকায়, আবার কেউ বলেন হায়দ্রাবাদের নিকটে আওধা গ্রামে, আবার অনেকে আলমোড়ার নিকটেও বলে থাকেন। রামেশ্বর দক্ষিণ ভারতের সেতুবন্ধে এবং ইলোরা গুহার নিকটে ঘুশ্মেশ্বর। শেষোক্ত জ্যোতির্লিঙ্গকে অনেকে গৃহ্নেশ্বরও বলেন, অনেককে বিঘ্নেশ্বর বলতেও শোনা যায়।

এই বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গের সমান মাহাত্ম্য নিশ্চয়ই নয়। তা হলে এর অবস্থান নিয়ে মতান্তর থাকত না।

পঞ্চভূত লিঙ্গ

শিবের পঞ্চতত্ত্ব লিঙ্গ আছে দক্ষিণ ভারতের পাঁচটি তীর্থে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতের নামে পাঁচটি শিব লিঙ্গ। ক্ষিতি বা পৃথিবী লিঙ্গ কাঞ্চীতে, অপ্ বা জল লিঙ্গ তিরুচিরপল্লীর উপকণ্ঠ জম্বুকেশ্বরে, তেজ বা অগ্নি লিঙ্গ তিরুবল্লা মালাইত, মরুৎ বা বায়ু লিঙ্গ তিরুপতির নিকট বালাহস্তীতে এবং ব্যোম্ বা আকাশ লিঙ্গ চিদম্বরমে।

যুগতীর্থ

প্রচলিত ধারণা অনুসারে চার যুগে চারটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ। সত্যযুগে আদি তীর্থ পুষ্কর, ত্রেতায় নৈমিষারণ্য, দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র ও কলিতে গঙ্গা। পুষ্করের তীর্থ মাহাত্ম্য এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু নৈমিষারণ্য ও কুরুক্ষেত্রের মাহাত্ম্য আর আগের মতো নেই। গঙ্গা তার উৎপত্তিস্থল গোমুখ থেকে গঙ্গাসাগরে সমুদ্র সঙ্গম পর্যন্ত সর্বত্র সমান পবিত্র। গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য কোন তীর্থস্থানের চেয়ে কম নয়।

চার ধাম

হিমালয়ের চার ধাম হলো যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ। শাস্ত্রে এই চার ধাম দর্শনের একটি নির্দিষ্ট ক্রম আছে। প্রথমে যমুনোত্রী, পরে গঙ্গোত্রী, তার পরে কেদারনাথ এবং সর্বশেষে বদ্রীনাথ। যাত্রীরা এই ভাবেই হিমালয়ের চার ধাম দর্শন করেন।

কিন্তু মুখ্য চার ধাম দর্শনের কোন নির্দিষ্ট ক্রম নেই। এই চারটি ধাম হলো—পূর্বে পুরী, পশ্চিমে দ্বারকা, উত্তরে বদ্রীনারায়ণ ও দক্ষিণে রামেশ্বর। শঙ্করাচার্য বোধহয় এই চার ধামে চারটি মঠ স্থাপন করবেন বলে ভেবেছিলেন। তাই পুরীতে গোবর্ধন মঠ ও দ্বারকায় সারদা মঠ তিনি স্থাপন করেছিলেন। বদ্রীনাথের পথে যোশীমঠে জ্যোতির্মঠও প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু রামেশ্বরের পরিবর্তে দক্ষিণ ভারতের শৃঙ্গেরীতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শৃঙ্গেরী মঠ।

সপ্ত পুরী

ভারতের যে সাতটি পুরী দর্শন করলে সিদ্ধিলাভ হয়, তা দর্শনেরও কোন ক্রম নির্দিষ্ট হয় নি। এই সাতটি পুরীর নাম—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা সিদ্ধিদায়িকা॥

অর্থাৎ অযোধ্যা, মথুরা, মায়া বা হরিদ্বার, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী ও দ্বারাবতী সিদ্ধিদায়িকা পুরী। এই শ্লোকের পুরী শব্দটি কিছু বিভ্রম ঘটায়। এই পুরী জগন্নাথ ক্ষেত্র নয়, এটি দ্বারকাপুরী। মায়া হরিদ্বারের প্রাচীন নাম এবং অবন্তী অর্থে উজ্জয়িনী বোঝায়।

কুম্ভ

কুম্ভের কথায় সমুদ্র-মন্থনের কথা এসে পড়ে। অমৃতের জন্য দেবতা ও অসুরেরা মিলিত হয়ে সমুদ্র মন্থন করেছিলেন সত্য যুগে। অমৃতের কুম্ভ হাতে সমুদ্র থেকে উঠেছিলেন ধন্বন্তরি। তারপরেই সেই কুম্ভের অধিকার নিয়ে দেবাসুরের বিবাদ শুরু হয়েছিল। যুদ্ধ হয়েছিল বারো দিন। আর ঐ বারো দিনে চার বার কুম্ভটি মাটিতে রাখা হয়েছিল—হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনীতে। দেবতার বারো দিন মানুষের বারো বৎসর কল্পনা করে বারো বৎসর পর পর এই চার জায়গায় কুম্ভযোগ হয়। হরিদ্বার ও

প্রয়াগে ছয় বছর পর পর যে কুম্ভ যোগ হয়, তাকে অর্ধকুম্ভ বলে, পূর্ণ কুম্ভ বারো বছর পর।

অমৃতকুম্ভ যে জায়গায় যখন নামানো হয়েছিল, কুম্ভ স্নানের যোগ সে জায়গায় সেই সময়েই চলে আসছে। হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডে মহাবিষ্ণুর সংক্রান্তিতে, মকর সংক্রান্তিতে প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে, নাসিকের কুশাবর্ত ঘাটে কুম্ভযোগ হয় চাতুর্মাস্যে মানে বর্ষার সময়ে, আর বৈশাখের পূর্ণিমায় উজ্জয়িনীর শিপ্রা নদীতে হয় কুম্ভ স্নান। কুম্ভযোগে দেশের সমস্ত সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসী এসে একত্র হন।

তীর্থ মাহাত্ম্য

পুরাকালে তীর্থ ভ্রমণের একটা সুনির্দিষ্ট রীতি ছিল। মৎস্য পুরাণে আছে যে ঐশ্বর্যমত্ত হয়ে কোন ধনী যদি যানারোহণে তীর্থযাত্রা করে তো সেই তীর্থযাত্রা একেবারেই নিস্ফল হয়।

ঐশ্বর্য লাভ মাহাত্ম্যাৎ গচ্ছেৎ যানেন যো নরঃ।
নিস্ফলং তস্য তত্তীর্থঃ তস্মাৎ যানং বিবর্জয়েৎ॥

কর্মলোচন নামে একটি গ্রন্থ অবশ্য যানে তীর্থযাত্রা একেবারে নিস্ফল বলে নি। বলেছে, যানবাহনে তীর্থ যাত্রা করলে অর্ধেক পুণ্য নষ্ট হয়, তার অর্ধেক নষ্ট হয় ছত্র ও পাদুকা ব্যবহারে। তৈল ও মাংসাহারে আরও অর্ধেক পুণ্যক্ষয় হয় এবং স্ত্রীসঙ্গে সমস্তই বিনষ্ট হয়।

পুণ্যার্ধং হরতে যানে তদর্ধং ছত্র পাদুকে।
তদর্ধং তৈল-মাংসাভ্যাং সর্বং হরতি মৈথুনে॥

এই রকম বিধিনিষেধ আরও অনেক ছিল, কিন্তু এ যুগে সে সমস্তই অচল হয়ে গেছে। কিন্তু তীর্থ ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা আজও অস্বীকৃত হয় নি। ব্রাহ্মণের কথামৃতে মন যদি পবিত্র না হয়, তপস্যায় ও সত্যধর্ম পালনেও যদি সংসারী মন মলিন হয়ে থাকে, তবে মানুষকে তীর্থ ভ্রমণে বেরোতেই হবে। শুধু বহুদর্শিতার জন্য নয়, এই মুক্তিতে আত্মার উন্নতি হয়।

তীর্থ ভ্রমণের প্রেরণা এখন অনেক ক্ষেত্রেই পুণ্য সঞ্চয়ের বদলে সৌন্দর্যের আকর্ষণে আসে। ভারতের বিভিন্ন তীর্থে আমরা প্রকৃতির এমন অকৃপণ রূপ দেখি যে সেই রূপের টানেই আমরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। যেখানে গিয়ে সংসারের দুঃখ ভুলে যাই কিছুদিনের জন্য। অপরিসীম আনন্দে মন ভরে

নিয়ে গৃহে ফিরে আসি। এরই নাম তীর্থের টান, এই টানেই আমরা বার বার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি।

প্রত্যেকটি হিন্দু তীর্থের সঙ্গে কোন পৌরাণিক কাহিনী বা কিংবদন্তী যুক্ত হয়ে আছে। নানা অলৌকিক মাহাত্ম্যের কথাও শোনা যায়। কোথাও একে স্থল পুরাণ বলে, কোথাও বা এ সব কাহিনী তীর্থ মাহাত্ম্য নামের সংক্ষিপ্ত পুস্তকে পাওয়া যায়। কোথাও বা পাণ্ডা বা গাইডের মুখে শুনেই বিশ্বাস করতে হয়।

জৈন তীর্থ

জৈন ধর্ম অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে প্রচলিত। এই ধর্মের চব্বিশজন তীর্থঙ্কর ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন। অনুমান করা হয় যে, প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথ বা ঋষভ দেব সিন্ধু সভ্যতার কালে বর্তমান ছিলেন। অনেকে এও বলেন যে, বৃষভ বাহন শিব ও আদিনাথ অভিন্ন। চতুর্বিংশতিতম তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীর ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁর জন্ম ৫৯৯ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে। গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক হলেও তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। এই চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের জন্মস্থান, দীক্ষা, কৈবল্য ও নির্বাণ-ভূমি জৈনদের নিকট তীর্থ। এরা স্থাবর তীর্থ। জৈন সাধু ও সাধ্বীরাও তীর্থ বলে পরিগণিত। তাঁরা জঙ্গম বা সচল তীর্থ।

এই সব তীর্থের মধ্যে সাতটি জৈন তীর্থ প্রধান। প্রথম, বিহারের সম্মেতশিখর বা পরেশনাথ কুড়িজন তীর্থঙ্করের নির্বাণ-ভূমি। দ্বিতীয়, রাজস্থানের দিলওয়াড়া প্রাকৃতিক ও স্থাপত্য-শিল্পে মনোরম। তৃতীয়, সৌরাষ্ট্রের পলিতানায় শত্রুঞ্জয় একটি মন্দির নগরী। চতুর্থ, সৌরাষ্ট্রেরই গির্ণার পাহাড় একটি সিদ্ধভূমি রূপে সম্রাট অশোকের পূর্বেও গণ্য হত। পঞ্চম, দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের শ্রবণবেলগোলা বিশ্বের বৃহত্তম গোমতেশ্বর মূর্তির জন্য বিখ্যাত। ষষ্ঠ, উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বরের নিকট উদয়-গিরি খণ্ড-গিরি এবং সপ্তম,—বর্ধমান মহাবীরের নির্বাণ স্থান বিহারের পাওয়া পুরী।

বৌদ্ধ তীর্থ

গৌতম বুদ্ধের কাল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী। ভারত-নেপাল সীমান্তে

লুম্বিনীতে তাঁর জন্ম। বিহারের বুদ্ধগয়ায় তপস্যা করে তিনি জ্ঞানলাভ করেন। উত্তরপ্রদেশে বারাণসীর নিকটে সারনাথে তিনি ধর্ম প্রচার করেন এবং নির্বাণ লাভ করেন উত্তরপ্রদেশের কুশীনগরে। এই চারটি স্থান তাই বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়াও তাঁর জীবনের সঙ্গে যোগসূত্রের জন্য শ্রাবস্তী, সঙ্কাশ্য, রাজগৃহ ও বৈশালীও বৌদ্ধ তীর্থ বলে পরিগণিত। অজন্তা-ইলোরার গুহা-মন্দির এবং সাঁচীও বৌদ্ধ-স্মৃতি বহন করে।

শিখ তীর্থ

সংস্কৃত শিষ্য শব্দ থেকেই শিখ শব্দের উৎপত্তি। গুরুনানক এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর কাল ১৪৬৯ থেকে ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দ। শিখ ধর্মের দশম ও শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহ ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। এই দশজন গুরুর বাণী আদি গ্রন্থ বা গ্রন্থ সাহেব নামে শিখ মন্দির বা গুরুদ্বারে পূজিত হয়।

গুরুদের জন্ম মৃত্যু ও জীবনের বিশেষ ঘটনার সঙ্গে জড়িত স্থানগুলি এখন তীর্থরূপে সমাদৃত। সেখানে গুরুদ্বারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই সব তীর্থের পরিচয় যথাস্থানে পাওয়া যাবে।

অন্যান্য ধর্মের তীর্থ

জরথস্ত্রুর প্রচারিত ধর্মে বিশ্বাসী পার্সিরা ধর্মীয় অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাঁদের জন্মভূমি ইরান পরিত্যাগ করে ভারতে এসেছিলেন সপ্তম শতাব্দে। তাঁদের কোন বড় তীর্থস্থান নেই। ইরান থেকে যে অগ্নি তাঁরা ভারতে এনেছিলেন, তা গুজরাতের উডভাডায় একটি মন্দিরে আজও সযত্নে রক্ষিত হচ্ছে। বম্বে থেকে ১১১ মাইল উত্তরে এই স্থানটি পার্সিদের একটি তীর্থস্থান।

যীশুখ্রীষ্ট ও হজরত মহম্মদের জন্ম, কর্ম ও মৃত্যুর স্থান ভারতের বাইরে। এ দেশে তাই অনেক গির্জা ও মসজিদ থাকা সত্বেও তীর্থস্থান বলতে আমরা যা বুঝি তা নেই। খ্রীষ্টের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে সেণ্ট টমাস নামে তাঁর এক শিষ্য এসে দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি স্থানে গির্জা নির্মাণ করেন। সেই সব স্থান পবিত্র বলে এখনও গণ্য হয়। তেমনি ইসলাম ধর্মের অনেক ধর্ম-

প্রচারক ভারতে এসে ধর্ম প্রচার করে নানা স্থানে দেহরক্ষা করেন। সেই স্থানগুলিও পবিত্র বলে মান্য করা হয়।

এই গ্রন্থে সকল ধর্মের মুখ্য তীর্থস্থানগুলির কথা যথাযথ স্থানে বর্ণিত হয়েছে। পুরাকালের ভারতবর্ষ ক্রমে ক্রমে খণ্ডিত হবার পরে অনেকগুলি হিন্দু তীর্থ এখন ভারতের বাইরে প্রতিবেশী দেশে অবস্থিত। তাই পাকিস্তান, বাঙলা দেশ, নেপাল ও তিব্বতের হিন্দু তীর্থগুলির বিবরণও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হল।

তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য গ্রন্থের শেষে একটি পরিশিষ্ট ও বর্ণানুক্রমিক তীর্থপঞ্জী দেওয়া হলো। কোন প্রধান তীর্থের কথা বাদ পড়ে থাকলে কিংবা কোন ভুল-ত্রুটি বা অসঙ্গতি চোখে পড়লে সুধী পাঠক তা জানিয়ে গ্রন্থকারকে বাধিত করবেন, এই প্রার্থনা।

গ্রন্থকার

রম্যাণি
বি. এফ. ৭৭, সল্ট লেক সিটি,
কলিকাতা-৭০০০৬৪

পূর্বাঞ্চল

পশ্চিমবঙ্গ

কলিকাতা

পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা সর্বধর্মের তীর্থস্থান বলে পরিচিত। শুধু হিন্দুর পীঠস্থান নয়, বৌদ্ধ ও জৈনদের নিকটেও কলকাতা একটি তীর্থস্থান। কলেজ স্কোয়ারে মহাবোধি সোসাইটির বেত বিহারে বুদ্ধের অস্থি আছে। উত্তর কলকাতায় শ্বেতাম্বর ও বেলগাছিয়ায় দিগম্বর জৈনদের মন্দির আছে। পরেশনাথের শোভাযাত্রা কলকাতার একটি দর্শনীয় বস্তু। এ ছাড়াও ইহুদীদের একটি মিনাগগ আছে ক্যানিং ষ্ট্রীট এলাকায়, এজরা ষ্ট্রীটের নিকটে পার্সিদের অগ্নি মন্দির। মুসলমানদের দর্শনীয় নাখোদা মসজিদ চিৎপুরে। আর শহরের নানাস্থানে আছে খ্রীষ্টানদের গির্জা।

কালীঘাট কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত এটি একটি পীঠস্থান। সতীর দক্ষিণ পাদাঙ্গুলি পড়েছিল এইখানে। দেবী কালিকা ও ভৈরব নকুলেশ।—

নকুলীশঃ কালিপীঠে দক্ষপাদাঙ্গুলীষু চ।
সর্বসিদ্ধিকরী দেবী কালিকা তত্র দেবতা॥

রামায়ণ বা মহাভারতে এই কালীঘাটের উল্লেখ নেই। উল্লেখ আছে ভবিষ্য পুরাণে: গোবিন্দপুর প্রান্তে চ কালী সুরধুনী তটে। গোবিন্দপুর হল বর্তমান কলকাতা; আর তার প্রান্তে গঙ্গাতীরে এই কালী। বৃহন্নীল ও শিবার্চল তন্ত্রে কালীঘট্ট নাম পাওয়া যায়; আর নিগমকল্পের পীঠমালায় এর সীমা নির্দেশ করা আছে। কিন্তু এ সব খুব প্রাচীন গ্রন্থ নয়। কালীঘাটকে আধুনিক তীর্থ বলাও ঠিক হবে না। আকবর বাদশাহর আমলে যে কালীঘাটের খ্যাতি ছিল তার প্রমাণ আছে। মানসিংহ বাঙলায় আসবার আগেই কবিরাম তাঁর দিগ্বিজয় প্রকাশে এই তীর্থের বর্ণনা করেছিলেন।

আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে কালীকোটার উল্লেখ আছে। এই কালীকোটাই বোধহয় কালীঘাট। একটা কথা অনেকেই মেনে নিয়েছেন যে বৌদ্ধ যুগের অবসানের সময়ে তন্ত্রমত যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল, তখন এই কালীঘাটের অরণ্যে তান্ত্রিক ও কাপালিকরা বসবাস করতেন। এই জন্যেই বৃহন্নীলতন্ত্রে এই দেবতাকে গুহ্যকালী বলা হয়েছে। অনুমান করা হয় যে, এই অঞ্চল যশোর রাজ প্রতাপাদিত্যের অধিকারে ছিল এবং তাঁর কাকা বসন্তরায় ছিলেন কালীর সেবায়েৎ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর শিষ্য। কালীর জন্য একটি ছোট মন্দির তিনিই প্রথম নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে কালীঘাটের খ্যাতি চারিদিকে ব্যপ্ত হতে থাকে। ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ছিলেন অপুত্রক, তাঁর দৌহিত্র বংশের হালদাররাই এখনও মন্দিরের পূজা করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরীরা বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন বলে সবাই জানে। এই বংশের সন্তোষ রায়ের তখন দক্ষিণ কলকাতায় প্রবল প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু কালীঘাটের মন্দিরের খুবই জীর্ণ দশা। হাটখোলার কালীপ্রসাদ দত্ত সেই সময়ে কলকাতার ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করে পঁচিশ হাজার টাকা বিদায় দিয়েছিলেন। ঐ টাকাতেই সন্তোষ রায় নূতন মন্দির নির্মাণ আরম্ভ করেন। তাঁর পুত্র রামনাথ রায় ও ভ্রাতুষ্পুত্র রাজীবলোচন রায় ১৮০৯ সালে মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ করেন। এই কালীপুরীর তোরণদ্বার নহবৎখানা আর দুটো ভোগের ঘর তৈরি হয়েছে গোরক্ষপুরের টীকা রায়ের টাকায়, নাটমন্দির তৈরি করে দিয়েছেন আন্দুলের জমিদার রাজা কালীনাথ রায়। দুশো বছর আগে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কালীঘাটের দেবত্র জমির বারো বিঘে দান করেছিল। এইজন্যে হুজুরিমল আদিগঙ্গার ঘাট আর একটি শিবমন্দির নির্মাণ করে দেন। শ্মশানের বড় বিশ্রামের ঘর ও শিব মন্দির তৈরি করে দেন হাইকোর্টের বেঞ্চক্লার্ক শশিভূষণ বসু। শ্মশানের ঘাট, যাতায়াতের পথ ও আর একটি বিশ্রামের ঘর প্রাণকৃষ্ণ হালদারের মা বিশ্বময়ী দেবীর টাকায় তৈরি। গঙ্গার ঘাট থেকে মন্দিরে যাতায়াতের পথ প্রথমে তৈরি করে দিয়েছিলেন জোড়াসাঁকোর রামচন্দ্র পাল ও পরে তা গোবর্ধন দাস অগ্রবালের টাকায় তৈরি হয়েছে। এ সবই প্রায় একশো বছর আগের ঘটনা।

কালীঘাটের মন্দিরের একটা বিশেষ রূপ আছে। বাঙলার নিজস্ব

রূপ। চারচালার মতো গর্ভগৃহ, তার উপরে আর একটি ছোট চারচালার শিখর। মন্দিরের এই সরল স্থাপত্য রীতি বাঙলার প্রায় সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়।

মন্দিরের অভ্যন্তরে কালী করালবদনা দশমহাবিদ্যার প্রথম মহাবিদ্যা। দেবীর এই ভয়ঙ্কর রূপের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত আছি। তিনি করাল-বদনা ভয়ঙ্করী চতুর্ভুজা মুণ্ডমালা বিভূষিতা। তাঁর অধো বাম হস্তে সদ্য ছিন্ন মুণ্ড, উর্ধ্ব বাম হস্তে খড়্গ, উর্ধ্ব দক্ষিণ হস্তে অভয় চিহ্ন ও অধো দক্ষিণ হস্তে বরাভয়। তিনি মেঘের মতো শ্যামা ও দিগম্বরী। তাঁর কণ্ঠের মুণ্ডমালা থেকে রক্ত নির্গত হচ্ছে, দুটি লম্বিত শব তাঁর দুই কানের কর্ণভূষণ। তিনি ভীমদশনা, করালমুখী ও পীনোন্নত পয়োধরা; শবের হাত দিয়ে তৈরি তাঁর মেখলা। তিনি হাসছেন, তাঁর ওষ্ঠ প্রান্ত থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। তাঁর শব্দ ও রূপ দুইই ভয়ঙ্কর, তিনি শ্মশানবাসী, বালার্কের মতো মণ্ডলাকার তাঁর ত্রিলোচন। তিনি করালদন্তা, তাঁর দক্ষিণাঙ্গব্যাপী মুক্ত কেশপাশ। তিনি শবরূপী মহাদেবের হৃদয়স্থিতা এবং ঘোর রবকারী শিবাপরিবেষ্টিতা। মহাকালের সহিত তিনি বিপরীত রতি আতুর, সুখ প্রসন্নবদন ও হাস্যমুখী। এই রূপেই সর্বকামার্থসিদ্ধিদা কালীর ধ্যান করতে হয়।—

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্॥

তন্ত্রসারে কালীর এই ধ্যান পাওয়া যায়।

কালীঘাটের কালীকে অনেকে অনেক অলঙ্কার দিয়েছেন। মাথায় সোনার মুকুট দিয়েছেন বেলেঘাটার রামনারায়ণ সরকার। মাথার উপরে রূপার ছাতা দিয়েছেন নেপালের সেনাপতি জং বাহাদুর রাণা। খিদিরপুরের গোকুলচন্দ্র ঘোষাল প্রথমে চারটি রূপার হাত দিয়েছিলেন, পরে সোনার হাত তৈরি করে দিয়েছেন কালীচরণ মল্লিক। ঐ হাতে সোনার কঙ্কণ পরিয়ে দিয়েছেন চড়কডাঙ্গার রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্র চন্দ্র সিংহ দিয়েছেন সোনার জিভ। সোনার ভ্রূ, হাতে অসুরের মুণ্ড ও আরও অনেক অলঙ্কার ভক্তরা দিয়েছেন।

অদূরে শ্যামরায় ও গোবিন্দরায়ের মন্দির আছে। শ্যামরায় বিষ্ণুর অংশে জন্ম কৃষ্ণের নাম। তাঁর বিগ্রহ একসময়ে কালী মন্দিরের মধ্যেই ছিল। আড়াইশো বছর আগে মুর্শিদাবাদের এক কানুনগো কালীমন্দিরে

শ্যামরায়কে দেখে শ্যামরায়ের জন্য আলাদা একটি ঘর তৈরি করে দেন। ১৮৪৩ সালে বর্তমান মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছেন চাওয়ালির জমিদার উদয়নারায়ণ মণ্ডল। দোলমঞ্চটি শাহ নগরের মদন কোলের টাকায় তৈরি। গোবিন্দরায়ও বিষ্ণুর নাম। তিনি ছিলেন গোবিন্দপুরের দেবতা। সেখানকার শেঠ ও বসাকরা তাঁর পূজা করতেন। আর তাঁরই নামে গ্রামের নাম হয়েছিল গোবিন্দপুর। ১৭০০ সালে ইংরেজ যখন এই গ্রাম কিনে নেয়, তখন গোবিন্দরায়কে এনে শ্যামরায়ের নিকটে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

নকুলেশ্বর শিবের মন্দির অনতিদূরে। ইনিই পীঠস্থানের ভৈরব। ১৮৫৪ সালে পাঞ্জাবের এক ব্যবসায়ী তারা সিং এই মন্দির তৈরি করে দেন। এই সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। একবার ব্যবসায়ে তাঁর খুব লাভ হয়। তিনি ভাবলেন যে কাশীতে সন্ন্যাসীদের জন্য একটি মঠ তৈরি করে দেবেন। আর সেই জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নৌকায় তুলে কাশীযাত্রা করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার—কাশীতে তারা সিং অনেক চেষ্টা করেও নৌকা বাঁধতে পারলেন না। নৌকা এসে কালীঘাটে ভিড়ল। তারা সিং কালীর মন্দির দেখলেন, আর নকুলেশ্বরকে দেখলেন একটি কুঁড়ে ঘরে। তখনই তিনি মঠ তৈরি করবার পাথর দিয়ে নকুলেশ্বরের মন্দির তৈরি করে দিলেন।

এই অঞ্চলে শিবের মন্দির আরও আছে। গঙ্গার ঘাটে হুজুরিমলের শিবের মন্দির, অন্যত্র ধনীদের তৈরি। হালদারদের তৈরি শিবমন্দিরও আছে। কালী মন্দিরের এলাকাতেও দুটি শিব মন্দির আছে।

এই মন্দির সম্বন্ধে অনেক কথা শোনা যায়। ওয়ার্ড ও মার্শম্যান সাহেবের বিবরণ থেকে জানা যায় যে শুধু হিন্দুরা নয়, খ্রীষ্টান ও মুসলমানরাও কালীঘাটের মন্দিরে পূজা দিতেন। মার্শম্যান সাহেব লিখেছেন যে এ দেশে ইংরেজের সাফল্য লাভের পরে ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে একটা দল শোভাযাত্রা করে এই কালীমন্দিরে এসে পাঁচহাজার টাকার পূজা দিয়েছিলেন। কয়েক হাজার স্থানীয় লোক এই পূজা দেখেছিল। ওয়ার্ড সাহেব বলেছেন যে সাহেবরা এসেও কালীর পূজা করেছে বলে তিনি শুনেছেন। তাদের এ দেশীয় উপপত্নীরা তো আসতই, মেমসাহেবরাও নাকি পাল্কী করে পূজা দিতে আসত। কোম্পানীর এক সাহেব একটা মামলায় জিতে দু-তিন

হাজার টাকার পূজা দিয়েছিল। আর তিনি এ কথাও শুনেছিলেন যে প্রতি মাসে প্রায় চার-পাঁচশো মুসলমান এসে পূজা দিয়ে যেত।

হাওড়া বা শিয়ালদহ স্টেশন থেকে এবং শহরের যে কোন স্থান থেকে ট্রামে বা বাসে কালীঘাটে এসে নামা চলে। সদর রাস্তা থেকে পায়ে হেঁটেই মন্দিরে পৌঁছনো যায়। মন্দির পর্যন্ত যানবাহনও আসে। আদিগঙ্গা মন্দিরের সামনে নয়, আদিগঙ্গা পিছনের দিকে। পরিচ্ছন্ন পথে খানিকটা এগিয়ে গেলেই আদিগঙ্গা। অতীতে গঙ্গা এইখান দিয়ে প্রবাহিত হত। কিন্তু পরবর্তীকালে গঙ্গার স্রোত সরে যাবার ফলে এটি একটি খালে পরিণত হয়। প্রায় দুশো বছর আগে মেজর টলি এই নালা পরিষ্কার করেছিলেন বলে ইংরেজ একে টলির নালা বলত। কিন্তু তীর্থযাত্রীর কাছে এর নাম আদিগঙ্গা। সংকীর্ণ নালায় অপরিষ্কার জল মন্থর ধারায় প্রবাহিত হয়। নিতান্ত পুণ্যলোভেই যাত্রীরা এই জলে স্নান করে মন্দিরের কালী দর্শন করেন। মন্দিরের পথে বাজার আছে, এই বাজারে পূজার সমস্ত উপকরণ পাওয়া যায়।

দক্ষিণেশ্বর

অতি সাম্প্রতিক কালে প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির এখন একটি বিশিষ্ট তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। পুরাকালে দেউলিপোতা নামে এক জায়গায় ছিল বাণরাজার বাড়ি। তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দক্ষিণেশ্বর শিব। আর এই শিবের নামেই জায়গার নাম হয়েছিল দক্ষিণেশ্বর। এখানে কালী-মন্দির প্রতিষ্ঠার একটি অলৌকিক কাহিনী আছে। বিধবা হবার পর জানবাজারের রাণী রাসমণি তীর্থদর্শন করে বেড়াচ্ছিলেন। মেজ জামাই মথুরানাথ বিশ্বাস ছিলেন তাঁর খুব অনুগত। তাঁকে বললেন, এইবারে কাশী চল বিশ্বনাথ দর্শনের জন্য। মথুরবাবু তখনই সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। পঁচিশখানা বজরা নৌকো জিনিষপত্র ও খাদ্যদ্রব্যে ভরে গেল। অনেক আত্মীয় বন্ধু দাস-দাসী সঙ্গে যাবে। কিন্তু যাত্রার আগের রাতে রাণীমা স্বপ্নে দেখলেন কাশীর অন্নপূর্ণাকে। তিনি আদেশ করলেন, কলকাতার কাছেই গঙ্গার ধারে শিবশক্তির প্রতিষ্ঠা কর। ঘুম থেকে উঠে রাণীমা বললেন, কাশী যাব না। ঐ টাকায় এইখানেই মন্দির করব অন্নপূর্ণার। বাঙলা ১২৬২ সালে এই দক্ষিণেশ্বরে ষাট বিঘা জমি কেনা

হয়েছিল মন্দির নির্মাণের জন্য। কিন্তু মন্দিরে অন্নপূর্ণা নয়, কালীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। যিনি অন্নপূর্ণা, তিনিই কালী। শিবের শক্তি সতী যে দশমহাবিদ্যার রূপ দেখিয়েছিলেন, তাতে কালী তারা ছিন্নমস্তার ভয়ঙ্কর রূপ, আর মোহিনী রূপ ষোড়শী ভুবনেশ্বরী কমলার। অন্নপূর্ণাও সতীর একটি প্রসন্ন রূপ, কিন্তু দশমহাবিদ্যায় তাঁর নাম নেই।

এই মন্দির গঙ্গার ধারে। প্রশস্ত প্রাঙ্গণের এক পাশে গঙ্গার ঘাট। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাঁধানো ঘাট ধাপে ধাপে গঙ্গার জল পর্যন্ত নেমে গেছে। গঙ্গার এই ধারটা বেঁধে এই ঘাট তৈরি করতে রাণীর এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। কলকাতার বিখ্যাত কণ্ট্রাক্টর ম্যাকিণ্টস অ্যাণ্ড কোম্পানী এই সব তৈরি করেছিল। শুধু ঘাট নয়, ঘাটের উপরে শিবের দ্বাদশটি মন্দির আছে। দ্বাদশ রুদ্রের মন্দির। গঙ্গার ঘাটে যাবার পথের এক পাশে ছটি, আর ছটি অন্য পাশে। এক দিকে যজ্ঞেশ্বর জলেশ্বর জগদীশ্বর নাগেশ্বর নন্দীশ্বর ও নরেশ্বর, অন্য দিকে যোগেশ্বর রত্নেশ্বর জটিলেশ্বর নকুলেশ্বর নাকেশ্বর ও নির্জরেশ্বর। এই সব মন্দিরে প্রবেশের পথ মূল প্রাঙ্গণের মধ্যে। এক দিকে সিঁড়ি দিয়ে উঠলে ছটি শিব দর্শন ও প্রদক্ষিণ করে নেমে আসা যায়।

প্রাঙ্গণের মাঝখানে মূল মন্দির কালীর। নবরত্ন মন্দির। মন্দির নির্মাণে বাঙলার নিজস্ব একটি স্থাপত্য রীতি আছে। আসল রূপটি হল চারচালা ঘরের মতো। চারিধার অর্ধবৃত্তাকার আর চারটি কোণ নিচের দিকে ঝুঁকে মিলিত হয়েছে। ছোট মন্দিরে একটি শিখর, বড় মন্দিরগুলি পঞ্চরত্ন বা নবরত্ন। চার কোণায় চারটি ছোট ছোট শিখরের উপরে মুল শিখরটি থাকলে পঞ্চরত্ন। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির নবরত্ন। এর শিখরের সংখ্যা নয়। প্রথম চালার উপরে অপেক্ষাকৃত ছোট আর একটি চারচালা, তার উপরেও ছোট ছোট চারটি শিখর, মাঝখানে একটি। নটি শিখরবিশিষ্ট মন্দির বলেই নাম নবরত্নমন্দির।

মন্দিরের অভ্যন্তরে শ্বেত পাথরের মেঝের উপরে কালো পাথরের বেদী, তারই উপরে রূপার শতদলপদ্মে শায়িত মহাকাল। শ্বেত পাথরের বুকে ডান পা ফেলে দাঁড়িয়ে আছেন কালো পাথরের দক্ষিণেশ্বরী ভবতারিণী কালী, চতুর্ভুজা করালবদনা ঘোরা মুক্তকেশী ও মুণ্ডমালা বিভূষিতা। তাঁর বাঁদিকের দুই হাতে খড়্গ ও নরমুণ্ড, আর ডান হাতে বরাভয়। পরিধানে

তাঁর বেনারসী শাড়ি। ১৮৫৫ সালের ৩১শে মে স্নানযাত্রার দিন দেবীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

কালীকে আমরা মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডীতে পেয়েছি। মহিষাসুর বধের পর শুম্ভ নিশুম্ভের অত্যাচারে অতিষ্ঠ দেবতারা যখন দেবীর স্তব করছেন, তখন কালী সেখানে গঙ্গাস্নানে যাবার ছল করে এসে উপস্থিত হলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে তোমরা কি করছ? কিন্তু দেবতারা কোন উত্তর দেবার আগেই তাঁর শরীর থেকে অম্বিকা উৎপন্ন হয়ে বললেন, দৈত্যদের হাতে পরাজিত এই দেবতারা আমার স্তব করছে। বলেই ইনি কৌষিকী নামে হিমালয়ে চলে গেলেন। আর দেবী তাঁর গৌর বর্ণ ত্যাগ করে কৃষ্ণবর্ণা কালিকা নামে বিখ্যাত হলেন।

ভবিৎপুরাণ ও দেবী পুবাণেও আমরা কালীকে পাই। কালী বা মহাকালীর উগ্র রূপ, ভদ্রকালীর রূপ শান্ত ও সুন্দর। কালী বাঙালীর প্রিয় দেবতা, বাঙলায় তাঁর পূজা নানা নামে অনুষ্ঠিত হয়—শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, সিদ্ধকালী, গুহ্যকালী, দক্ষিণাকালী। বিপদ আপদ মহামারী থেকে রক্ষা পাবার জন্য কালীপূজা হয়, কালীপূজা করে ডাকাতরা বেরোত ডাকাতি করতে। কার্তিকের অমাবস্যার রাতে হয় কালীপূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসে কালীর ফলহারিণী পূজা। আর রটন্তী পূজা মাঘ মাসে।

এই মন্দির প্রাঙ্গণেই অন্য একটি মন্দিরে রাধাগোবিন্দেরও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল একই সময়ে। কষ্টি পাথরের কৃষ্ণের পাশে অষ্টধাতুর রাধা। গোপাল ও গরুড়ের মূর্তিও আছে। রাধিকা কৃষ্ণের স্ত্রী নন, তিনি তাঁর প্রেমিকা। গোপাল কৃষ্ণের বালক মূর্তি, আর বিষ্ণুর বাহন গরুড়। অন্য একটি কক্ষে আছেন মধুসূদন, অন্য নাম কৃষ্ণ বা বিষ্ণু। কৃষ্ণের আর একটি মূর্তিও আছে। অসাবধানতার জন্য পুরোহিতের হাত থেকে পড়ে গিয়ে গোবিন্দজীর পা ভেঙে গিয়েছিল। পণ্ডিতরা এই মূর্তি গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে নূতন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করতে বলেছিলেন। পণ্ডিতদের এই বিধান শুনে রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, 'এ বিগ্রহ ফেলে দেবে, সে কি কথা গো! রাণীর জামাইদের কারও পা ভাঙলে কি হবে বলতো! তাকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আর এক জামাই আনা হবে! না, তার চিকিৎসা চালাবে! গোবিন্দজীর ভাঙা পা জোড়া লাগিয়ে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।' রাণী রাসমণি এই বিধান সেদিন মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে ট্রাস্টিরা সেই ভাঙা

মূর্তিটি সরিয়ে রেখে নূতন মূর্তি বসিয়েছে রাধিকার পাশে।

প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে রামকৃষ্ণদেবের ঘর আছে। তাঁর ব্যবহৃত সব জিনিষই আছে এই ঘরে। এই ঘরেই তিনি তাঁর স্ত্রী সারদাদেবীকে ষোড়শী পূজা করেন ফলহারিণী কালীপূজার দিনে।

উত্তর দিকের ফটক দিয়ে বেরোলেই রাণী রাসমণির কুঠী। এই কুঠী থেকেই মথুরবাবু রামকৃষ্ণ ঠাকুরকে পায়চারি করতে দেখেছিলেন, আর ভেবেছিলেন ঠাকুর তো নয়, সামনের দিকে মা কালী আর শিব হলেন পিছনের দিকে।

ঠাকুরের মা ও স্ত্রী সারদা দেবী যেখানে বাস করতেন, তার নাম নহবৎ। ঠাকুরের ঘরের উত্তরে এই নহবৎ। পঞ্চবটীও এখান থেকে দূরে নয়। পাশে সাধন কুটীর, ঠাকুরের সাধনার স্থান। পঞ্চবটী মানে পাঁচটি বট গাছ নয়, পাঁচটি গাছ হল অশ্বত্থ, অশোক, আমলকী, বট ও বেল। এই পঞ্চবটীতে বৃন্দাবনের রজ ছড়িয়ে মাধবীলতা লাগানো হয়েছিল। তোতাপুরীজীর কাছে সন্ন্যাস নিয়ে ঠাকুর সাধনা করেছিলেন এইখানে। আর বাগানের উত্তর-পূর্ব কোণে বেলতলায় পঞ্চমুণ্ডির সামনে বসে তন্ত্রসাধনা শিখেছিলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছে। পঞ্চমুণ্ডি মানে পাঁচটি মানুষের মুণ্ড নয়। একটি মানুষের আর বাকি চারটি শেয়াল কুকুর ষাঁড় ও সাপের। ঠাকুর শুধু হিন্দুর সব সম্প্রদায়ের মতেই নয়, অন্যান্য ধর্ম মতেও সাধনা করেছিলেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ও সারদা দেবীর কথা না বললে দক্ষিণেশ্বরের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কামারপুকুরে জন্ম হয়েছিল রামকৃষ্ণের, আর সারদা মায়ের জন্ম জয়রামবাটিতে। কাছাকাছি এ দুটি গ্রাম। দামোদরের তীরে জয়রামবাটি বাঁকুড়া জেলায়। আর হুগলি জেলায় কামারপুকুর। মাঝখানের দূরত্ব তিন মাইল।

একদিন সিওড়় গ্রামে কীর্তনের আসর বসেছিল। আশ-পাশের গ্রাম থেকে এসেছিল অনেক লোক। এই গ্রামে মামার বাড়ি বলে ছ বছরের মেয়ে সারদা এসেছিলেন জয়রামবাটি থেকে। যে মহিলার কোলে বসে কীর্তন শুনছিলেন, কীর্তন শেষ হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এত লোকের মধ্যে তোর কাকে বিয়ে করতে সাধ হয় রে? দু-হাত তুলে সারদা যাকে দেখালেন, তিনি হলেন কামারপুকুরের পাগলা ছেলে গদাধর। গদাধর তখন দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর পূজা করতেন। কিন্তু মন সারাক্ষণ উদাস।

লোকে বলে পাগল। মা চন্দ্রাদেবী বললেন, ছেলের বিয়ে দিতে হবে। সেজদা রামেশ্বর বললেন, সেই চেষ্টাই করছি। আর এই কথা শুনে গদাধর বললেন, জয়রামবাটি গাঁয়ে রাম মুখুজ্জের বাড়িতে বিয়ের পাত্রী কুটো বাঁধা আছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এ সেই মেয়ে সারদা, কীর্তনের আসরে যিনি গদাধরকে পছন্দ করেছিলেন। মায়ের পছন্দ হল মেয়ে, দুজনের বিয়ে হয়ে গেল।

জয়রামবাটিতে এখন সারদা মায়ের বিরাট মন্দির তৈরি হয়েছে। গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠা হয়েছে মায়ের মর্মর মূর্তি। নিত্য পুজা হয়। নাট-মন্দির আছে। প্রতি বছর দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী পুজা হয়। অক্ষয় তৃতীয়ায় হয় মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসব। এ ছাড়াও এই গ্রামে আছে সিংহবাহিনীর মন্দির।

কামারপুকুরে সদর রাস্তার পাশেই রামকৃষ্ণদেবের মন্দির। নাট-মন্দির আছে। এখানেও দুর্গা পুজা হয়। তাঁর জন্মস্থানের উপরেই এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বাড়ির ঢেঁকিশালে তাঁর জন্ম। জন্মের পরে গড়াতে গড়াতে তিনি পাশের উনুনে চলে যান। ধান সিদ্ধ হত এই উনুনে। শেষ রাতে উনুনে আগুন ছিল না, ছিল ছাই। সেই ছাই লাগল শিশুর গায়ে। এই ঢেঁকিশালেই তৈরি হয়েছে ঠাকুরের ছোট মন্দির। বেদীর উপরে তাঁর পাথরের মূর্তি, আর বেদীর গায়ে খোদিত হয়েছে ঢেঁকি উনুন আর প্রদীপ।

আরও দুটি মন্দির আছে এই গ্রামে। রঘুবীরের মন্দির আর শিবের মন্দির। রঘুবীর রামের নাম। ঠাকুরের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় রঘুবীরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি খড়ের ঘরে। একদিন গ্রামে ফেরবার সময় নাকি একটা গাছতলায় তিনি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন রঘুবীরকে। ঘুম ভাঙার পর পাশেই একটি শিলা দেখতে পেলেন, তার মাথায় একটি সাপ ফণা ধরে আছে। 'জয় রঘুবীর' বলতেই সাপ সরে গেল। আর ক্ষুদিরাম সেই শিলা এনে নিজের গৃহে প্রতিষ্ঠা করলেন। এটিও এখন পাকা মন্দির হয়েছে খড়ের ঘরের মতো আকারের।

এই শিবের মন্দিরের সম্বন্ধেও একটি গল্প আছে। ঠাকুরের মা নাকি অনুভব করেছিলেন যে একদিন এই শিবের জ্যোতি এসে তাঁর শরীরে প্রবেশ করে। তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। আর তার পরেই বুঝেছিলেন যে তিনি এবারে মা হবেন।

ঠাকুর ও তাঁর আত্মীয়-পরিজনের স্মৃতিজড়িত আরও অনেক জায়গা আছে কামারপুকুরে। ঘুরে ঘুরে সেই সব দেখতে হয়।

বাঁকুড়ার পথে বিষ্ণুপুর থেকে বাস যাতায়াত করে। হুগলি জেলার আরামবাগ থেকেও বাসে যাওয়া যায়। রাত্রিবাসের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনে ভাল ব্যবস্থা আছে।

এর পরে আবার দক্ষিণেশ্বরের কথা। ঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে থাকেন। স্বামী মস্ত বড় সাধক হয়েছেন শুনে সারদা মা তাঁর বাবার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন। ঠাকুর বললেন, 'কি গো, আমায় কি তুমি মায়ায় বদ্ধ করতে এসেছ?'

তরুণী সারদা বললেন, না, 'তা কেন। আমি তোমার সহধর্মিণী। তোমার ধর্মপথে সহায়তা করতেই আমি এসেছি।'

ঠাকুর পরম সমাদরে তাঁকে নিজের ঘরে স্থান দিলেন, নিজের শয্যায়।

অনেকদিন পরে একদিন বলেছিলেন, 'ও যদি এত ভাল না হত, আত্মহারা হয়ে তখন আমায় আক্রমণ করত, তাহলে আমার সংযমের বাঁধ ভাঙত কিনা কে বলতে পারে! বিয়ের পরে মা জগদম্বাকে ব্যাকুল হয়ে ধরে পড়েছিলাম। বলেছিলাম, মা, আমার স্ত্রীর ভেতর থেকে কামভাব একেবারে দূর করে দে। ওর সঙ্গে একত্রে বাস করে এ সময়ে বুঝেছিলাম, মা আমার সেই কথা সত্যিই শুনেছিলেন।'

পদসেবা করতে করতে সারদা মা একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'ওগো, ঠিক করে বলতো, আমায় তোমার কী মনে হয়?'

ঠাকুর বললেন, 'মন্দিরে যে মায়ের পুজো হয়, সেই মা-ই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন এবং আজকাল নহবতে বাস করছেন। আবার তিনিই এখন কচ্ছেন আমার পদসেবা। আনন্দময়ী মায়ের প্রত্যক্ষ মূর্তি বলেই যে তোমায় সর্বদা আমি দেখি।'

এই মাতৃভাবেই ঠাকুর নিজের শয়ন ঘরে ষোড়শী পূজা করেছিলেন ফলহারিণী কালীপূজার দিন। নতুন কাপড় পরে ফুল চন্দনে সেজে পূজার বেদীতে বসেছিলেন সারদা মা। আর পূজারী ঠাকুর মা-মা বলে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। সারদা মায়েরও তখন বাহ্য জ্ঞান ছিল না।

রামকৃষ্ণ ঠাকুরকে অবতার বলেছিলেন এক ভৈরবী। তাঁর গলায় রঘুবীর চক্র লুকনো থাকত। একদিন পঞ্চবটীতে ইষ্টের জন্য ভোগ রেঁধে

ভৈরবী ধ্যানে বসেছিলেন। ঠাকুর সেই ভোগ খেয়ে ফেলে লজ্জায় বললেন, 'তাইতো! কে জানে বাপু, কেন এত বেসামাল হয়ে এ কাজ করে ফেললুম!'

কিন্তু ভৈরবী বললেন, 'এ কাজ তো তুমি কর নি বাবা! যিনি তোমার ভেতরে আছেন, তিনিই যে করেছেন। ধ্যানে যাকে দেখেছি, এ যে তারই কাজ! কেন এরূপ হল, তাও বুঝেছি। আর আমার পূজোয় কাজ নেই, পূজো এবার সার্থক হয়েছে।'

বলে তাঁর রঘুবীর চক্র গঙ্গায় বিসর্জন দিলেন। আর তার পরেই ঘোষণা করলেন, রামকৃষ্ণ অবতার—এবারে নিতায়ের খোলে চৈতন্যের অবতরণ!

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের তিনি ডাকতে বললেন। আর ছেলেমানুষের মতো ঠাকুর বললেন মথুরবাবুকে, 'বাম্‌নী এত সব কথা জোর দিয়ে বলছে, তা একটা মীমাংসার জন্যে তাদের ডাকো না বাবু।'

মীমাংসা হল। সভার শেষে ঘোষণা করা হল, ঠাকুর ঈশ্বরের অবতার। কিন্তু ঠাকুর উৎফুল্ল হয়ে মথুরবাবুকে বললেন চুপিচুপি, 'ওগো এ সব বল কী! যা হোক বাবু, রোগটোগ নয়—শুনে কিন্তু মনটায় আনন্দ হচ্ছে।

শেষ শয্যায় শুয়ে নিজের দেহটি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'ওরে যে রাম, যে কৃষ্ণ হয়েছিল, সে-ই ইদানীং এই খোলটার ভেতর—তবে এবারে গুপ্তভাবে আসা। যেমন রাজার ছদ্মবেশে নিজরাজ্য পরিদর্শন। যেমনি জানাজানি কানাকানি হয়, অমনি সে সেখান থেকে সরে পড়ে—সেই রকম!'

এই রামকৃষ্ণ সত্যিই ঈশ্বরের অবতার ছিলেন, না তাঁর শিষ্যরা তাঁকে অবতারের আসনে বসিয়েছেন, তা নিয়ে আজও অনেকের সংশয় আছে। স্বামী বিবেকানন্দের জন্যই এমন হয়েছে, এ কথাও বলে অনেকে। কিন্তু বিবেকানন্দ কেন তাঁর শিষ্য হলেন! ঈশ্বরকে দেখিয়েছেন বলে! সেও তো তর্কের কথা! বেদান্তের পণ্ডিত বিবেকানন্দ কী দেখেছিলেন ঠাকুরের মধ্যে!

অশিক্ষিত ঠাকুর একদিন সর্বজীবে দয়ার কথা শুনে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। তার পরেই রেগে বললেন, 'জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা! কীটানুকীট তুই! জীবকে আবার দয়া কি করবি? দয়া করবার তুই কে? না না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।'

বিবেকানন্দ বললেন, 'কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের এই কথায় পেলাম। বেদান্তজ্ঞান শুষ্ক কঠোর বলেই আমরা জানি। ভক্তির মিশ্রণ ঘটিয়ে ঠাকুর এই বেদান্তকে কি সরস কি মধুর করে তুললেন! ঠাকুর যা বললেন, তাতে বোঝা গেল, বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়। সংসারে সব কাজে তা অবলম্বন করা যায়।' তিনি লিখলেন—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

পৃথিবীর লোককেও তিনি এই কথাই বললেন। এ তাঁর নিজের কথা নয়, এ কথা তাঁর অশিক্ষিত গুরু রামকৃষ্ণের।

বেলুড়

গঙ্গার এপারে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংস, আর ওপারে বেলুড়ে তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। এপারে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির, আর ওপারে বেলুড় মঠ, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কর্মকেন্দ্র। পৃথিবীতে রামকৃষ্ণ মিশনের যত আশ্রম আছে, তার পরিচালনার দায়ীত্ব বেলুড় মঠের। রামকৃষ্ণ কোন দিন কোন মিশন বা মঠ স্থাপনের চেষ্টা তো দূরের কথা, ইচ্ছা প্রকাশও করেন নি। তাঁর মৃত্যুর পরে স্বামী বিবেকানন্দ যেদিন এই কথা বললেন, সেদিন একটা দুর্যোগের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'অনন্ত ভাবময় ঠাকুরকে তোরা বুঝি তোদের বুদ্ধির গণ্ডিতে বদ্ধ করে রাখতে চাস? তা হবে না। আমি এ গণ্ডি ভেঙে তাঁর ভাব সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। আমাকে তিনি কখনও তাঁর পূজা প্রচার করতে বলেন নি। ধ্যান ধারণা আর ধর্মের যে সব উঁচু তত্ত্ব আমাদের শিখিয়ে গেছেন, সেগুলি উপলব্ধি করে জগৎকে শিক্ষা দিতে হবে।' বিবেকানন্দর এই আদর্শ থেকেই রামকৃষ্ণ মিশনের জন্ম। কিন্তু এ কাজ তিনি একা করেছেন বললে তাঁর সহকর্মীদের অসম্মান করা হবে। এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের তিনি জন্ম দিয়েছিলেন, তার আদর্শ নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। তিনি আমেরিকায় যে টাকা পেয়েছিলেন তাই দিয়ে কিনেছিলেন পঁয়তাল্লিশ বিঘে জমি। এই মন্দির নির্মাণের ব্যাপারে দুজন আমেরিকান মহিলার প্রচুর দান আছে। ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠা হয় এই রামকৃষ্ণ মিশনের।

বেলুড় মঠের প্রধান মন্দিরটি গঙ্গার ধারে। মন্দিরের তিনটি অংশ, কিন্তু

তিনটি অংশই মন্দিরের মতো নয়। অনেকে বলেন যে এই তিনটি অংশ
তিনটি ধর্মের প্রতীক—হিন্দুর মন্দির, মুসলমানের মসজিদ ও খ্রীষ্টানের গির্জার
মতো। মন্দিরের অভ্যন্তরে বিরাট একটি কক্ষ আছে বলেই বোধহয় মসজিদ
বা গির্জার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বাহিরের স্থাপত্য রীতিতেও বেশ
কিছু বৈচিত্র্য আছে। সামনের দিকটা রাজস্থানী শৈলীর বলে মনে হয়।

এই মন্দির একশো ফুটেরও বেশি উঁচু। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেই
অসংখ্য ভক্ত সমাবেশের উপযোগী একটি বিশাল কক্ষ। এর পরে গর্ভ মন্দিরে
পাথরের বেদীর উপরে রামকৃষ্ণ দেবের প্রমাণ আকারের সমাধিস্থ মূর্তি।
সারদা মা বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের মূর্তি গঙ্গার ধারে স্বতন্ত্র মন্দিরে।

ভারতের অধ্যাত্ম জগতে শঙ্করাচার্যের পরেই স্বামী বিবেকানন্দের নাম
মনে আসে। একইভাবে এই দুই মহাপুরুষ হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন
করেছেন। অতি স্বল্পায়ু হয়েও এঁরা দুজন অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন।
শঙ্করাচার্য বত্রিশ বছর বয়সে অন্তর্ধান হয়েছিলেন, আর বিবেকানন্দ ১৯০২
সালের ৪ঠা জুলাই দেহরক্ষা করেছেন চল্লিশ বছর বয়সে।
বিবেকানন্দ তাঁর নাম নয়। তাঁর নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। এও তাঁর
স্কুলের নাম। তার আগে নাম ছিল বিশ্বেশ্বর। কাশীর বিশ্বনাথের
আরাধনায় জন্ম হয়েছিল বলে এই নাম হয়েছিল। কলেজে পাশ্চাত্য দর্শন
পড়ে তিনি নাস্তিক হতে যাচ্ছিলেন। নেম ঋষির মতো তাঁর প্রথম
জিজ্ঞাসা ছিল, কে দেখেছে ঈশ্বর, কেন আমরা তাঁকে মানব? একদিন
ব্রাহ্মনেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, 'মশাই,
আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন? আমায়ও কি দর্শন করাতে পারেন?'

মহর্ষি এ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বলেছিলেন, 'বাবা, তোমার চোখ
দুটি ঠিক যোগীদের মতো। একনিষ্ঠ হয়ে সাধন কর। তুমি সফলকাম হবে।

শুধু মহর্ষিকে নয়, অনেক সাধু মহাত্মাকে তিনি এই প্রশ্ন করেছিলেন।
কিন্তু কেউ তাঁকে বলেন নি যে ভগবানকে দেখেছি। মিথ্যা কথাও বলেন নি
কেউ। তারপর নিজের এক কাকার সঙ্গে যখন দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ
ঠাকুরের কাছে গিয়ে এই প্রশ্ন করলেন, তখন ঠাকুর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ
সরলতায় বললেন, 'সেকি গো, দেখেছি বৈকি! এই যেমন তোমাদের
দেখছি—এমনি করে তো রোজ দেখছি! শুধু তাই নয়, তোমাকেও দেখাতে
পারি। কিন্তু আমার কথামতো চলতে হবে।'

রাজী হয়ে গেলেন নরেন্দ্রনাথ। দীক্ষা নিলেন ঠাকুরের কাছে। নাস্তিক হলেন না, ব্রাহ্মও না। হিন্দু ধর্মকেই মেনে নিলেন, আর এই ধর্ম প্রচারেই আত্মনিয়োগ করলেন কায়মনোবাক্যে।

আঠাশ বছর বয়সে দক্ষিণ ভারতে গিয়ে তিনি সে দেশের মন জয় করেছিলেন। তাদেরই আগ্রহে তিনি তিন বছর পরে আমেরিকার সিকাগো শহরে উপস্থিত হলেন বিশ্বের ধর্মসভায় যোগ দিতে—পার্লামেণ্ট অফ রিলিজিয়নস্। তাঁর বক্তৃতা শুনে মোহিত হয়েছিল সে দেশের লোক হিন্দু-ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব তিনি প্রমাণ করেছিলেন। ইংলণ্ডেও তাই করেছিলেন। দ্বিতীয়বার আমেরিকা ও ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন ১৮৯৯ সালে, আর তার পরের বছর প্যারিসে কংগ্রেস অফ রিলিজিয়নে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে তিনি যা করেছিলেন তার তুলনা নেই কোন দেশের ইতিহাসে।

দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে শঙ্করাচার্য ভারত জয় করেছিলেন, আর বিবেকানন্দ জয় করেছিলেন বিশ্ব সামান্য পুঁজি নিয়ে আমেরিকায় পৌঁছে তিনি শুনলেন যে ধর্মসভায় বক্তাদের নাম আগে থেকেই ঠিক হয়ে গেছে। তারপরে কী করে সেই বক্তৃতার মঞ্চে উঠে সকলের চিত্ত জয় করলেন, সে যেন অবিশ্বাস্য কথা। সমবেত শ্রোতাদের তিনি ভাই বোন বলে সম্বোধন করেছিলেন। বলেছিলেন, 'পৃথিবীর প্রাচীনতম সন্ন্যাসী সংঘের পক্ষ থেকে আমি আজ আপনাদের সাধুবাদ জানাচ্ছি। সর্ব ধর্মের জননী স্বরূপ সনাতন ধর্মের প্রতিনিধিরূপে, সকল শ্রেণীর সকল মতের কোটি কোটি হিন্দুর পক্ষ থেকে আপনারা গ্রহণ করুন আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।' বললেন :

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু-কুটিল-নানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্য-স্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥

নদী যেমন নানা ধারায় প্রবাহিত হয় সমুদ্রের দিকে, তেমনি, হে প্রভু, বিচিত্র রুচির সরল ও কুটিল মানুষের তুমিই একমাত্র গন্তব্যস্থল। গীতায় আমাদের কৃষ্ণ বলেছেন, 'যে যেভাবে আমার উপাসনা করবে, আমি সেইভাবেই তার কাছে প্রকাশিত হই।' স্বামীজী এই সভায় দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার মৃত্যুকাল আসন্ন। স্বামীজীর যে জীবনী লিখেছিলেন রোমা রোলাঁ, তাতে বলেছেন যে এই সভায় সবাই বলেছিলেন নিজ নিজ ভগবানের কথা, একমাত্র বিবেকানন্দই বলেছিলেন

সকলের ভগবানের কথা। তাই এই বিশ্বধর্ম সম্মেলন তাঁকেই জানালেন শ্রেষ্ঠ বক্তার অভিনন্দন।

আদ্যাপীঠ

দক্ষিণেশ্বরের নিকটে আর একটি ধর্মস্থান আছে। তার নাম আদ্যাপীঠ। তিনটি শিখরবিশিষ্ট একটি সুন্দর মন্দির নির্মিত হয়েছে। গর্ভগৃহে কালীর মূর্তি বেদীর মাঝখানে. নিচে যোগাসনে রামকৃষ্ণ ও উপরে ওঁ বেষ্টিত রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। আদ্যাপীঠ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা অন্নদা ঠাকুর তাঁর স্বপ্নজীবন গ্রন্থে এই মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পাওয়া যায়।

কলকাতা থেকে বাসে দক্ষিণেশ্বর ও আদ্যাপীঠে যাতায়াত করা যায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে সাইকেল রিক্সাতেও আদ্যাপীঠে যাওয়া সম্ভব। বেলুড় মঠে যেতে হয় হাওড়া থেকে বাসে। দক্ষিণেশ্বর থেকে বিবেকানন্দ পুলের উপর দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে বালি হয়েও বেলুড়ে যাওয়া যায়। দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড়ে রেল ষ্টেশনও আছে। শিয়ালদহ থেকে দক্ষিণেশ্বর ও হাওড়া থেকে বেলুড়। দক্ষিণেশ্বর থেকে ট্রেনেও বালি গিয়ে বেলুড়ে আসা যায়।

গঙ্গাসাগর

গঙ্গাসাগর কলকাতার ৫৭ মাইল দক্ষিণে গঙ্গার মোহনায় একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান। একসময়ে লোকে বলত :

সব তীর্থ বার বার,
গঙ্গাসাগর একবার।

কিছু দিন আগেও লোকে এই কথা সত্য বলে বিশ্বাস করত। অগস্ত্য যাত্রার মতো সংসারের মায়া ত্যাগ করেই এই তীর্থে যেতে হত; আর প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারলে আশ্চর্য হত দশ গাঁয়ের লোক। সেকালে বন্ধ্যা নারী মানৎ করে সন্তান লাভ করলে গঙ্গাসাগরে বিসর্জন করত তার প্রথম সন্তান। দেড়শো বছরের কিছু বেশি আগে ইংরেজ আইন করে এই নৃশংস প্রথার উচ্ছেদ করে।

কলকাতা থেকে ৩০ মাইল দক্ষিণে গঙ্গার তীরে ডায়মণ্ড হারবার পর্যন্ত রেলপথ আছে। তারপরে বাসে কাকদ্বীপের উপর দিয়ে নামখানায় পৌঁছতে হয়। কলকাতা থেকেও সোজা সড়ক পথে নামখানায় পৌঁছনো

যায়। নামখানা থেকে নৌকা বা মোটর লঞ্চে বড়তলা খাঁড়ি পেরিয়ে সাগর দ্বীপ। গঙ্গাসাগরের মেলা হয় সাগর দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে। কলকাতা থেকে স্টীমারে গেলে গঙ্গাসাগর ৫০ মাইল দূরে।

সাংখ্য দর্শন প্রণেতা কপিল মুনির আশ্রম ছিল এইখানে। তিনি ছিলেন কর্দম প্রজাপতির পুত্র। নির্জন স্থানে একাগ্র মনে তপস্যার জন্য তিনি পৃথিবীর নিম্নভাগ পাতালে এই আশ্রম স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্রের জন্য বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। ইন্দ্র রাক্ষসের বেশে সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব হরণ করে কপিল মুনির আশ্রমে রেখে যান। রাজার ষাট হাজার পুত্র পাতালের এই আশ্রমে অশ্বকে দেখতে পেয়ে মুনিকে আক্রমণ করেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ মুনির শাপে তাঁরা ভস্ম হয়ে যান। এর পরে আসেন সগর রাজার পৌত্র অংশুমান, মুনিকে সন্তুষ্ট করে তিনি অশ্ব ফিরিয়ে নিয়ে যান। অংশুমানকে কপিল মুনি বলেছিলেন যে গঙ্গাজলের স্পর্শে সগর রাজার পুত্ররা উদ্ধার হবে। সগর বংশের ভগীরথ স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে মর্ত্যে এনে কপিল মুনির আশ্রমে নিয়ে আসেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা উদ্ধার হয়, আর এই গঙ্গাসাগর পরিণত হয় একটি তীর্থস্থানে।

এখানে কপিল মুনির মন্দিরে তিনটি মূর্তি আছে। কপিল মুনির বাম হাতে কমণ্ডলু ও ডান হাতে জপের মালা। আর দুটি মূর্তি নিয়ে কিছু মতভেদ আছে। কেউ বলেন যে একটি সমুদ্রের মূর্তি ও অপরটি ভগীরথের, আবার কেউ বলেন যে একটি মূর্তি মকর বাহিনী চতুর্ভুজা গঙ্গার, তার কোলে ভগীরথ এবং অপর মূর্তিটি সগর রাজার, তিনি যোগাসনে ধ্যানমগ্ন।

পৌষ মাসের মকর সংক্রান্তিতে এখানে মেলা হয়। প্রতি বছর ভারতের নানা স্থান থেকে এমনকি বিদেশ থেকেও চার পাঁচ লক্ষ যাত্রী এখানে আসেন। তাঁদের জন্য সব রকম ব্যবস্থা করা হয়। অন্য সময়েও যাত্রীদের বাসের জন্য কিছু ব্যবস্থা আছে এবং সুযোগ সুবিধাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সাংখ্য দর্শন হিন্দুর ষড়দর্শনের অন্তর্গত এই দর্শনে কপিল মুনি নিরীশ্বর বাদ প্রচার করেছিলেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নেই বলে তিনি তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে জগতের জন্ম জড় প্রকৃতি থেকে। প্রকৃতি অনাদি, পুরুষ বা আত্মাও অনাদি। কিন্তু আত্মা সৃষ্টি করে না, সে শুধু দ্রষ্টা। কর্মক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত আত্মা মানুষের কর্মফল অনুসারে দেহ থেকে দেহান্তরে প্রবেশ করে। বস্তু মাত্রই সৎ, আর সৎ

থেকেই অসতের উৎপত্তি। কপিল মুনি তাঁর মাতাকে সাংখ্য তত্ত্ব, পুরুষ ও প্রকৃতির প্রভেদ, অষ্টাঙ্গযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, কলা ইত্যাদি শিক্ষা দিয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক কালে এই অঞ্চল যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের অধিকারে ছিল। এই সাগর দ্বীপে তাঁর একটি দুর্গ ছিল এবং ফিরিঙ্গিরা তাঁর জলযান-গুলি এখানে মেরামত করত। অনেকের মতে ধুমঘাটে ছিল তাঁর রাজধানী এবং সাগরদ্বীপ থেকে ধুমঘাট পর্যন্ত জলপথের নাম এখনও ফিরিঙ্গি খাঁড়ি। অনেকে অবশ্য বলেন যে সাগর দ্বীপেই ছিল প্রতাপাদিত্যের রাজধানী এখানকার মাটির নিচে অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। নানা রকম মুদ্রা আর তাম্রলিপি দেখে এই অনুমান সত্য বলে মনে হয়।

এই তীর্থস্থানটি কিছু দিন আগেও ভয়াবহ ছিল নানা কারণে। একশো বছরের কিছু বেশি আগেও সংবাদ-প্রভাকরে খবর প্রকাশিত হত : এবারে এক মেজর সাহেব একদল সেনা নিয়ে সারাক্ষণ তোপ দাগার জন্য বাঘের ভয় খুব বেশি ছিল না। শুধু তিনজন নাবিক ও পঞ্চাশজন গঙ্গাসাগর যাত্রী বাঘের পেটে গেছে। অজগর-কুমীরের পেটে কজন গেছে, তার হিসাব নেই। তবে নৌকাডুবিতে অনেক যাত্রী মারা পড়েছে। কিন্তু প্রাণ নিয়ে ফিরে এসে যাত্রীরা বলেছে যে পয়সায় দুটো করে ডাব খেয়ে এসেছে, আর পকেটমার ধরা পড়েছে মিলিটারির হাতে।

এখন আর গঙ্গাসাগর যাত্রীদের ভয়ের কোন কারণ নেই। বৎসরের যে কোন সময়ে যাওয়া চলে। ডায়মণ্ড হারবারে সরকারী ও বেসরকারী বাসস্থান আছে, আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়েছে। মকর সংক্রান্তির মেলার সময়ে নানারকম ব্যবস্থা নেওয়া হয় যাত্রীদের সুবিধার জন্য গঙ্গাসাগর একটি সুন্দর তীর্থ, এখন এখানে বারবার যাওয়া চলে।

তমলুক

তমলুক বর্গভীমার মন্দিরের জন্য বিখ্যাত মেদিনীপুর জেলার এই শহরটি বর্তমানে অনাদৃত হলেও পুরাকালে এর গৌরবের কথা জানা যায়। তখন এই স্থানের নাম ছিল তাম্রলিপ্ত। মহাভারতের দ্রোণ পর্বে আছে যে সত্য যুগে পরশুরামের হাতে তাম্রলিপ্তের ক্ষত্রিয়রা নিহত হয়েছিল। ত্রেতা যুগে রামায়ণের কালে তাম্রলিপ্ত কলিঙ্গের অধীন ছিল বলে এর স্বতন্ত্র উল্লেখ

নেই। দ্বাপর যুগে মহাভারতের কালে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভীম তাম্রলিপ্তের রাজাকে জয় করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি কৌরবপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। দ্রোণ পর্বে তাঁকে ম্লেচ্ছদের রাজা বলা হয়েছে। এ কথা কেন প্রচলিত হয়েছিল তারও একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। তমসা মানে অজ্ঞানতা বা অন্ধকার লিপ্ত থেকে তাম্রলিপ্ত নামের উৎপত্তি। তার মানে এ দেশের লোক পাপে লিপ্ত হত, কিংবা ধর্ম মানত না বলেই ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত হয়েছিল। তমলুককে মৈমিনি বলেছেন রত্নগড়, আর রত্নাবতীপুর বলেছেন কাশীরাম দাস।

মৈমিনি ভারতে একটি সুন্দর গল্প আছে। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়ে তাম্রলিপ্তের রাজা ছিলেন ময়ূরধ্বজ। তাঁর পুত্র তাম্রধ্বজ যজ্ঞের অশ্ব বেঁধে কৃষ্ণার্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। যুদ্ধে কৃষ্ণ ও অর্জুন পরাজিত ও মূর্ছিত হলেন। এই সংবাদ পেয়ে হরিভক্ত রাজা তাঁর পুত্রকে ভর্ৎসনা করলেন। কিন্তু সংজ্ঞালাভের পর কৃষ্ণ ও অর্জুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে এলেন রাজার কাছে। বললেন, তোমার এক পুত্র এখন সিংহের মুখে, তাকে ফিরে পেতে হলে তোমার অর্ধেক শরীর দান করতে হবে। রাজা বললেন, তথাস্তু। স্ত্রী কুমুদ্বতী ও পুত্র তাম্রধ্বজকে বললেন, আমাকে দ্বিখণ্ড কর। রাজার আত্মত্যাগে মুগ্ধ হলেন কৃষ্ণ; আর কৃষ্ণের স্বরূপ দেখে রাজা তাঁর রাষ্ট্রৈশ্বর্য ত্যাগ করলেন।

এই গল্পে যা প্রমাণ হচ্ছে তা হল মহাভারতের কালে বাঙালীর বাহুবল, দানশীলতা ও ধর্মানুরাগ। পুরাণে আছে যে কল্কি অবতারে যুদ্ধক্লান্ত বিষ্ণুর দেহ থেকে এক বিন্দু ঘাম পড়ায় এই স্থান তাম্রলিপ্ত নামে পবিত্র হয়েছে। পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থ দিগ্বিজয় প্রকাশে এর নাম মাহাত্ম্য নিয়েও একটি গল্প আছে। সূর্য যেখানে সমুদ্রে লিপ্ত হয়েছেন, সেই তীর্থের নাম তাম্রলিপ্ত। কপাল মোচন এর অন্য নাম। দক্ষযজ্ঞ বিনাশের পরে শিবের পাপক্ষালন হয়েছিল তাম্রলিপ্তের বর্গভীমা ও জিষ্ণুনারায়ণের মন্দিরের মাঝে এক জলাশয়ে স্নান করে। অভিধান চিন্তামনিতে তমলুকের আরও অনেক নাম আছে। কল্কিরূপী বিষ্ণুর নামে বিষ্ণুগৃহ। সমুদ্রের কূলে অবস্থিত ছিল বলে নাম হয়েছিল বেলাকূল। এ ছাড়াও তমোলিপ্তি, তামলিপ্তি, দমলিপ্ত, তমালিকা, তমালিনী প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক কালে টলেমি বলেছেন তমালাইটেস, আর মেগাস্থিনিসের কথায় তলাক্তি। তারপরে চীনা

পরিব্রাজকেরা এসেছেন একে একে। পঞ্চম শতাব্দে ফা-হিয়েন এসে বললেন, তা-মো--লি-তি গঙ্গার মোহনায় একটি সমৃদ্ধ বন্দর। চব্বিশটি সংঘারাম ও বহু বৌদ্ধের বাস ছিল এখানে। বছর দুয়েক এ দেশে কাটিয়ে সিংহলে যাবার জন্য তিনি এইখানেই জাহাজে উঠেছিলেন। আর চোদ্দ দিন চোদ্দ রাত পরে পৌঁছেছিলেন সিংহলে। একদা এই বন্দর থেকেই বিজয় সিংহ তাঁর বিজয় সেনানী নিয়ে লঙ্কা জয়ের অভিযান করেছিলেন। আর সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র বোধিবৃক্ষের চারা নিয়ে লঙ্কায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে গিয়েছিলেন এখান থেকেই। হিউ-এন-চাঙ এসেছিলেন ফা-হিয়েনের দুশো বছর পরে। তান-মো-লি-তিকে তিনি সমুদ্রের ধারে দেখেছিলেন। বন্দরের সমৃদ্ধি ও মুক্তার ব্যবসা দেখেছিলেন, আর দেখেছিলেন দশটি সংঘারাম ও পঞ্চাশটি হিন্দু মন্দির।

বর্তমান তমলুক রূপনারায়ণের তীরে। এই রূপনারায়ণ মাইল বারো দূরে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয় সমুদ্রে পড়েছে। হাওড়া থেকে খড়্গপুরের পথে মেচাদা স্টেশন থেকে তমলুকের পথ ধরতে হয়। হলদিয়া বন্দরে ট্রেন চলাচল শুরু হবার পরে কলকাতা থেকে তমলুকে যাতায়াত আরও সহজ হয়েছে।

তমলুককে অনেকে উপপীঠ বলেন। বর্গভীমা কালীর উগ্র রূপ, তাঁর ভৈরব ভূতিনাথ। কুব্জিকা তন্ত্রে তমোলিপ্তির উল্লেখ আছে পীঠস্থান ও তীর্থস্থানের তালিকায়; দেবীর নাম তমোঘ্নী। এই দেবী জাগ্রত বলে সকলের বিশ্বাস। কালাপাহাড় নাকি এই দেবীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ধ্বংসের কথা ভুলে গিয়ে ফার্সিতে এক দলিল লিখে দিয়ে গেছেন মারাঠা বর্গীরাও তমলুকে এসে অত্যাচারের কথা ভুলে যেত, পূজা করত বর্গভীমার।

একটি কিংবদন্তী এখানে প্রচলিত আছে। একদিন ধনপতি সদাগর একজন লোকের হাতে একটি সোনার ভৃঙ্গার দেখতে পেয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলেন যে এখানকার এক কুণ্ডের জলে পিতল ডোবালে সোনা হয়। সদাগর অমনি বাজারের সব পিতলের বাসন কিনে জলে ডুবিয়ে সোনার বাসন করলেন। তারপরে সিংহলে গিয়ে সেই বাসন বিক্রি করে আনলেন অনেক টাকা। সেই টাকায় দেবীর মূর্তি এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করলেন।

এই সম্বন্ধে আরও একটি কিংবদন্তী আছে। এইটিই বেশি প্রচলিত। ময়ূর বংশের রাজা গরুড়ধ্বজকে মাছের জোগান দিত একটি জেলে। এক

দিন সে শোল মাছ দিতে পারেনি বলে রাজা তার প্রাণ দণ্ড দিলেন। কিন্তু সেই জেলে কোন রকমে পালিয়ে গেল জঙ্গলে। দেবী ভীমা তাকে সেই বনে দর্শন দিয়ে বললেন, তুমি মাছ ধরে শুকিয়ে রাখ, আর প্রতি দিন একটা করে শুকনো মাছ একটা কুণ্ডের জলে চুবিয়ে রাজার কাছে পৌঁছে দিও, তোমার শুকনো মাছ জলে তাজা হয়ে যাবে বলে সেই কুণ্ডটা তাকে দেখিয়ে দিলেন। জেলে তাই করে রোজ রাজাকে তাজা মাছ দিতে লাগল। আর রাজা আশ্চর্য হয়ে আসল ব্যাপারটা জেলের কাছ থেকে জেনে নিলেন এ দিকে দেবী আশ্রয় নিয়েছিলেন জেলের কুটীরে, আর জেলে রাজাকে কুণ্ডের কথা বলে দিয়েছে বুঝতে পেরে নিজে পাথর হয়ে সেই কুণ্ড ঢেকে রাখলেন। কুণ্ডের জল দেখতে না পেয়ে রাজা তারই উপরে মন্দির নির্মাণ করে দিলেন।

তমলুকে বর্গভীমার বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে একটি বৌদ্ধ বিহারের উপরে। শহরের দিক থেকে বাইশটি সিঁড়ি উঠে মন্দিরের সামনে পৌঁছতে হয় প্রথমেই নজরে পড়ে মন্দিরের স্থাপত্য রীতি প্রথমে সমতল ছাদের নাট মন্দির, তারপর বাংলা চারচালা মন্দিরের মতো জগমোহন ও শেষে উড়িষ্যার মন্দিরের মতো বড় দেউল বড় দেউল ও জগমোহনের মাঝে যে আচ্ছাদিত পথ, তার নাম জ্ঞানমণ্ডপ পাণ্ডাদের ধর্মালোচনার জন্য এই স্থানটি ব্যবহৃত হত। সমস্ত মন্দির প্রাঙ্গণটি উঁচু প্রাকারে ঘেরা, এবং সিঁড়ির উপরে নহবৎখানা। রূপনারায়ণ নদী প্রবাহিত হচ্ছে মন্দিরের পিছনে।

চতুর্ভুজা দেবী শবাশায়ী শিবের উপরে দণ্ডায়মান। দক্ষিণের উপরের হাতে ত্রিশূল ও তরবারি নিচের হাতে, বামে উপরের হাতে নরকপাল ও নিচের হাতে রাক্ষসের মুণ্ড। বেদীর উপরে আরও দুটি ছোট মূর্তি আছে— একটি শিবের ও অপরটি দশভুজা মহিষমর্দিনীর

তমলুকে একটি বিষ্ণুর মন্দির ও একটি বৌদ্ধ মন্দিরও আছে রাত্রি বাসের জন্য কয়েকটি দেশী হোটেল ও একটি ডাকবাংলো আছে।

এই অঞ্চলের আরও কয়েকটি মন্দিরের কথা উল্লেখযোগ্য। গড়বেতায় কয়েকটি মন্দির আছে, তার মধ্যে প্রধান হল সর্বমঙ্গলার মন্দির এই মন্দিরের দ্বার উত্তরমুখো বলে একটি কিংবদন্তী আছে। বিক্রমাদিত্যের আমলে এক যোগী এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। আর এই মন্দিরে শব-সাধনা করে বিক্রমাদিত্য দেবীর বরে—তালবেতাল সিদ্ধ হয়েছিলেন। তাদের শক্তি পরীক্ষায় বিক্রমাদিত্য এই মন্দিরকে উত্তরমুখো করেছিলেন।

কিন্তু আসলে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দের শেষ দিকে অথবা সপ্তদশ শতাব্দের প্রথমে। মন্দির স্থাপত্য উড়িষ্যার রেখা দেউলের মতো। প্রায় তিরিশ হাত লম্বা একটি অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ ধরে দেবীর নিকটে পৌঁছতে হয়। পুজারীর সাহায্য ছাড়া ত' সম্ভব নয়। দেবীর বিশাল ও ভয়ঙ্কর মূর্তি। পুরাকালে এই মন্দিরে নরবলি প্রচলিত ছিল।

চন্দ্রকোণা নামে একটি ঐতিহাসিক গ্রামে অসংখ্য পরিত্যক্ত মন্দির আছে। আধুনিক মন্দির আছে দুটি—লালজী ও মল্লেশ্বর মন্দির। এই দুই মন্দিরে নিত্য পূজা হয়।

দাঁতন মেদিনীপুর থেকে ৪০ মাইল দূরে একটি গ্রাম। এক সময়ে এই গ্রামের উপর দিয়ে জগন্নাথ ক্ষেত্র পুরী যাবার পথ ছিল। এখানে শ্যামলেশ্বর শিবের মন্দির। মন্দিরের সামনে পাথরের বিশাল নন্দী, তার সামনের পা দুটি ভাঙ্গা। লোকে বলে কালাপাহাড এই পা দুখানা ভেঙ্গে দিয়েছিল।

এক্তেশ্বর নামে একটি ছোট গ্রাম বাঁকুড়া শহর থেকে দু মাইল দূরে দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে। এই গ্রামটি এক্তেশ্বর শিবের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। এক্তেশ্বর একপাদ বা একপাদেশ্বর শিব। শিবের নানা রূপের মধ্যে একপাদ এমন একটি রূপ যা সচরাচর দেখা যায় না। এই রূপে শিবের একটি পা আর দুটি হাত। খানে কিংবদন্তী আছে যে সামন্তভূম ও মল্লভূমের রাজাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হলে শিব স্বয়ম্ভু রূপে এইখানে আবির্ভূত হয়ে দুই রাজ্যের সীমানা নির্ধারিত করে দেন। মন্দিরটি আকারে বিশাল এবং আকৃতিতে রেখা দেউলের মতো। মন্দিরের অভ্যন্তরে অনেকগুলি সিঁড়ি নিচে নেমে দেবতার নিকটে পোঁছতে হয়। পুরোহিতের প্রদীপ ছাডা আর কোনো আলো ভিতরে পৌঁছয় না। সব দেখে শুনে বিস্ময়াবিষ্ট হতে হয়। চৈত্র মাসের চড়ক পূজা এই মন্দিরের প্রধান উৎসব। হাওড়া থেকে বাঁকুড়ার ট্রেন আছে, বাসেও যাওয়া যায়। রেল স্টেশন বা শহর থেকে সাইকেল রিক্সায় মন্দিরে যাতায়াত করতে হয়।

বিষ্ণুপুর বাঁকুড়ার নিকটে একটি মন্দিরের শহর। কলকাতা থেকে যে ট্রেন রাতে হাওড়া ছেড়ে ভোরবেলায় বাঁকুডা পোঁছয়, সেই ট্রেন থেকেই বিষ্ণুপুরে নেমে পড়া যায়। চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই এটি ছিল মল্লরাজাদের রাজধানী। এখানকার মল্লেশ্বর শিবের মন্দিরটি সবচেয়ে প্রাচীন, এটি নির্মিত হয়েছিল ১৬২২ বা ১৬৪৩ সালে শৈব রাজা বীর সিংহের আমলে। বীর

হাম্বার বৈষ্ণব হবার পরে অনেক বিষ্ণুমন্দির নির্মিত হয়। তখন মদনমোহন ছিলেন রাজাদের কুলদেবতা। তাঁর মন্দির তৈরি হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দের শেষের দিকে। ইটের তৈরি একরত্ন মন্দির বাঙলার নিজস্ব রীতির। লালজীউ ও রাধেশ্যামের মন্দিরও একই রকমের, কিন্তু পাথরে তৈরি। পঞ্চরত্ন মন্দিরের নমুনা হল শ্যামরায় ও মদনগোপালের মন্দির। তার পাঁচটি করে শিখর। আর জোড় বাঙলার মন্দিরে পাশাপাশি সংলগ্ন দুটি কুঁড়ের মাঝে ছোট একটি শিখর বিশিষ্ট যুগ্ম মন্দির। এ ছাড়াও আরও অনেক মন্দির আছে, কিন্তু দেবতার বিগ্রহ নেই সব মন্দিরে। বিগ্রহগুলি এখন রাধেশ্যামের মন্দিরে এনে রাখা হয়েছে, নিত্য পূজা হয় এই মন্দিরে।

শুধু মদনমোহনের মন্দিরে এখনও বিগ্রহ আছে এবং সেখানে নিত্য পূজা হয় কিন্তু সে নাকি নকল মদনমোহন। আসল মদনমোহন আছেন কলকাতার বাগবাজারে। বিষ্ণুপুরের মদনমোহন কী করে বাগবাজারে গেলেন তার একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। অর্থাভাবে রাজা দামোদর সিংহ কলকাতার গোকুল মিত্রের নিকটে এক লক্ষ টাকায় বিগ্রহ বাঁধা রেখেছিলেন। বিষ্ণুপুর রাজ্যের তখন শেষ অবস্থা, রাজার দুর্ভাগ্যের অন্ত নেই। তবু অনেক চেষ্টা করে রাজা তাঁর কুলদেবতাকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করলেন, মন্ত্রীকে টাকা দিয়ে পাঠালেন কলকাতায়। গোকুল মিত্র টাকা নিলেন, কিন্তু বিগ্রহ ফেরৎ দিলেন না। মামলা হল সুপ্রীম কোর্টে। হেরে গিয়ে গোকুল মিত্র নকল মদনমোহন দিলেন বিষ্ণুপুরের রাজাকে আর আসল মদনমোহন বাগবাজারেই প্রতিষ্ঠিত রইলেন

সরকারী টুরিষ্ট লজ হয়েছে, ডর্মিটরি ও অন্যান্য ব্যবস্থা। দেশী হোটেলও আছে। বাঁকুড়া থেকে বাস যাতায়াত করে। জয়রামবাটি ও কামারপুকুরেও যাওয়া যায় বাসে। শহরে বেড়াবার জন্যে সাইকেল রিক্সা আছে।

তারকেশ্বর

তারকেশ্বর কলকাতা থেকে ৩৬ মাইল দূরে বাঙলার একটি বিখ্যাত শৈব তীর্থ। তারকেশ্বর শিবের মন্দির। শ্রাবণ মাসের কোন সোমবারে এই তীর্থে গেলে সেই স্মৃতি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। শিবের জন্মমাস হল

শ্রাবণ, আর সোমবার হল শিবের বার। শিবের প্রিয় দেবতা সোম, চন্দ্রাবতংস তাঁর মাথার ভূষণ।

বৈদ্যনাথে যেমন দলে দলে যাত্রী আসে বাঁকে গঙ্গাজল নিয়ে, তারকেশ্বরেও তেমনি সারা শ্রাবণমাস ধরে অগণিত যাত্রী ভারতের সব জায়গা থেকে শেওড়াফুলি জংসন স্টেশনে এসে নামে এই কাজের জন্য। স্টেশন থেকে আধ মাইল দূরে গঙ্গায় নিমাইতীর্থ ঘাট। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই ঘাটে স্নান করে এটিকে তীর্থে পরিণত করে গেছেন। যাত্রীরা এই ঘাট থেকেই গঙ্গাজল সংগ্রহ করে, আর এই ঘাটে যাবার পথের দুধারেই প্রয়োজনীয় সব কিছু পাওয়া যায়—বাঁশের বাঁক, মাটির কলসী, দড়ি, ঘণ্টা, নূপুর, সাজসজ্জা, ফুল মালা, ধূপ দীপ। একটা দাঁড়ের উপরে এই সব জিনিস রেখে গঙ্গাস্নান করে বাঁকে গঙ্গাজলের কলসী নিয়ে তারকেশ্বর যাত্রা। দূরত্ব চব্বিশ মাইলের কম নয়, আর এই পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দিতে হয়। আগে মেয়েরা সাহস পেত না, এখন তারাও এগিয়ে এসেছে। শুধু অশিক্ষিত ধর্মান্ধ স্ত্রী পুরুষ নয়, শুধু বাঙলার নরনারীও নয়, ভারতবর্ষের নানা স্থান থেকে বহু মানুষ প্রতি দিন দুপুরে এসে শেওড়াফুলি স্টেশনে নামে, আর বিকেলের দিকে যাত্রা করে তারকেশ্বর। এদের মধ্যে শিক্ষিত যুবক যুবতীর সংখ্যাও কম নয় বাঁধানো পথ ধরে দলে দলে লোক চলে। বাঙালীই বেশি, কিন্তু মুখে হিন্দী বুলি: 'ভোলে বাবা পার করে গা, তারকনাথ পার করে গা'। কখনও বলে: 'ভোলে বম, তারক বম' ঘণ্টা বা নূপুরের ঝুন ঝুন শব্দ, আর দেবতার নাম। কিন্তু একটানা যেতে হয় না, বিশ্রামের জায়গা আছে স্থানে স্থানে। শেওড়াফুলি থেকে সোজা পথে না এগিয়ে একটু ঘোরা পথে গেলেই পাঁচ মাইলের পরে ডাকাতে কালীবাড়ি। যারা এই পথে আসবে, তারা দুটো কলসীর উপরে দুটো ছোট ঘটে গঙ্গাজল আনবে মায়ের জন্য। মায়ের পায়ে জল চড়িয়ে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে এগিয়ে যাবে। হিমালয়ের পথের মতো এই পথেও চটি আছে চোদ্দ মাইলের মাথায়, কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতির চটি। অনেকটা জায়গা জুড়ে যাত্রীদের বিশ্রামের স্থান। চা ও শরবৎ পাওয়া যায় বিনে পয়সায়। যাত্রীরা আসে, দাঁড়ের উপরে বাঁক টাঙিয়ে রেখে বিশ্রাম নেয়। কেউ চা খায়, কেউ খায় শরবৎ। খানিকটা সুস্থ হয়ে আবার এগোয়। আরও কয়েকটি ছোট খাটো চটি পেরিয়ে নন্দকুঠীর বড় চটি। মারবাড়ীরাই এই সব চটি পরিচালনা

করে। মন্দকুঠী থেকে তারকেশ্বর পাঁচ মাইলের পথ, কিন্তু মাঝখানে আছেন লোকনাথ শিব। তাঁর মাথায় দিতে হয় এক কলসী জল। হাজার দু হাজার যাত্রীর লাইন লেগে থাকে সারাক্ষণ, কিন্তু আধঘণ্টার বেশি সময় লাগে না। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক নিঃস্বার্থভাবে যাত্রীদের সেবা করে তারকেশ্বর পৌঁছতে রাত ফুরিয়ে যায়। বাবার মঙ্গল আরতি হয় ভোর চারটের সময়। ততক্ষণ যাত্রীদের অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু এখানে কোন বিশ্রামের জায়গা নেই। স্থানাভাবে ভিড়, অব্যবস্থা ও মন্দির কর্তৃপক্ষের ঔদাসিন্য। অশেষ কষ্টভোগ করে কলসীর জল বাবা তারকেশ্বরের মাথায় চড়াতে হয়। লোকে মানৎ করে আসে, আর সেই সংকল্প পূর্ণ হয়েছে ভেবে নিশ্চিন্ত হয়।

তারকেশ্বর খুব প্রাচীন তীর্থ নয়। ভারামল্ল নামে রামনগরের যে রাজা এই মন্দির নির্মাণ করে দেন বলে সবাই বিশ্বাস করে, তাঁর কাল হল অষ্টাদশ শতাব্দী। ঐতিহাসিক অনুমানে ১৭২৯ সালে তিনি একটি মঠ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পত্তি দান করেন। অযোধ্যার নবাবের ভয়ে এই রাজপুত পরিবার পালিয়ে এসে তারকেশ্বরের মাইল তিনেক দূরে এই রামনগর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এঁদের নিয়ে একটা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। বিষ্ণুদাস ছিলেন বড় ভাই আর ছোট ভাই ভারামল্ল। গ্রামের লোকের কাছে কর আদায়ের দায়ে মুর্শিদাবাদের নবাবের হাতে দুই ভাই বন্দী হয়েছিলেন। বড় ভাই বিষ্ণুদাস ছিলেন বিষ্ণুর ভক্ত, তাঁর বুকের ভিতর শালগ্রাম শিলা লুকনো থাকত। তিনি বললেন, দেবতাকে উপবাসী রেখে তো নিজে খাওয়া যায় না, আমি উপবাসে প্রাণত্যাগ করব। নবাব এই খবর পেয়ে দেবতার মহিমা দেখতে চাইলেন। একটা জলন্ত শাবল এনে বিষ্ণুদাসকে দুহাতে সেটা ধরতে বললেন। নির্ভীক বিষ্ণুদাস নারায়ণ নারায়ণ বলে দুহাতে সেই শাবল চেপে ধরলেন। সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখল যে তাঁর হাতে একটা ছ্যাঁকাও লাগল না। বিস্মিত নবাব দুই ভাইকে মুক্তি দিয়ে বললেন, বিষ্ণুদাসকে রাজা আর ভারামল্লকে রাও উপাধি দেওয়া হল।

এই ভারামল্লের নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে তারকেশ্বর আবিষ্কারের কিংবদন্তী। তাঁর একটি গাভীর নাম ছিল কপিলা। হঠাৎ দেখা গেল যে কপিলার দুধ কমে গেছে। রাজার দরবারে ডাক পড়ল মুকুন্দ ঘোষ গোয়ালার। জানা গেল যে বনের মধ্যে একখণ্ড পাথরের উপর কপিলা

দুধ দিত। গ্রামের মেয়েরা এই পাথরের উপরে ধান ভানত বলে তার উপরে একটা গর্ত ছিল। মুকুন্দ ঘোষ আবিষ্কার করেন যে এটি স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ। খবর পেয়ে ভারামল্ল এই শিবলিঙ্গ নিজের গ্রামে তুলে আনবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু একশো জন মজুর বারো দিন মাটি খুঁড়েও তার মূল খুঁজে পেল না। শেষ পর্যন্ত সেইখানেই জঙ্গল কেটে মন্দির তৈরি করা হল।

কেউ বলে মুকুন্দ ঘোষই তারকেশ্বরের প্রথম মোহান্ত, কেউ বলে রাজা ভারামল্ল সন্ন্যাসী হয়ে প্রথম মোহান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু মেনে নেওয়া হয়েছে যে রাজা ভারামল্ল সন্ন্যাসী মায়াগিরিকে মঠ স্থাপনের অনুমতি দিয়ে তাঁকেই প্রথম মোহান্ত করেছিলেন। তারপরে মোহান্ত হয়েছেন শিষ্যানুক্রমে। এঁদের সম্বন্ধেও অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে—পাঠানদের সঙ্গে সন্ন্যাসীদের যুদ্ধ, তাঁদের পদচ্যুতি, ব্যবসায় মঠ ক্রয়-বিক্রয়, এলোকেশীর সতীত্ব নাশের অপরাধে মোহান্ত মাধবচন্দ্র গিরির কারাদণ্ড ভোগ ও মামলা করে পুনরায় মোহান্ত পদ লাভ, রেলওয়ের পানিপাঁড়ে সতীশচন্দ্র গিরির মোহান্ত পদ লাভ। এঁদের অত্যাচার ও দুর্নীতির প্রতিবাদে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রকেও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নামতে হয়েছিল। এই সত্যাগ্রহ চলেছিল প্রায় দু মাস। স্বামী বিশ্বানন্দ ও সচ্চিদানন্দের সঙ্গে আরও অনেকে কারাবরণ করেছিলেন, কিন্তু মোহান্তকেও পালিয়ে যেতে হয়েছিল। কিছু দিন সরকারী রিসিভারের হাতে থাকবার পরে মন্দির আবার মোহান্তদের হাতে এসেছে।

তারকেশ্বরে অনেক অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে। প্রথম অলৌকিক গল্প হল তারকেশ্বরের প্রথম সেবায়েতের। নাম তাঁর চতুর্ভুজ গাঙ্গুলী। তিনি ছিলেন জন্মান্ধ। রাজা ভারামল্ল স্বপ্নে এই ব্রাহ্মণের সন্ধান পেয়েছিলেন আর ব্রাহ্মণ এই আদেশ পেয়ে ভেবেছিলেন, জন্মান্ধ হয়ে এই দায়ীত্ব কী করে বহন করবেন! তারপরে তিনিও স্বপ্ন দেখলেন রাতে। মন্দিরের পশ্চিমে দুধ কুবে স্নান করলেই দৃষ্টি ফিরে পাবেন। পেলেনও তাই।

এমনি আরও অনেক গল্প আছে—বোবার বোলের গল্প, পাট কাটির বাঁকে সুতোয় কলসী ঝুলিয়ে গঙ্গাজল আনার গল্প, মুসলমানের হাত থেকে দুধ খাবার গল্প।

যাত্রীরা এসে প্রথমে দুধপুকুরে স্নান করে, কিংবা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে মাথায় জল ছিটিয়ে আসে। তারপরে মন্দিরে প্রবেশের জন্য লাইন দেয়। বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করে দিয়েছেন বর্ধমানের মহারাজা। বাইরেটা বাঙলার কুঁড়েঘরের মতো, আর দ্বিতীয় চালের উপরে তিনটি ছোট শিখর। চারিদিকে প্রদক্ষিণের পথ আছে। সামনে একটি পাথরের ঘর নির্মাণ করে দিয়েছিলেন হাওড়ার চিন্তামনি দে। মন্দিরের অভ্যন্তরে তারকেশ্বরের লিঙ্গমূর্তি একটি ধাতুর টোপরে ঢাকা থাকে। বাসুদেবের মূর্তি ও পটে-আঁকা দুর্গা অন্নপূর্ণা ও কালিকার চিত্র অন্ধকারে দেখা যায় না।

তারকেশ্বরে কয়েকটি ছোট ছোট মন্দিরও আছে : পূর্বে কালী মায়ের মন্দির, উত্তরে দামোদর ঠাকুরের মন্দির, দক্ষিণ পশ্চিমে মোহান্তের প্রাসাদের পাশে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির। নাট মন্দির দক্ষিণ দিকে নহবৎখানার কাছে। মুকুন্দ ঘোষের একটি সমাধিস্থানও আছে।

তারকেশ্বরে যাত্রীর দণ্ড খাটার দৃশ্যও দেখতে পাওয়া যায়। কোন কোন যাত্রী মানৎ করে দণ্ড কেটে মন্দির পরিক্রমা করেন। সাষ্টাঙ্গে মাটিতে শুয়ে পড়তে হয় সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে, তারপরে হাত দিয়ে মাটিতে একটা দাগ টেনে সেই দাগে পা রেখে আবার তেমনি করে শুয়ে পড়তে হয়। এই ভাবেই মন্দির পরিক্রমা। প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যেও যাত্রীরা পথ ছেড়ে দেন। রোগ মুক্তির জন্য যাত্রী ধর্ণা দিতেও আসেন। বাবার স্বপ্নাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত অনাহারে অর্ধাহারে শুধু চরণামৃত পান করে পড়ে থাকেন অনির্দিষ্ট কাল।

ট্রেনে হাওড়া থেকে তারকেশ্বরে পৌঁছতে ঘণ্টা দুই সময় লাগে। প্রায় প্রতি ঘণ্টায় ট্রেন আছে। স্টেশন থেকে অল্প দূরে বাজার, বাজারের মধ্য দিয়ে মন্দিরের পথ। এখানে দুটো ধর্মশালা আছে মারবাড়ীদের, আর কিছু যাত্রী নিবাসও আছে। দুপুরের আহার ও জলখাবার পাওয়া যায় বাজারে। স্টেশন থেকে সাইকেল রিক্সা পাওয়া যায়। প্রতি বছর বড মেলা হয় তিনটি : শ্রাবণে মারবাড়ী মেলা, ফাল্গুনে শিবরাত্রি ও গাজনের মেলা বসে চৈত্র সংক্রান্তিতে।

বক্রেশ্বর

অণ্ডাল-সাঁইথিয়া লাইনে দুবরাজপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে পাঁচ মাইল

উত্তর পশ্চিমে বক্রেশ্বর একটি মহাপীঠ। শিব চরিতের মতে সতীর দক্ষিণ বাহু পড়েছিল এইখানে। দেবী বক্রেশ্বরী ও ভৈরব বক্রেশ্বর। তন্ত্র চূড়ামণির মতে সতীর মন এইখানে পড়েছিল, দেবী মহিষমর্দিনী ও ভৈরব বক্রনাথ। আবার শিবচরিতে বক্রনাথও একটি পীঠস্থান। এখানে সতীর মন পড়েছিল, দেবী পাপহরা ও ভৈরব বক্রনাথ।

বীরভূম জেলার সদর সিউড়ি থেকে এই জায়গার দূরত্ব ১৪ মাইল। অণ্ডাল ও সিউড়ি থেকে সড়ক পথে আসা যায়, কিন্তু যানবাহনের বিশেষ সুবিধা নেই। কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে টুরিস্ট বাস যাতায়াত করে তীর্থ মাহাত্ম্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য অগণিত যাত্রী এখানে যাতায়াত করেন। বক্রেশ্বর মুখ্যত একটি তীর্থস্থান এবং যাত্রীদের প্রয়োজনেই এখানে একটি লোকালয় গড়ে উঠেছে। কতগুলি উষ্ণ ও শীতল জলের প্রস্রবণ এই স্থানের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

এই স্থানের উত্তর ও পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে বক্রেশ্বর নামে একটি নদী, আর দক্ষিণে পাপহরা নামে আর একটি নদী প্রবাহিত হয়েছে। এই নদীর তীরেই একটি মহাশ্মশান আছে। নদীটি সর্বপাপহরা বলে খ্যাত বলে শ্মশানে প্রায় সারাক্ষণই চিতার আগুন দেখতে পাওয়া যায়। শ্মশানের মাঝখানেই সিদ্ধ তান্ত্রিক অঘোরি বাবার সমাধি। তিনি এই শ্মশানেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আরও অনেক তান্ত্রিক এখানে সিদ্ধির জন্যে সাধনা করেছেন বলে জনশ্রুতি। অঘোরি বাবার সম্বন্ধে এখানে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এখনও নাকি গভীর রাতে তাঁকে ভৈরব ও ভৈরবী পরিবৃত অবস্থায় নরকপাল থেকে কিছু পান করতে দেখা যায়।

বক্রেশ্বরে অনেকগুলি মন্দির আছে। তার অধিকাংশই চারচালা বাঙলা মন্দির হলেও কতগুলি উড়িষ্যার রেখা দেউলের মতো মন্দিরও আছে। মূল মন্দিরটি বক্রনাথের। এটি ঠিক বাঙলা মন্দির নয়, কতকটা উড়িষ্যার রেখা দেউলের মতোই। এই মন্দিরের শিখর ও আমলক অনেক দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার অনেক মন্দিরেই এখন আর দেবতা নেই। মন্দিরে যে সব মূর্তি আছে তার মধ্যে প্রধান হল একটি দশভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি। কিছুদিন আগে একটি পুকুর থেকে পাওয়া গেছে একটি অষ্টাদশ-ভুজা মহিষমর্দিনীর মূর্তি। এটি এখন পূজারীর গৃহে প্রতিষ্ঠিত। একটি ভৈরব মূর্তি আবিষ্কার করে তার প্রতিষ্ঠা করেছেন খাকি বাবা নামে একজন

সিদ্ধ তান্ত্রিক। একটা গাছের নিচে যে হরগৌরীর মূর্তি আছে, তা কালাপাহাড ধ্বংস করেছে বলে জনশ্রুতি।

অষ্টাবক্রের মন্দিরের সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী এখানে প্রচলিত আছে। অষ্টাবক্রের অঙ্গ তখন অষ্টাবক্র ছিল না। তিনি সুস্থ সবল দেহে লোমশ মুনির সঙ্গে লক্ষ্মীর স্বয়ম্বর সভায় গিয়েছিলেন। সেখানে লোমশ মুনিকে আগে অভ্যর্থনা করার জন্য অষ্টাবক্র এমন রেগে যান যে তার দেহ আট জায়গায় বেঁকে যায়। তারপরে তিনি গৌড়ের গুপ্তকাশীতে তপস্যার আদেশ পেয়ে বক্রেশ্বরে এসে দশহাজার বছর শিবের তপস্যা করেন। শিব সন্তুষ্ট হয়ে বলেন যে এখানে শিবের পূজার পূর্বে অষ্টাবক্রের পূজা করতে হবে। বিশ্বকর্মা এসে বক্রেশ্বর নদীর তীরে যে মন্দির নির্মাণ করে দেন, এখন সে মন্দির দেখে অষ্টাদশ শতাব্দীর মন্দির বলে মনে হয়।

বক্রেশ্বরে আটটি উষ্ণজলের প্রস্রবণ আছে এবং তা থেকে সারাক্ষণ ধূম নির্গত হয়। কুণ্ডগুলি বাঁধানো, কোনটি ছ হাতের চতুষ্কোণ, আবার কোনটি একদিকে কুড়ি হাত ও অন্যদিকে পঞ্চাশ হাত, আর গভীরতায় ছ হাতেরও বেশি। কুণ্ডে নেমে স্নান করবার জন্য বাঁধানো সিঁড়ি আছে। সবচেয়ে উষ্ণ হল অগ্নিকুণ্ডের জল, তার উত্তাপ প্রায় ২০০ ডিগ্রী ফারেনহিট। আর বারো ডিগ্রী বেশি হলেই জল ফুটত। পৌষ মাসেও এই জলের উষ্ণতা থাকে ১৬২ ডিগ্রী।

প্রত্যেকটি কুণ্ডের একটি করে নাম ও তার কিংবদন্তী আছে। নৃসিংহ অবতার মূর্তিতে বিষ্ণু হিরণ্যকশিপু বধ করেছিলেন। এর পর প্রহ্লাদ নিজেকে তাঁর পিতার মৃত্যুর নিমিত্ত ভেবে নানা তীর্থ পর্যটন করে বক্রেশ্বরে এসে অগ্নিকুণ্ডে স্নান ও শিবের পূজা করে মুক্তিলাভ করেন। অনেকে অন্য কথা বলেন – হিরণ্যকশিপুকে বধ করে নৃসিংহদেবের নখে জ্বালা উপস্থিত হয়, সেই জ্বালা নিজের দেহে টেনে নেন অষ্টাবক্রমুনি। তারপরে নৃসিংহ দেবের কথায় এই কুণ্ডের জলে স্নান করে তাঁর জ্বালা উপশম হয়। আবার কেউ বলেন যে অষ্টাবক্র মুনিকে কষ্ট পেতে দেখে নৃসিংহ দেব তাঁকে বক্রনাথ শিবকে স্পর্শ করতে বলেন। আর বক্রনাথের গহ্বরে নামতেই তাঁর জ্বালা যন্ত্রণা সব দূর হয়ে যায়। ব্রহ্মা-কুণ্ডের সম্বন্ধে এই কিংবদন্তী যে একদা ব্রহ্মা তাঁর কন্যার দিকে লালসার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিলেন, আর এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেন শিব।

ব্রহ্মা বক্রেশ্বরের এই কুণ্ডে স্নান ও শিবের পূজা করে পাপমুক্ত হন। সবচেয়ে বড় কুণ্ডের নাম শেত গঙ্গা। বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের রাজা শেত শিবকে সন্তুষ্ট করে নিজের নাম দিয়েছেন এই কুণ্ডের। গৌরী বা পার্বতীর তপস্যায় একটি কুণ্ডের নাম হয়েছে সৌভাগ্যকুণ্ড। এই কুণ্ডের জলে স্নান করে তিনি শিবের কৃপালাভ করেছিলেন। আর একটি কুণ্ডের নাম সূর্যকুণ্ড। দেবর্ষি নারদের নিকট সুমেরুর প্রশংসা শুনে বিন্ধ্য এত উঁচু হয়ে ওঠেন যে সূর্যের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সূর্য তখন এইখানে এসে এই কুণ্ডের জলে স্নান করে শিবকে সন্তুষ্ট করবার পরে বিন্ধ্য মাথা নত করে। বিন্ধ্যের প্রসঙ্গে অগস্ত্য মুনির কাহিনীও আছে। বিন্ধ্যকে নত হয়ে থাকবার আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর গুরু অগস্ত্য। জীবনকুণ্ডের সম্বন্ধেও একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। শর্ব ও চারুমতী নামে এক ধার্মিক দম্পতি সংসার ত্যাগ করে বনে তপস্যা করছিল। একদিন একটা বাঘ শর্বকে বধ করে, আর স্ত্রী চারুমতি শিবকে সন্তুষ্ট করে এই বর পান যে শর্বের অস্থি এই কুণ্ডে বিসর্জন দিলে শর্ব নব জীবন লাভ করবে। কুণ্ডের জলে অস্থি বিসর্জন করে চারুমতী তার স্বামীকে ফিরে পেয়েছিল। এখন আর জীবন ফিরে পাওয়া যায় না, কিন্তু স্বল্পায়ু সন্তানের মায়েরা এই কুণ্ডের জলে স্নান করে তাদের দীর্ঘ জীবনের আশায়। ভৈরবকুণ্ডের সম্বন্ধেও একটি কাহিনী আছে। পুরাকালে শিব ও ব্রহ্মা দুজনেরই পাঁচটি করে মাথা ছিল। তার জন্য ব্রহ্মা শিবের সমকক্ষ ভাবতেন। একদিন শিব রেগে তাঁর একটি জটা ছিঁড়ে মাটিতে ফেলতেই তা থেকে বটুক ভৈরবের জন্ম হল। শিব তাঁকে ব্রহ্মার একটি মুণ্ড কাটবার আদেশ দিতেই বটুক ভৈরব সেই আদেশ পালন করে বিপদে পড়লেন, মুণ্ডটি তাঁর হাতে আটকে রইল। কাশীতে সেই মুণ্ডটি খসে পড়লেও হাতে একটা ক্ষত থেকে গেল। সেই ক্ষত দূর হল বক্রেশ্বরের এই কুণ্ডে স্নান করে। পুরাণে অন্য কথা আছে। একদা শিবকে অপমান করার জন্য তাঁর তৃতীয় নেত্রের আগুনে একটি মাথা দগ্ধ হয়ে যায়। আর একটি কুণ্ডের নাম খার-কুণ্ড। অগস্ত্য সমুদ্রের সমস্ত জল পান করে দেখবার পরে সমুদ্র এই কুণ্ডে স্নান ও শিবের পূজা করে তার জল ফিরে পায়।

এই সমস্ত কাহিনীর আড়ালে একটি সত্য আছে। সেটি হল এই সব কুণ্ডের জলের গুণ। পাণ্ডারা বলেন যে এই জলে চর্মরোগ সারে, সারে বাত। কুণ্ডের জল পান করে বহুমূত্র রোগ ও ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসও আরোগ্য

হয়। রাজ্য সরকার কলকাতায় এই জল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন। বক্রেশ্বরে কয়েকটি শীতল জলের কুণ্ডও আছে। শিবরাত্রি বক্রেশ্বরের সবচেয়ে বড় উৎসব। বাসস্থান ও যানবাহনের নিয়মিত ব্যবস্থা হলে এই তীর্থ ভ্রমণবিলাসীদের নিকটেও জনপ্রিয় হয়ে উঠত। বিহারের রাজগিরের চেয়েও বেশি আকর্ষণীয় হত এই বক্রেশ্বর।

দুবরাজপুর থেকে ২ মাইল পশ্চিমে **দন্তেশ্বরী** একটি পীঠস্থান বলে পরিচিত। স্থানীয় লোকে দাবী করেন যে সতীর দন্ত পড়েছিল এইখানে। দেবী দন্তেশ্বরী ও ভৈরব যাগেশ্বর। কিন্তু শিবচরিতের মতে সতীর ঊর্ধ্ব ও অধো দন্ত পড়েছিল অনল ও পঞ্চসাগর নামে দুইটি স্থানে। অনলে দেবী নারায়ণী ও ভৈরব সংক্রূর এবং পঞ্চসাগরে দেবী বারাহী ও ভৈরব মহারুদ্র। কিন্তু এ দুটি স্থান কোথায় তা জানা যায় না।

বাঙলায় আরও অনেক পীঠস্থান আছে, যা মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না। শিবচরিত বা তন্ত্রের নামোল্লেখ দেখে সে সব খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। যেমন করতোয়া তট বা ত্রিস্রোতা। এই সব নদীর নাম। নদীর কোন্ স্থানে পীঠস্থানের অবস্থান তার উল্লেখ নেই। কাজেই স্থানীয় লোকের দাবী মেনে নিতে হয়। **করতোয়া তটে** সতীর বাম কর্ণ পড়েছিল। দেবী অপর্ণা ও ভৈরব বামেশ। মহাভারতের মতে এই করতোয়া নদী অতি প্রাচীন কাল থেকেই পবিত্র বলে পরিচিত। হর-পার্বতীর বিবাহের সময়ে শিবের কর থেকে ক্ষরিত তোয় বা জল থেকে এই নদীর উৎপত্তি। বর্ষাকালে সকল নদীর জল অশুচি হয়, কিন্তু করতোয়ার জল সর্বদাই পবিত্র। তীর্থস্থানের মধ্যে গণ্য এই নদীর তটে ত্রিরাত্র উপবাসে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। **উজানিতে** পড়েছিল সতীর বাম কনুই। দেবী এখানে মঙ্গলচণ্ডী এবং ভৈরব কপিলাম্বর। দেবীকে অনেকে সর্বমঙ্গলা বলেন। **বহুলায়** পড়েছিল সতীর বামবাহু। দেবীর নাম বহুলা এবং ভীরুক ভৈরব। এই স্থানের বর্তমান নাম কেতুগ্রাম। **ক্ষীরগ্রাম** কাটোয়া থেকে ৩ মাইল দূরে। এখানে সতীর দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠ পড়েছিল। দেবীর নাম যোগাদ্যা

ও ভৈরব ক্ষীরখণ্ড। কোঁকামুখে সতীর কুক্ষি বা কোঁক পড়েছিল বলে দেবী এখানে কোঁকেশ্বরী এবং ভৈরব কোঁকেশ্বর।

এই অঞ্চলে অনেকগুলি উপপীঠও আছে। কিরীটকোনায় সতীর কিরীট পড়েছিল। দেবী এখানে ভুবনেশী এবং ভৈরব কিরীটি। কিরীটকোনা মুর্শিদাবাদ শহরের নিকটে গঙ্গার পরপারে অবস্থিত একটি নগণ্য গ্রাম। বর্তমানে দেবী কিরীটেশ্বরী নামে পরিচিত। নলস্থানে সতীর দক্ষিণ গণ্ডাংশ পড়েছিল। দেবী সেখানে ভ্রমরী ও বিরূপাক্ষ হলেন ভৈরব। অট্টহাসে ওষ্ঠাংশ পড়েছিল সতীর। দেবী ফুল্লরা ও ভৈরব বিশ্বনাথ। বীরভূম জেলার লাভপুরও একটি পীঠস্থান নামে পরিচিত। সতীর অধরোষ্ঠ পড়েছিল এখানে। দেবী ফুল্লরা ও ভৈরব বিল্লেশ। সতীর অঙ্গ ও দেবীর নামেব মিল দেখে অনুমান হয় যে শিবচরিতের অট্টহাসই বর্তমানের লাভপুর। ভৈরবের বিশ্বনাথ নাম এখন বিল্লেশ হয়েছে। নলহাটীও একটি উপপীঠ। সতীর শিরানলি এখানে পড়েছিল। দেবী শেফালিকা ও ভৈরব যোগীশ। জনসাধারণের নিকট নলহাটী ললাট পীঠ নামে পরিচিত। দেবী ললাটেশ্বরী ও ভৈরব যোগীশ। নলহাটী রেলওয়ের একটি ষ্টেশন। এই লাইনে সাঁইথিয়া ষ্টেশনের নিকটে নন্দীপুরও একটি পীঠস্থান রূপে পরিচিত। সতীর দেহের হাড় এইখানে পড়েছিল। দেবী নন্দিনী ও ভৈরব নন্দীকেশ্বর। কোপাইকেও একটি পীঠস্থান বলা হয়। সতীর কঙ্কাল পড়েছিল সেখানে। দেবী বেদগর্ভা ও ভৈরব রুরু।

ত্রিস্রোতা নাম মহাপীঠ ও উপপীঠের তালিকায় পাওয়া যায়। সতীর দক্ষিণ জানু পড়েছিল এইখানে। দেবীর নাম চণ্ডিকা ও সদানন্দ তাঁর ভৈরব। আবার উপপীঠের তালিকায় দেখা যায় যে ত্রিস্রোতায় সতীর পাদাংশ পড়েছিল। দেবী সেখানে পার্বতী ও ভৈরবেশ্বর নাম ভৈরবের। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে যাঁর স্রোত, তিনিই ত্রিস্রোতা। ত্রিস্রোতা গঙ্গারই নাম। কিন্তু উত্তরবঙ্গের প্রধান নদীর নামও ত্রিস্রোতা বা তিস্তা। সংস্কৃতে তৃষ্ণাং বলা হয়। এই নদীর উৎপত্তি বিষয়ে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে।—একদা এক শিবভক্ত অসুর ভগবতীকে উপেক্ষা করার জন্য ভগবতীর সঙ্গে

তার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে তৃষ্ণার্ত হয়ে সেই অসুর শিবের নিকট জল চায়। শিব ভগবতীর বুক থেকে দুধের ধারা অসুরকে দেন। সেই ধারা অসুরের তৃষ্ণা নিবারণ করবার পরে পৃথিবীতে ত্রিধারায় ত্রিস্রোতা নামে প্রবাহিত হয়।

পুণ্ড্র একটি উপপীঠ। সতীর লোম পড়েছিল এইখানে। দেবী সর্বাক্ষীণী ও ভৈরব সর্ব। এক সময়ে গঙ্গার পূর্বে সমগ্র বাঙলাকেই বলত পুণ্ড্রবর্ধন, দেশের রাজধানীরও এই নাম ছিল। অনেকে মনে করেন যে বগুড়ার ৭ মাইল দূরে যে মহাস্থান গড়, তারই প্রাচীন নাম পুণ্ড্রবর্ধন।

কুব্জিকা তন্ত্রের মতে জলপাইগুড়ি জেলাব জল্পেশ্বরও একটি পীঠস্থান। দেবীর নাম ত্রিশূলিনী ও শিব ত্রিশূলী। সতীর কোন্ অঙ্গ এখানে পড়েছিল, তার উল্লেখ নেই। তিস্তা নদীর পশ্চিম তীরে জলপাইগুড়ি শহর, পরপারে জল্পেশ্বরে যাবার জন্য বাস পাওয়া যায়। ময়নাগুড়ি স্টেশন থেকেও জল্পেশ্বরের বাস আছে। এখানে প্রবাদ আছে যে প্রায় দু হাজার বছর আগে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের এক রাজা গভীর বনের মধ্যে এই অনাদি শিবলিঙ্গ আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি যে মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন, তা ভেঙ্গে পড়বার পর প্রায় তিনশো বছর আগে কুচবিহারের রাজা প্রাণ নারায়ণ বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মন্দিরের বর্তমান রূপ দিয়েছেন জল্পেশ টেম্পল কমিটি। মন্দির বড়, কিন্তু শিবের দর্শনের জন্য ধাপে ধাপে অনেক নিচে নামতে হয়।

তারাপীঠ

পশ্চিমবঙ্গে তারাপুর আর একটি মহাপীঠ। সতীর নেত্রাংশ তারা পড়েছিল এইখানে। দেবী তারিণী ও ভৈরব উন্মত্ত। এটি শিবচরিতের মত। এই মতেই সতীর ত্রিনেত্র পড়েছিল সর্করু নামে কোন স্থানে। দেবী সেখানে মহিষমর্দিনী ও ভৈরব ক্রোধীশ। কিন্তু সাধারণভাবে তারাপুর চক্ষুপীঠ নামে পরিচিত। দেবীর নাম তারা। বশিষ্ঠ মুনি তপস্যা করেছিলেন এইখানে। বর্তমান কালে বামাক্ষেপার সাধনক্ষেত্র রূপে এই তারাপীঠ বিখ্যাত হয়েছে। বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি কৃপাসিন্ধু বশিষ্ঠদেব

বা তারাপীঠের ভৈরব নামে পরিচিত ছিলেন। রামপুরহাট স্টেশনের নিকটে তারাপীঠ। তারাপীঠ রোড নামে একটি রেলওয়ে স্টেশন আছে।

নবদ্বীপ ধাম

নদীয়া জেলার নবদ্বীপ ধাম একটি বৈষ্ণব তীর্থ। গঙ্গার পশ্চিম তীরে এই শহর। হাওড়া থেকে ৬৩ মাইল উত্তরে একটি রেলওয়ে স্টেশন আছে। আবার গঙ্গার পরপারে কৃষ্ণনগর থেকে ছোট লাইনের ট্রেনে নবদ্বীপ ঘাট স্টেশনে এসে নৌকায় গঙ্গা পার হয়েও এখানে আসা যায়। সেন রাজাদের রাজধানী ও বিদ্যার প্রধান কেন্দ্র রূপে এক সময়ে বিখ্যাত ছিল। ১৪৮৫ সালে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এখানে জন্মেছিলেন। অনেকের মতে গঙ্গার মাঝে মায়াপুর দ্বীপটিই আসল নবদ্বীপ। চৈতন্যদেবের জন্ম হয়েছিল এই নবদ্বীপে। ভক্তি রত্নাকরে নরহরি চক্রবর্তী লিখেছেন,

নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান॥

এই জন্যই মায়াপুরে এখন যোগপীঠ মন্দির, চৈতন্যমঠ ও অদ্বৈত ভবন। চাঁদ কাজীর সমাধিও আছে এই মায়াপুরে। চাঁদ কাজী ছিলেন গৌড়ের রাজা হুসেন শাহের শিক্ষক। চৈতন্যদেবের কীর্তন বন্ধ করবার জন্য তাঁর খোল ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তাঁর কীর্তনে যোগ দিয়েছিলেন বলেই মায়াপুরে তাঁর সমাধি।

চৈতন্যদেবের জন্যই নবদ্বীপ এখন বৃন্দাবনের মতো তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। প্রায় পাঁচশো বছর আগে এক দোল পূর্ণিমায় তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি নবদ্বীপবাসী পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র। চঞ্চল শৈশবের পরে তাঁর জ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যে উদ্ধত যৌবন। পরিবর্তন আসে গয়ায় পিতার পিণ্ডদানের পরে। সেখানে দীক্ষা নিলেন ঈশ্বর পুরীর নিকটে, আর সম্মোহিত হলেন বিষ্ণুপাদপদ্ম দেখে। ভক্তির তরঙ্গ তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল সংসার ও সমাজের সংকীর্ণ গণ্ডির ভিতর থেকে। চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাস নিলেন। নিমাই বা গৌরাঙ্গের নাম হল শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।

বৃন্দাবনে নয়, মায়ের ইচ্ছায় তিনি নীলাচল পুরীতে জীবন কাটিয়েছিলেন। চাল চলনে নাচে ও কীর্তনে প্রথম জীবনে যে মত্ততা ছিল, পরে তা স্থির গম্ভীর হয়ে গেল। ভাবে বিভোর হয়ে যেতেন মাঝে মাঝে। আটচল্লিশ বছর বয়সে তিনি হারিয়ে গেলেন চির দিনের মতো। পিছনে রেখে গেলেন তাঁর জাতিভেদ হীন প্রেমধর্ম। সমকালীন পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ বললেন—

আমার পরশমনির কী দিব তুলনা।
পরশমনির গুণে জগতের জীবগণে
নাচিয়া গাহিয়া হইল সোনা॥

নবদ্বীপের প্রায় প্রতি ঘরেই চৈতন্যদেবের মন্দির বা মূর্তি আছে। তার মধ্যে প্রধান হল তাঁর স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভুর মন্দির ও সোনার গৌরাঙ্গ। অনেক জায়গাতেই দর্শনী দিতে হয়। এ ছাড়া আর দুটি দর্শনীয় স্থান হল পোড়া মা তলা ও বুড়ো শিব তলা। একটি ছায়াশীতল স্থানে সিদ্ধেশ্বরী ভবতারিণীর মন্দির। বৃন্দাবনে যেমন যোগমায়া, তেমনি নবদ্বীপে এই পোড়া মা বিদগ্ধজননী। অনেক মঠ ও আখড়াও আছে। রাত্রিবাসের জন্য স্থানাভাব হয় না।

পশ্চিমবঙ্গে আরও কয়েকটি পবিত্র স্থান আছে। এলাহাবাদের ন্যায় কলকাতার নিকটেও এক ত্রিবেণী আছে। এলাহাবাদের ত্রিবেণী গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর মিলনে যুক্তবেণী নামে পরিচিত। আর পশ্চিমবঙ্গের ত্রিবেণী মুক্তবেণী। এখান থেকে গঙ্গার তিনটি ধারা মুক্ত হয়েছে। দক্ষিণে গঙ্গা, পশ্চিমে সরস্বতী এবং পূর্বে যমুনা। কাঁচরাপাড়া খালকেই যমুনা বলা হয়।

রাধাবল্লভের মন্দির ও রথযাত্রার জন্য শ্রীরামপুরও একটি তীর্থস্থান বলে গণ্য হয়। শ্রীরামপুরের উপকণ্ঠে বল্লভপুরের মন্দির ও মাহেশের রথযাত্রার সম্বন্ধে দুটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এক সময়ে বল্লভপুরে থাকতেন রুদ্র ব্রহ্মচারী। তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে কৃষ্ণ তাঁকে গৌড়ের সুলতানের প্রাসাদ থেকে একখানি পাথর এনে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কথা

বলছেন। রুদ্র গৌড়ে গিয়ে সেই পাথরটি চাইলেন। কিন্তু সুলতান সেই পাথর দেবেন কেন! হঠাৎ তাঁর হিন্দু মন্ত্রী দেখলেন যে পাথর থেকে ঘাম বেরোচ্ছে। তাই দেখে তিনি সুলতানকে বোঝালেন যে এ খুব খারাপ লক্ষণ, পাথরখানা দিয়ে দেওয়াই ভাল। কিন্তু পাথরটি নৌকোয় তোলবার সময় তা জলে পড়ে গেল, আর স্রোতে ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকল বল্লভপুরের ঘাটে। সেই পাথরে রুদ্র তিনটি বিগ্রহ নির্মাণ করলেন—শ্যামসুন্দর, রাধাবল্লভ ও নন্দদুলাল। শ্যামসুন্দরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে খড়দহে আর বল্লভপুরে রাধাবল্লভ।

ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী নামে এক যোগী বাস করতেন মাহেশে। পুরীতে গিয়ে তিনি এক স্বপ্ন দেখে মাহেশে ফিরে এলেন এবং গঙ্গায় একটি জগন্নাথের মূর্তি খুঁজে পেলেন। দিনকয়েক পরে সেইখানেই পেলেন বলদেব ও সুভদ্রার মূর্তি। ব্রহ্মচারী এই মূর্তিগুলি তাঁর এক শিষ্যকে দিলেন। মাহেশের মন্দিরে এখন সেই মূর্তি। মাহেশের রথযাত্রা পশ্চিমবঙ্গে এখন প্রসিদ্ধ।

বংশবাটী বা বাঁশবেড়ে স্টেশনের নিকটে হংসেশ্বরী মন্দির। তেরটি চূড়া বিশিষ্ট এই ছয়তলা মন্দিরটি প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু। গর্ভগৃহে শবরূপী শিবের নাভিমণ্ডল থেকে বেরিয়েছে সহস্রদল পদ্ম, তার উপরে পদ্মাসনে উপবিষ্ট নীলবর্ণ দেবী হংসেশ্বরী।

বরাকরের নিকট কল্যাণেশ্বরীও একটি মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। চার-পাঁচশো বছর আগে রাজা কল্যাণ সিংহ এই মন্দির নির্মাণ করেন। শোনা যায়, এক ব্রাহ্মণ পাশের জলাশয়ে অলঙ্কার পরিহিত দুটি হাত দেখে রাজাকে সংবাদ দিয়েছিলেন। রাজা স্বপ্নাদেশ পেয়ে দেবীকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন।

মহাপুরুষদের জন্ম বা সাধনার স্থানও তীর্থে পরিণত হয়। কবি জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুবিল্বও এখন একটি তীর্থস্থান। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন রাধামাধব। মকর সংক্রান্তিতে কেঁদুলির মেলায় আজও অসংখ্য লোক গীতগোবিন্দের কবি জয়দেবের নামে মহোৎসব পালন করে।

বোলপুর থেকে ৯ মাইল দূরে নান্নুর বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান। প্রথম জীবনে চণ্ডীদাস শাক্ত ছিলেন। কী করে তিনি বৈষ্ণব হলেন, বৈষ্ণবেরা সে সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচার করেছেন। নান্নুরে এখন বাঁসুলি বা বিশালাক্ষীর মন্দির আছে। বোলপুরও একটি প্রাচীন তীর্থস্থান। কথিত আছে যে পৌরাণিক কালে সুরথ রাজা এখানে চণ্ডিকাদেবীর মন্দিরে লক্ষ বলি দিয়েছিলেন বলে এই স্থানের নাম হয়েছিল বলিপুর। এখান থেকে ৪ মাইল দূরে ছিল ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম। সেখানে একটি শীতল জলের কুণ্ডের নাম মুনিকুণ্ড। বোলপুরের নিকটেই শান্তিনিকেতন। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এখানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর বিশ্বকবির স্মরণে এই শান্তিনিকেতনও একটি তীর্থস্থানে পরিণত হচ্ছে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলাতেই পীঠস্থানের সংখ্যা সর্বাধিক। এইসব পীঠস্থান ও তীর্থস্থানগুলি বোলপুর থেকে দেখাই সুবিধাজনক। বোলপুর হাওড়া থেকে ৯৯ মাইল দূরে একটি রেলওয়ে স্টেশন। বোলপুর থেকে কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলি ১৮ মাইল দূরে, ৯ মাইল দূরে নান্নুর। এখান থেকে বক্রেশ্বর, তারাপীঠ, নলহাটী, লাভপুর, ক্ষীরগ্রাম, উজানী, কেতুগ্রাম, কোপাই, নন্দীপুর—সবই কাছাকাছি। নলহাটী থেকে রানীভবানীর মন্দিরের শহর বড়নগর দূরে নয়। গঙ্গার এপারে রেল স্টেশন আজিমগঞ্জ, ওপারে জিয়াগঞ্জ। আজিমগঞ্জ থেকেই বড়নগর যেতে হয় হেঁটে বা সাইকেল রিক্সায়। নাটোরের রানী ভবানী তাঁর জীবনের শেষ তিরিশ বছর নিজের বিধবা কন্যা তারাসুন্দরীকে নিয়ে এইখানে বাস করেছিলেন। তাঁর সংকল্প ছিল বাঙলায় বারাণসী নির্মাণের। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভবানীশ্বর শিব, রাজরাজেশ্বরী, মদনগোপাল ও কালিকা। এই মন্দিরগুলির ও চার বাঙলার মন্দিরের পোড়ামাটির কাজ বিষ্ণুপুরের মতোই অপরূপ।

আসাম

কামাখ্যা

শুধু আসাম রাজ্যের নয়, পূর্বাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ তীর্থের অন্যতম হল কামাখ্যা। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে পাণ্ডু ও গৌহাটি শহরের মধ্যে নীল পর্বতের উপরে এই তীর্থ। আগে আমিনগাঁও পর্যন্ত মিটার গেজ ট্রেনে এসে স্টীমারে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে পাণ্ডু আসতে হত। এখন ট্রেন সরাসরি পুলের উপর দিয়ে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে গৌহাটি আসে। গৌহাটির আগের স্টেশনের নামই কামাখ্যা। পাহাড়ের উপরে উঠতেও এখন আর কষ্ট করতে হয় না। মোটরের পথ হয়েছে। মন্দিরের নিকটে এসে গাড়ি থেকে নামতে হয়।

কামরূপ মহাপীঠের অন্তর্গত। যে জেলায় কামাখ্যা অবস্থিত তার নাম কামরূপ। এটি যোনি বা মহামুদ্রা পীঠ। দেবীর নাম কামাখ্যা, উমানন্দ তাঁর ভৈরব। কালের নিয়মে এই পীঠস্থানটি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এটি আবিষ্কার করেছিলেন কামদেব। এই সম্বন্ধে একটি পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে।

সতীর দেহত্যাগের শোক প্রশমিত হবার পরে শিব হিমালয়ে ফিরে গিয়ে কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলেন। জীবনের একটি দুর্বল অধ্যায় তিনি তপস্যায় বিস্মৃত হয়ে গেলেন। সতী জন্ম নিলেন হিমালয় পত্নী মেনকার গর্ভে, তাঁর নাম হল পার্বতী। বড় হয়ে পার্বতী শিবের জন্য তপস্যা শুরু করলেন। শিবের ধ্যান ভঙ্গ হয় না দেখে বৃহস্পতির পরামর্শে দেবরাজ ইন্দ্র কামদেবকে পাঠালেন। না পাঠিয়ে উপায় ছিল না। তারকাসুরের অত্যাচারে দেবতারা তখন জর্জরিত এবং ব্রহ্মা বলেছিলেন যে শিবের পুত্রই তারকাসুর বধে সমর্থ হবেন। কাজেই শিবের তপস্যা ভঙ্গ করে তাঁর বিবাহ দেওয়ার প্রয়োজন দেবতাদেরই। কামদেব বা মদন ভয়ে ভয়ে এসে তাঁর পুষ্পময় পঞ্চশর নিক্ষেপ করলেন। শিব চোখ মেলে দেখলেন মদনকে, আর মদন তাঁর রোষানলে ভস্ম হয়ে গেলেন। তারপর শিবের বিবাহে মদনের পত্নী রতি এসে স্বামীর পুনর্জীবন ভিক্ষা করলেন শিবের কাছে। শিবের বরে মদন জীবন লাভ করলেন।

কামরূপের কিংবদন্তীর আরম্ভ এইখানে। কামদেব জীবনলাভ করলেন, কিন্তু তাঁর স্বরূপ ফিরে ফেলেন না। স্বামী স্ত্রীর স্তব-স্তুতিতে তুষ্ট হয়ে শিব বললেন, ভারতের ঈশান কোণে সতীর দেহের এক অংশ এখনও গোপন আছে, তা আবিষ্কার করে দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার কর। তবেই তোমার পূর্ব রূপ ফিরে পাবে। এই আদেশ পেয়ে কামদেব রতিকে নিয়ে এলেন নীলপর্বতে। তারপরে দেবীর এই মহামুদ্রা পীঠ আবিষ্কার করে নিজের পূর্ব রূপ ফিরে পেলেন। এই ঘটনার জন্যই তীর্থের নাম হল কামরূপ, আর দেবী কামাখ্যা নামে পরিচিত হলেন। কামদেবই কামাখ্যার প্রথম মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তার নাম দিয়েছিলেন আনন্দাখ্য মন্দির। বিশ্বকর্মা এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। যে অন্ধকার গুহায় দেবীর পীঠস্থান, কামদেবের নামে তার নাম হয়েছে মনোভব গুহা।

তখন এই নীলাচল পর্বতে ওঠার কোন পথ ছিল না। প্রথম পথ নির্মাণ করেছিলেন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা নরক। তিনি ছিলেন পৃথিবীর পুত্র, বরাহরূপী বিষ্ণু তাঁর পিতা। দেবী ভগবতী একদিন নরককে দেখা দিয়েছিলেন। আর নরক তাঁব অলৌকিক রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পত্নী রূপে পাবার বাসনা প্রকাশ করেন। দেবী বললেন, একটা শর্ত আছে। এক রাত্রির মধ্যে এই পাহাড়ের চারিদিকে চারটি গোপন পথ আর একটি বিশ্রাম গৃহ নির্মাণ করে দিলে তিনি ধরা দেবেন। মতান্তরে শর্তটি একটু ভিন্ন রকমের—রাত্রি প্রভাত হবার পূর্বেই পাহাড়ের উপরে একটি মন্দির ও জলাশয় এবং নিচে থেকে পাহাড়ে উঠবার জন্য একটি পথ নির্মাণ করে দিতে হবে। গর্বোদ্ধত নরক তথাস্তু বলে নির্মাণের কাজ শুরু করে দিলেন এবং রাত্রি প্রভাত হবার পুর্বে হয় তো শেষ করেও ফেলতেন। দেবীকে তাই ছলনার আশ্রয় নিতে হল। একটি মায়া মোরগ সৃষ্টি করে রাত্রি শেষের সঙ্কেত ধ্বনি জানিয়ে দিলেন। অসময়ে এই মোরগের ডাক শুনে নরক আশ্চর্য হয়েছিলেন। কিন্তু দেবী বললেন, তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়েছে। ক্রুদ্ধ নরক সেই মোরগের পিছনে ধাওয়া করে ব্রহ্মপুত্রের পরপারে তাকে বধ করলেন। সেই স্থানের নাম হল কুকুরাকাটাচকী, কুক্কুট মানে মোরগ।

গৌহাটি শহর থেকে ৩ মাইল দূরে এই নীলপর্বত। সমুদ্রতল থেকে পাহাড়ের উচ্চতা ৮০০ ফুট। উপরে প্রায় শ তুই পরিবারের বাস। গৌহাটি শহর থেকে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত নিয়মিত বাস যাতায়াত করে, তারপরে পায়ে হেঁটে কিংবা ট্যাক্সিতে চড়ে উপরে উঠতে হয়। পুরাকালের চারটি পথও আছে। পাণ্ডুঘাট থেকে যে পথ এই পাহাড়ে উঠেছে, সেই পথের উপরে আছে সিংহদ্বার। সেখানে গণেশের মূর্তির নিকটে একটি শিলা নরকের স্মৃতি বহন করছে। আর তিনটি পথের উপরে আছে স্বর্গদ্বার, ব্যাঘ্রদ্বার ও হনুমন্ত দ্বার। পাণ্ডু গৌহাটি পথের পাশে নীলাচল পর্বতের দক্ষিণে যে পাহাড়, তার নাম নরকাসুরের পর্বত। লোকে বলে যে এই পাহাড়ে ছিল নরকাসুরের রাজধানী।

এক কালে এই পর্বতারোহণের একটা বিধি ছিল। লোকের বিশ্বাস ছিল যে পূর্ব দিকের পথ ধরে আরোহণ করলে ধনলাভ হয়, রাজ্যলাভ হয় পশ্চিমের পথ ধরে আরোহণে; মুক্তিলাভের আশা থাকলে উত্তরের পথ ধরতে হবে, আর দক্ষিণের পথ ধরলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। উত্তর ও পশ্চিম দিকের পথের চিহ্ন এখন আর নেই, এখন শুধু দক্ষিণ ও পূর্বের পথই সুগম আছে। পূর্বের পথটিই যাত্রীদের প্রিয়। পথের তুধারে গুলঞ্চ ফুলের গাছ, তারই ছায়ায় ছায়ায় পথের শোভা দেখতে দেখতে অনেক যাত্রী এখনও পায়ে হেঁটে ওঠেন। এই পাহাড়ের যেখানে কামাখ্যার মন্দির, তার উচ্চতা মাত্র ৫২৫ ফুট। এই পাহাড়েরই শৃঙ্গে ভুবনেশ্বরীর মন্দির, তার উচ্চতা ৬৯০ ফুট।

পাহাড়ের উপরে মোটর এসে যেখানে দাঁড়ায়, সেখানেই ছোট ছোট দোকানে নানারকমের জিনিষপত্র সাজানো আছে। পূজার সমস্ত উপকরণ পাওয়া যায়। নিকটে ব্রাহ্মণ পল্লী আছে, পাণ্ডারা সেখানে থাকেন। পাণ্ডাদের গৃহে যাত্রীদের বাসের ব্যবস্থাও আছে।

মন্দিরের উত্তর দিকে এক পুষ্করিণীর নাম সৌভাগ্য কুণ্ড। ইন্দ্রাদি দেবতারা এই কুণ্ড নির্মাণ করেছেন বলে জনশ্রুতি। এখানে স্নান তর্পণের বিধি আছে। সিদ্ধিদাতা গণেশ আছেন কুণ্ডের ধারে। এই কুণ্ড প্রদক্ষিণ করলে পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফল লাভ হয়।

দেবীর মন্দিরের ভিতরে প্রথমেই দ্বাদশ স্তম্ভের মাঝখানে হরগৌরীর ভোগমূর্তি। তার নাম চলন্তা মূর্তি, উৎসবের জন্য নির্মিত দেবতার সচল মূর্তি। পাথরের এক সিংহাসনে অষ্ট ধাতুর হরগৌরী আছেন অধিষ্ঠিত। বৃষবাহন কামেশ্বর শিবের পঞ্চ বক্ত্র ও দশ-ভুজ, সিংহ-শব পদ্মাসনা দেবী মহামায়ার ষড়ানন ও দ্বাদশ বাহু। পদ্ম সিংহ ও শব ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের প্রতীক। শক্তিশালিনী মহামায়াকে তাঁরাই ধারণ করে আছেন। দেবীকে এই মূর্তিতে পূজা করলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও পূজা করা হয়। উৎসবের দিনে এই মূর্তি নিয়ে মন্দিরের বাহিরে শোভাযাত্রা হয়।

তারপর একটি স্বল্পালোকিত গর্ভগৃহ। অন্ধকারে চার দিক ভাল করে দেখা যায় না। খুব সন্তর্পণে একটি একটি করে দশটি ধাপ নিচে নামতে হয়। ঘন অন্ধকারে আবৃত একটি গুহা, এরই নাম মনোভব গুহা। একটি প্রদীপ জ্বলে, আর পূজারী ব্রাহ্মণেরা সেখানে অপেক্ষা করেন ভক্ত যাত্রীর। কোন দেবতা নেই, কোন বিগ্রহ নেই, প্রদীপের আলোয় শুধু একটি শিলাপীঠ দেখতে পাওয়া যায়। তার আধখানা কাপড় ও সোনার টোপরে আবৃত। তার উপরে ফুলের মালা। সামনের একটি ধার উন্মুক্ত, তার ভিতরে জলের ধারা, যাত্রীরা হাত বাড়িয়ে জলস্পর্শ করেন।

দেবীকে প্রণামের মন্ত্র :

কামাখ্যে বরদে দেবী নীলপর্বত বাসিনী।
ত্বং দেবী জগতাং মাতর্যোনিমুদ্রে নমোঽস্তুতে ॥

এই দেবীর স্পর্শে যাত্রীদের পুনর্জন্ম আর হয় না।—

মনোভব গুহামধ্যে রক্ত পাষাণরূপিণী।
তস্যাঃ স্পর্শনমাত্রেণ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

দেবীর পীঠে যে জল তা নাকি পাতাল থেকে উঠছে। যোগিনী তন্ত্রে আছে যে দেবীকে স্পর্শ করে মুদ্রার জল পান করলে দেব ঋণ ঋষি ঋণ ও পিতৃ ঋণ পরিশোধ হয়। কালিকা পুরাণের মতে দেবীর পূজায় এক কোটি গোদানের পুণ্য ফল লাভ হয়।

কামাখ্যায় দশমহাবিদ্যারও পীঠ আছে। কামাখ্যা নিজে এখানে ষোড়শী, লক্ষ্মী সরস্বতী হলেন কমলা ও মাতঙ্গী, পাহাড়ের চূড়ায় ভুবনেশ্বরী, আর অন্যান্য বিদ্যার মন্দিরগুলি কিছু দূরে দূরে। এ ছাড়াও এখানে আরও অনেক মন্দির আছে। পঞ্চাননের পঞ্চমুখের পাঁচটি শিবমন্দির ও কম্বলাখ্য নামে বিষ্ণুর মন্দির। বনের ভিতর বনবাসিনী জয়দুর্গা ও ললিতকান্তার লীলাপীঠ, আর কামেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের মাঝখানে কেদার ক্ষেত্র। দেবী এখানে কুমারী রূপে বিরাজিতা বলে যাত্রীরা কুমারী পূজা করেন। একটি কুমারীর পূজাতেই এখানে সকল দেবতার পূজা হয়।

কামাখ্যার ভৈরব উমানন্দ আছেন ভারতের বিপুলতম নদী ব্রহ্মপুত্রের বুকে একটি অরণ্যবেষ্টিত শৈলে। এই শৈলটি ভুবনেশ্বরীর মন্দির থেকে দেখা যায়। কিন্তু এই শৈলে যেতে হলে ব্রহ্মপুত্রের তীরে ডেপুটি কমিশনারের অফিস সংলগ্ন খেয়া ঘাটে যেতে হয়। নৌকা ও মোটর লঞ্চ দুইই আছে। ব্রহ্মপুত্রের মাঝখানে এই দ্বীপের ইংরেজী নাম পিকক্ আইল্যাণ্ড। অনেকে বলেন, এই শৈলের নাম ভস্মাচল, শিবের রোষে কামদেব এইখানেই ভস্ম হয়েছিলেন। এটি ঠিক দ্বীপ নয়, একটি অনুচ্চ পাহাড় জলের উপর জেগে আছে। শোনা যায় যে কামাখ্যা পাহাড়ের সঙ্গে এই উমানন্দ পাহাড় এক সময়ে যুক্ত ছিল এবং এটি নীল পর্বতেরই অংশ। এখন এর দূরত্ব প্রায় মাইল দুয়েক। বর্ষার সময়ে খেয়া পারাপার খুবই বিপজ্জনক, অন্য সময়ে নয়।

খাড়া সিঁড়ি ভেঙ্গে মন্দিরে উঠতে হয়। কামাখ্যার মতো একই ধরনের মন্দির। আর দেবতাও আছেন নিচে একটি গুহার ভিতরে, শিবলিঙ্গ একটি ধাতুর পাত্র দিয়ে ঢাকা থাকে।

কামাখ্যা দর্শনে এসে কামাখ্যা ও উমানন্দ দর্শন করেই কেউ ফিরে যান না। ৭ মাইল দূরে বশিষ্ঠাশ্রমও দেখতে যান। শিলঙের পথে কিছু দূর গিয়ে অন্য পথে দক্ষিণে পাহাড়ের দিকে যেতে হয়। পুরাকালে রাজর্ষি নিমির শাপে দেহহীন হবার পরে ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ এইখানে তপস্যা করেছিলেন। এই সম্বন্ধে এখানে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে।

সূর্যবংশের রাজা ইক্ষ্বাকুর এক পুত্র নিমি হিমালয়ের নিকট বৈজয়ন্ত নগরে রাজত্ব করতেন। একবার তিনি এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই যজ্ঞে প্রথমে বশিষ্ঠকে ও পরে গৌতমকে যাজকত্বে বরণ করেন। বশিষ্ঠ তখন ইন্দ্রের যজ্ঞ করছিলেন। সেখানে কাজ শেষ করে নিমির কাছে এসে দেখলেন যে তাঁর বিলম্ব দেখে গৌতম যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন। বশিষ্ঠ নিমিকে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন, কিন্তু নিমি সেই কথা না শুনে গৌতমকে যজ্ঞের ভার দিয়েছিলেন বলে বশিষ্ঠ মনে করলেন যে তাঁকে অপমান করা হয়েছে এবং ক্রুদ্ধ হয়ে নিমিকে শাপ দিলেন যে তাঁর মৃত্যু হবে। নিমি তখন নিদ্রামগ্ন ছিলেন। জেগে উঠে এই শাপের কথা শুনে তিনিও প্রতিশাপ দিলেন, নিদ্রিত মানুষকে শাপ দেবার জন্য বশিষ্ঠেরও মৃত্যু হবে। দুজনের শাপের ফলে দুজনেই দেহহীন হয়ে বাস করতে লাগলেন। দেবতাদের দয়ায় নিমি সকল প্রাণীর নেত্রে স্থান পেলেন এবং এই জন্যেই সকলের নেত্র বিশ্রামকালে নিমেষপ্রাপ্ত হয়। আর বিদেহী বশিষ্ঠ যজ্ঞ করতে এলেন এই আশ্রমে। পুরাণের গল্প অন্য রূপ। নিমির শাপে বশিষ্ঠের তেজ মিত্রাবরুণের তেজে প্রবেশ করল। তারপর সেই তেজ থেকেই বশিষ্ঠের পুনর্জন্ম হল উর্বশীর সান্নিধ্যে। কিন্তু স্থানীয় কাহিনী অনুসারে বশিষ্ঠ পিতামহ ব্রহ্মার পরামর্শে এই নির্জন সন্ধ্যাচলে বিষ্ণুর তপস্যা করতে এসেছিলেন। বশিষ্ঠ তাঁর তপস্যার প্রভাবে এখানে সন্ধ্যা ললিতা ও কান্তা নামে ত্রিধারায় প্রবাহিতা গঙ্গাকে আনলেন। তারপর সেই গঙ্গায় স্নান করে বিষ্ণুর বরে নিজের দেহ ফিরে পেলেন।

চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা একটি নির্জন অরণ্যময় স্থানে এই বশিষ্ঠাশ্রম। উঁচু পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যে জলপ্রপাতটি বেগে নেমে আসছে তারই নাম বশিষ্ঠ গঙ্গা। এরই তিনটি ধারা সন্ধ্যা ললিতা ও কান্তা নামে মিলিত হয়েছে মন্দিরের পিছনে। বর্তমানে এটি পিকনিকের জন্য জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বশিষ্ঠ এখানে স্নান ও সন্ধ্যা করতেন বলে পাণ্ডারা বলেন যে এখানে এক দিনে ত্রিসন্ধ্যা করলে পতিত সন্ধ্যার পাপ স্খালন হয়।

বশিষ্ঠাশ্রমের মন্দিরে তাঁর পদচিহ্ন বর্তমান। মন্দিরের গম্বুজটি কামাখ্যার মন্দিরেরই অনুরূপ। এখান থেকে কিছু পশ্চিমে একটি শিলাচিহ্ন আছে, তা বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতীর। ঘন বনের ভিতরে সে জায়গাটি বিপদসঙ্কুল বলে যাত্রীরা সেদিকে যান না।

গৌহাটি শহরের মধ্যেও কয়েকটি মন্দির আছে। ব্রহ্মপুত্রের ধারে পান বাজার অঞ্চলে শুক্লেশ্বর বা শুক্রেশ্বর শিবের মন্দির। ছোট একটি পাহাড়ের নাম শুক্রেশ্বর পাহাড়, তারই উপরে এই মন্দির। কালিকাপুরাণে এই পাহাড়ের নাম হস্তীপর্বত। এই পাহাড়েই ছিল দৈত্যগুরু শুক্রের আশ্রম। তিনিই এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জনশ্রুতি। শুক্রেশ্বর শিবের দর্শনে মায়া বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ হয়। এই মন্দিরের শিখরও কামাখ্যার মন্দিরের মতো। নিচের দিকে আর একটি মন্দির আছে। তার নাম জনার্দন মন্দির। ভিতরে বিষ্ণুর মূর্তি।

ব্রহ্মপুত্রের পরপারে অশ্বক্রান্ত মন্দির। মন্দিরে বিষ্ণুর অনন্তশয়ন মূর্তি। কিংবদন্তী আছে যে নরক অত্যাচারী হয়ে উঠলে কৃষ্ণ তাঁকে বধ করতে আসেন। তাঁর ঘোড়াগুলি এইখানে বেঁধেছিলেন বলে এই স্থানের নাম হয়েছিল অশ্বক্রান্ত।

শহরের পূর্বদিকে উজান বাজারের জোড়া পুকুরের ধারে উগ্রতারার মন্দির। পাণ্ডারা এই স্থানকে কামাখ্যা দেবীর নাভিমণ্ডল বলে। দেবী পরমেশ্বরীর নাম এখানে উগ্রতারা। যোগিনীতন্ত্রের মতে যিনি কালী, তিনিই তারা, আর কামাখ্যাও তিনি। উগ্রতারার পূজা হয় বামাচার মতে। এই নিয়ে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। একদা যমরাজ ব্রহ্মার নিকটে গিয়ে নালিশ করেছিলেন যে কামরূপের মাহাত্ম্যের জন্য সেখানকার সব মানুষ মৃত্যুর পরে স্বর্গে চলে যাচ্ছে, নরকে কেউ আসছে না। ব্রহ্মা বিষ্ণুকে এই সংবাদ দিলে দুজনে মিলে শিবের নিকটে এসে সব বললেন। শিব উগ্রতারাকে আদেশ দিলেন যে কামরূপ থেকে সবাইকে তাড়াও। এই কাজ করতে গিয়ে উগ্রতারা বশিষ্ঠের কোপে পড়লেন। সন্ধ্যাচলে তপস্যারত এই ঋষির গায়ে হাত দিতেই তিনি শাপ দিলেন যে এখন থেকে

তাঁর পূজা হবে বামাচারে, তাঁর সঙ্গিনীরা হবেন ম্লেচ্ছ এবং শিব এই আদেশ দেবার জন্য ম্লেচ্ছদের দেবতা হবেন। এই কাহিনীর মধ্যে খানিকটা সত্য আছে। কামরূপ থেকে বৈদিক আচার উঠে গিয়েছিল। শিব ও অন্যান্য দেবতাদের পূজা হত বামাচারে। শিবের মন্দিরেও বলি হত কালিকাপুরাণে এই বিবরণ পাওয়া যায়।

নবগ্রহের মন্দির শহরের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে চিত্রাচল নামে একটি ছোট পাহাড়ের উপরে। এই মন্দিরে নবগ্রহের মূর্তি আছে। নবগ্রহ হলেন সূর্য চন্দ্র মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি রাহু ও কেতু। শোনা যায় যে পুরাকালে এই পাহাড়ের উপরে জ্যোতিষ চর্চার একটি কেন্দ্র ছিল। জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষী বিদ্যা—দুইই এখানে শেখানো হত। এই জন্যেই এই শহরের প্রাচীন নাম ছিল পাগ্‌জ্যোতিষপুর।

গৌহাটি শহর থেকে ১৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে হাজো নামে একটি গ্রামে দুটি মন্দির আছে। হয়গ্রীব মাধবের এবং অপরটি কেদারেশ্বরের। এখানে যাতাযাতের জন্য ভাল বাস আছে। কিন্তু হাজোয় রাত্রিবাসের ভাল ব্যবস্থা নেই। হয়গ্রীবের সম্বন্ধেও পরস্পর বিরোধী দুটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তার একটি অনুসারে হয়গ্রীব মাধব বিষ্ণুর অবতার। এই অবতারে তিনি মধুকৈটভের নিকট থেকে বেদ উদ্ধার করেছিলেন।

আসামের শিবসাগর জেলায় কয়েকটি মন্দির আছে। জোড়হাট শহর থেকে ১৭ মাইল দূরে আসাম ট্রাঙ্ক রোডের নিকটে নেগ্রিটির মন্দির। চা বাগানে ঘেরা একটি ছোট পাহাড়ের উপর এই মন্দির। অদূরে ব্রহ্মপুত্র নদী। কিংবদন্তী আছে যে ঔর্ব মুনি এখানে বাস করতেন এবং এই স্থানটিকে বারানসীর মতো পবিত্র করার জন্য অনেকগুলি শিবলিঙ্গ সংগ্রহ করেন। প্রাচীন মন্দিরটি তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। বর্তমান মন্দির নির্মাণ করেন অহোম রাজারা। মূল মন্দিরের চারি দিক ঘিরে আছে গণেশ সূর্য দুর্গা ও বিষ্ণুর মন্দির।

শিবসাগর শহরে শিবসাগর সরোবরের তীরে শিবডোল একটি দর্শনীয়

মন্দির। এখানে আরও দুটি মন্দির আছে বিষ্ণু ও দেবীর। শহর থেকে আড়াই মাইল দূরে গৌরী সাগরের তীরে দেবীডোল আকৃতিতে শিবডোলের অনুরূপ। শিবসাগর থেকে বাসে যাতায়াত করা যায়।

সদিয়ার নিকটে তাম্রেশ্বরীর মন্দিরটি এখন পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে।

আসামের সত্রগুলির সম্বন্ধে কিছু না বললে এই রাজ্যের তীর্থস্থানের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আসামের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক শঙ্কর দেবের সত্র নওগাঁর নিকট বর্দোয়ায়। ১৪৮৪ সালে শঙ্করদেব এই সত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উত্তর সাধক মাধবদেবের সত্র কামরূপ জেলার বরপেটায়। ব্রহ্মপুত্র নদীর মাঝে মাজুলি নামেব একটি দ্বীপ বৈষ্ণবদের আর একটি বিখ্যাত সত্র। এই সত্রটি শিবসাগর জেলায় জোড়হাটের নিকটে অবস্থিত। এই সব সত্রে ধর্মালোচনা ও নামকীর্তন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মিজোরাম

শিলচর থেকে মিজোরামের প্রধান শহর আইজলের দিকে ৩১ মাইল দূরে ভুবন নগর। এই পর্যন্ত বাসে এসে ৮ মাইল পায়ে হেঁটে ভুবন পাহাড়ে উঠে ভুবনেশ্বরের মন্দির দর্শন করতে হয়।

ত্রিপুরা

উদয়পুর

ত্রিপুরা রাজ্যেও একটি তীর্থস্থান আছে। তার নাম উদয়পুর। ত্রিপুরার প্রধান শহর আগরতলা থেকে ৩০ মাইল পথ বাসে যেতে হয়। শিবচরিতের মতে সতীর দক্ষিণ পদ এখানে পড়েছিল বলে এটি একটি মহাপীঠ। দেবী ত্রিপুরা ও ভৈরব নল। কিন্তু পীঠমালার মতে ভৈরবের নাম ত্রিপুরেশ। শ্লোকটি এই রকম—

ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবতা ত্রিপুরা মাতা।
ভৈরবঃ ত্রিপুরেশশ্চ সর্বাভীষ্ট ফলপ্রদঃ॥

এখানে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে ত্রিপুরা রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ শিবকে নিজের রাজ্যে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শিবকে তুলতে পারেন নি। তারপর স্বপ্ন দেখেছিলেন যে শিব স্থানচ্যুত হবেন না, তাঁর বদলে যাবেন ত্রিপুরা সুন্দরী। কিন্তু এক রাত্রে যতটা নিয়ে যেতে পারবেন ততটাই যাবেন, রাত্রি প্রভাত হলেই তিনি অচলা হবেন। রাজা ধন্যমাণিক্য অনেক লোক নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু উদয়পুর পর্যন্ত এসেই রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল। তাই উদয়পুরেই প্রতিষ্ঠা হল ত্রিপুরা সুন্দরীর।

এক সময়ে এইখানেই ছিল ত্রিপুরার রাজধানী। এখন এই শহরে আর রাজধানী নেই। ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দিরটিই এখন এই স্থানের একমাত্র আকর্ষণ। একটি উঁচু টিলার উপরে মন্দিরটি নিতান্তই সাদাসিধে। মন্দির গাত্রে কোন কারুকার্য নেই, নেই কোন শিল্প নৈপুণ্য। পীঠস্থান বলেই যাত্রীরা আগরতলা থেকে যাতায়াত করে। এই মন্দিরে নরবলির কথা আছে ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালায়।—

> পূর্বেতে ত্রিপুরা রাজ্যে নরবলি দিত।
> সহস্র সহস্র বন্ধ বর্ষে কাটা যাইত॥
> শ্রীধন্যমাণিক্য মানা তাহাকে করিল।
> তদবধি নরবলি নিষেধ হইল॥

মেঘালয়

জয়ন্তী

শিবচরিতের মতে জয়ন্তী একটি মহাপীঠ। সতীর বাম জঙ্ঘা পড়েছিল এইখানে। দেবী জয়ন্তী ও ভৈরব ক্রমদীশ্বর। এই পীঠস্থান আবিষ্কারের সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ফালজোর গ্রামের কয়েকজন রাখাল বালক পাহাড়ের নিচে পূজা পূজা খেলছিল। একজন বালককে তৃণের খাঁড়া দিয়ে বলি করতেই দেখা গেল যে তার মুণ্ডচ্ছেদ হয়েছে। তিনশো বছর আগের এই অলৌকিক ঘটনার পরেই পীঠস্থান প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

এই ফালজোর গ্রাম প্রাচীন জয়ন্তিয়া রাজ্যে বাঙলা দেশের সিলেট শহর থেকে ৩৮ মাইল উত্তর-পুর্বে অবস্থিত।

অরুণাচল প্রদেশ

পরশুরাম কুণ্ড

আসামের তিনসুকিয়া রেল জংসন থেকে একটি শাখা লাইনে ২১ মাইল দূরে তালাপ স্টেশন। সেখান থেকে মাইল তিনেক দূরে ব্রহ্মপুত্র নদী পেরিয়ে নিউ সদিয়া পৌঁছতে হয়। নিউ সদিয়া থেকে অরুণাচল প্রদেশের বাসে লোহিত জেলার প্রধান শহর তেজু হয়ে লোহিত নদীর পরপারে পরশুরাম কুণ্ড এই অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট তীর্থস্থান। পিতা জমদগ্নির আদেশে পরশুরাম তাঁর মাকে হত্যা করেছিলেন এবং তাঁর হাতের কুঠার খসে পড়েছিল এখানকার কুণ্ডের জলে স্নান করে। তার পর থেকেই এই কুণ্ড একটি পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়েছে। যাত্রীদের রাত্রিবাসের জন্য এখানে একটি ধর্মশালা আছে।

বাঙলা দেশ

বাঙলা দেশেও অনেকগুলি পীঠস্থান আছে।

যশোহর একটি উপপীঠ বলে পরিচিত ছিল। সতীর পাণিপদ্ম পড়েছিল এইখানে। দেবীর নাম যশোরেশ্বরী ও প্রচণ্ড তাঁর ভৈরব। বাঙলার রাজা প্রতাপাদিত্য যশোরেশ্বরী কালীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে সকলের বিশ্বাস। এই কালীমূর্তি এখন জয়পুরের অম্বর প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

মহাস্থানগড় যদি প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন হয় তো সেখানে আর একটি উপপীঠ। সতীর লোম পড়েছিল পুণ্ডে। দেবী সর্বাক্ষীণী ও ভৈরব সর্ব।

শ্রীহট্ট বা সিলেট শহর থেকে দেড় মাইল দক্ষিণে গ্রীবা পীঠ। দেবীর নাম মহালক্ষ্মী ও ভৈরব সর্বানন্দ। শিলং শহর থেকে মোটর পথে ৮৬ মাইল দূরে এই তীর্থস্থান।

চন্দ্রনাথ

শিবচরিতে এই পীঠস্থানের নাম চট্টগ্রাম। সতীর দক্ষিণ হস্তার্ধ এইখানে পড়েছিল। দেবী ভবানী ও ভৈরব চন্দ্রশেখর। পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রে যে চট্টল নাম পাওয়া যায়, তাই কালক্রমে চট্টগ্রামে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তীর্থস্থানটি চট্টগ্রাম শহর থেকে ২৪ মাইল দূরে। সীতাকুণ্ড স্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটে পাহাড়ে উঠতে হয়। ১১০০ ফুট উঁচু পাহাড়, সিঁড়ির সংখ্যা ৭০০।

এই পাহাড়ের পথে ব্যাস কুণ্ড। ব্যাসদেবের জন্য শিব তাঁর ত্রিশূল দিয়ে এই কুণ্ডটি খনন করে দেন। প্রবাদ আছে যে তপস্যার জন্য ব্যাসদেব যখন বারাণসীতে গিয়েছিলেন, তখন ভৃগু মুনি তাঁকে নীচ জাতি বলে অপমান করেন। দুঃখে ব্যাসদেব কঠোর তপস্যা করে শিবকে সন্তুষ্ট করেন। আর তাঁরই আদেশে দ্বিতীয় কাশী প্রতিষ্ঠা করেন চট্টলে

চন্দ্রশেখরে। তিনি বলেছিলেন, কলৌ বসামি চন্দ্রশেখরে—কলিযুগে আমি চন্দ্রশেখরে বাস করব। তন্ত্রচূড়ামণির মতে—

চট্টলে দক্ষবাহুর্মে ভৈরবশ্চন্দ্রশেখরঃ।
ব্যক্তরূপা ভগবতী ভবানী তত্র দেবতা ॥

ব্যাসকুণ্ডের তীরে এখন ব্যাসেশ্বর শিব। ব্যাসদেব, ভৈরব ও চণ্ডিকার মন্দির আছে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠবার পথে আরও অনেক পবিত্র স্থান আছে—হনুমানের মন্দির, সীতাকুণ্ড, রাম ও লক্ষ্মণ কুণ্ড এবং মন্মথ নদ। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে বনবাস কালে রাম সীতা এখানে এসেছিলেন। সীতাদেবীর মন্দিরের পিছনে যে আগুনের শিখা মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়, লোকে তাকে জ্যোতির্ময় বলে।

চন্দ্রশেখরের পথে ভবানীর মন্দির। মন্দিরে কালী ও দশভুজার মূর্তি। ইনিই পীঠস্থানের দেবী, পর্বতচূড়ায় অবস্থিত চন্দ্রশেখর তাঁর ভৈরব। কিন্তু সেখানে পৌঁছবার আগে স্বয়ম্ভুনাথ মহাদেবের মন্দির। উত্তরে নব ভৈরব ও দ্বারে দ্বারপাল ভৈরব। রাম সীতা ও অন্নপূর্ণার মূর্তি মন্দিরের ভিতরে, বাহিরে লক্ষ্মী ও শিব। স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিরে যে জলের ধারা সারাক্ষণ বইছে, যাত্রীদের তা বিস্ময় উদ্রেক করে। এই স্বয়ম্ভুনাথের সম্বন্ধে একটি অলৌকিক ঘটনা প্রচলিত আছে। শম্ভু নামে এক ধোপা এই পাহাড়ের নিকটে বাস করত। তার কপিলা নামের একটি গরু রোজ পালিয়ে যেত পাহাড়ে, আর সারাদিন পরে রাতে ফিরে আসত। একদিন সেই গরুকে অনুসরণ করে শম্ভু দেখল যে গরু দুধ দিচ্ছে একটি পাথরের উপরে। রাতে শম্ভু স্বপ্ন দেখল, আর তার পরের দিন থেকেই শম্ভুনাথের পূজার ব্যবস্থা করল। এর পরে লোকমুখে খবর পেয়ে ত্রিপুরার রাজা ধন্যমাণিক্য এসেছিলেন স্বয়ম্ভুনাথকে নিজের রাজ্যে নিয়ে যেতে। কিন্তু তাঁকে তুলতে পারেন নি, হাতী লাগিয়েও বিফল হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত স্বপ্ন দেখে ত্রিপুরা সুন্দরীকে নিয়ে গিয়ে তাঁর রাজ্যে উদয়পুরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

চন্দ্রনাথ পাহাড়েও গয়া কুণ্ড আছে। লোকে তাকে পদগয়া বলে। যাত্রীরা পিণ্ড দেয় সেখানে। একটি গুহার মধ্যে আছে শিবলিঙ্গের মতো

অনেক পাথর, অবিরত জল ঝরছে সেখানে। তারই নাম উনকোটি শিব। তারপর দুর্গম পথে অগ্রসর হয়ে বিরূপাক্ষর মন্দির, আর পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছাড়িয়ে নূতন মন্দির।

চন্দ্রশেখর এখান থেকে দূরে নয়, কিন্তু তাঁর মন্দির দেখে হতাশ হতে হয়। একটি চতুষ্কোণ গৃহের উপরে গম্বুজ, একটি বড় ও ছোট দুটি, বারান্দায় টিনের চালা। মন্দিরের গায়ে কোন কারুকার্য নেই, নেই কোন শিল্প নৈপুণ্য। আকর্ষণ শুধু চন্দ্রশেখর শিবের ও অদূরবর্তী সমুদ্রের দিগন্তপ্রসারী রূপের। উপকূলের পর্বতমালা ও সন্দীপ নামের দ্বীপটিও এখান থেকে দেখা যায়।

চন্দ্রনাথ বৌদ্ধদেরও তীর্থস্থান। মন্দিরের পিছনে এক পাথরে আছে বুদ্ধের পদচিহ্ন, আর তাঁর অঙ্গুলির অস্থি এই শিখরে সমাহিত আছে। চৈত্রমাসে বৌদ্ধ মেলা হয় চন্দ্রনাথ পাহাড়ে। দলে দলে বৌদ্ধ যাত্রী তখন বুদ্ধ কূপ নামে একটি কুণ্ডের মধ্যে মৃত আত্মীয় বন্ধুর অস্থি নিক্ষেপ করতে আসেন।

বিহার

পাটনা

পাটনা বিহার রাজ্যের রাজধানী এবং শিখ ধর্মের একটি বিশিষ্ট তীর্থস্থান। শহরের পুর্বাঞ্চলে পাটনা সিটিতে জন্ম হয়েছিল দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের। সেই স্থানেই নির্মিত হয়েছে হরি মন্দির গুরুদ্বার। সাধারণ ভাবে একে হরমন্দির গুরদোয়ারা বলা হয়। একটি গলির দিক থেকে প্রবেশের পথ। এটি চারতলা সৌধ, তার উপরে একটি মন্দিরের উপরে গম্বুজ। মন্দিরের মাঝখানে দোতলা, চার কোণায় তিনতলা আর প্রত্যেক কোণে একটি গম্বুজ বিশিষ্ট মন্দিরাকৃতি প্রকোষ্ঠ। একটি সুবৃহৎ কক্ষের শেষ প্রান্তে যাত্রী সাধারণের দর্শনীয় স্থান। কতকগুলি ঐতিহাসিক বস্তু এখানে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে—শ্রীগুরু গ্রন্থসাহেব ছবি সাহেব ও পানগুরা সাহেব। শিখ ধর্মের মূলগ্রন্থ হল গ্রন্থ সাহেব। এখানে যে গ্রন্থ সাহেব আছে তাতে শ্রীগুরুগোবিন্দ সিংহের দস্তখত আছে বলে তার নাম শ্রীগুরু গ্রন্থসাহেব, সংক্ষেপে বলে সাহেব। ছবি সাহেব হল গুরু গোবিন্দ সিংহের একমাত্র অঙ্কিত চিত্র। আর পানগুরা সাহেব হল একটি ছোট দোলনা, তার চারটি পায়া সোনার পাতে মোড়া। শিশু গোবিন্দ সিংহ এই দোলনায় ঘুমোতেন। আরও কতগুলি জিনিস সামনে সাজানো আছে। বালক গোবিন্দ সিংহ বোধহয় এই সব নিয়ে খেলা করতেন। একটি কাঠের কঙ্গা ও এক জোড়া হাতির দাঁতের খড়ম, তাঁর পিতা গুরু তেগ বাহাদুরেরও এক জোড়া চন্দনকাঠের খড়ম আর কবীর সাহেবের তিনটি কাঠের চরকা, হুকুম নামা নামে একখানা মূল্যবান গ্রন্থ, তেগবাহাদুর ও গুরু গোবিন্দ সিংহের ছবি, হাতের লেখা ও হুকুম নামা এখানে রক্ষিত আছে। নিকটেই গুরুজীর কূপ। এই কুয়োর সম্বন্ধে একটি অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। শিখরা এই তীর্থকে পাটনা সাহেব বলেন। গুরুদ্বারে যাত্রীদের বাসস্থান আছে এবং আহারের জন্য লঙ্গর আছে। সেখানে বিনা মূল্যে খেতে পাওয়া যায়।

রাজগির পাটনা থেকে ৬৩ মাইল দূরে। বখ্‌তিয়ারপুর জংসন থেকে একটি শাখা লাইন বিহার শরিফ, পাবাপুরী রোড ও নালন্দার উপর দিয়ে রাজগিরে পৌঁছয়। ট্রেনে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে। মোটরে বা নির্দিষ্ট দিনে সরকারী টুরিস্ট বাসে এক দিনেই দেখা যায়। মহাভারতের কালে এই রাজগৃহ মগধরাজ জরাসন্ধ ও তাঁর পুত্র বৃহদ্রথের রাজধানী ছিল। চারি দিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা এই স্থান গিরিব্রজ নামেও পরিচিত ছিল। এখনও এখানে জরাসন্ধের দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। যেখানে তিনি ভীমের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেছিলেন, সেই স্থানটি এখনও জরাসন্ধের আখড়া নামে খ্যাত। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা বিম্বিসার ও তাঁর পুত্র অজাতশত্রুর রাজধানী ছিল এইখানে। গৃধ্রকূট পর্বতের সন্নিকটে একটি জায়গায় অজাতশত্রু তাঁর পিতা বিম্বিসারকে বন্দী করে রেখেছিলেন। বুদ্ধভক্ত বিম্বিসার এইখান থেকে বুদ্ধকে দেখতে পেতেন পাহাড়ে ওঠা নামা করতে। বুদ্ধের জীবনের অনেক ঘটনা ঘটেছে এই রাজগিরে। জৈন তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীর এখানে চোদ্দ বৎসর বাস করেছিলেন। উষ্ণপ্রস্রবনের নিকটে হিন্দু মন্দিরও আছে। মুসলমানদের কাছেও এই স্থান পবিত্র। রাজগির তাই এখন সর্ব ধর্মের তীর্থ স্থান। গৃধ্রকূট পাহাড় এখানকার প্রধান দর্শনীয় স্থান। বুদ্ধ যেখানে বাস করতেন, সেখানে একটি নূতন মন্দির নির্মিত হয়েছে। আগে পায়ে হেঁটে পাহাড়ে উঠতে হত, এখন আধুনিক রোপ-ওয়েতে উপরে ওঠা যায়। তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িত মধ্য কুচ্ছি বিহার ও জীবকের আম্রবন। বুদ্ধের মৃত্যুর পরে প্রথম সভা হয়েছিল সপ্তপর্ণী গুহায়। এ ছাড়াও মনিয়ার মঠ ও স্বর্ণভাণ্ডার গুহা দর্শনীয় স্থানের অন্যতম। রাজগির একটি স্বাস্থ্য নিবাসও বটে। বৈভার পাহাড়ের নিচে সাত ধারা নামে উষ্ণজলের কুণ্ড আছে। সেই জলে স্নান করে নানা রোগ নিরাময় হয়। শহরে বাসের জন্য অনেকগুলি রেস্ট হাউস ইন্‌স্পেক্সন বাংলো ও ডাক বাংলো আছে, কয়েকটি দেশী হোটেল ও ধর্মশালাও আছে। বেড়াবার জন্য ট্যাক্সি টাঙ্গা একা ও সাইকেল রিক্সা পাওয়া যায়। রাজগিরে একটি টুরিস্ট ইনফর্মেশন সেণ্টারও আছে।

নালন্দা এখান থেকে পাটনার দিকে ৮ মাইল দূরে। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটি বিরাট প্রাঙ্গণের মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ ও বাহিরে একটি জাদুঘরে অনেক সুন্দর মূর্তি ও অন্যান্য নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। অনতিদূরে নালন্দা ইন্‌স্টিটিউট অব বুদ্ধলজি। এখানে রাত্রিবাসের জন্য একটি ইন্‌স্পেক্সন বাংলো, জাপানীজ ও বার্মিজ বৌদ্ধ রেস্ট হাউস আছে। যাতায়াতের জন্য রিক্সা আছে। বখতিয়ারপুর বিহার শরিফ ও রাজগিরে ট্যাক্সি পাওয়া যায়।

পাবাপুরী বা পাওয়াপুরীর নাম পুরাকালে অপাপপুরী ছিল। পাটনা রাজগির রাজপথে বিহার শরিফ থেকে ৮ মাইল দূরে এই স্থান একটি জৈন তীর্থ। বর্ধমান মহাবীর এখানে নির্বাণ লাভ করেছিলেন। সেই স্মৃতিতে এখানে এখন দুটি মন্দির আছে। যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, সেখানে নির্মিত হয়েছে থল মন্দির; আর যেখানে তাঁর শেষকৃত্য হয়, সেখানে একটি জল মন্দির তৈরি হয়েছে। পদ্ম ফুলে সমাচ্ছন্ন একটি জলাশয়ের মধ্যে শ্বেত পাথরের সুন্দর মন্দিরটি সেতু দিয়ে তীরের সঙ্গে সংযুক্ত। এখানকার শান্ত সমাহিত পরিবেশ আকর্ষনীয় মনে হবে। যাত্রীদের জন্য ধর্মশালা আছে।

বিহার শরিফ মুসলমানদের একটি তীর্থ। মখদুম শাহ নামে চতুর্দশ শতাব্দীর একজন ফকিরের সমাধির জন্য এই জায়গার নাম হয়েছে বিহার শরিফ। পাটনা-রাজগির রাজপথে পাটনা থেকে ৪০ মাইল দূরে এই শহর মুসলমান রাজাদের রাজধানী ছিল। এটি একটি প্রাচীন শহর। এখানকার পীর পাহাড়ী পাহাড়ে বুদ্ধ কিছুকাল বাস করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। গুপ্ত যুগের একটি স্তম্ভ আছে। বাঙলার পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল এখানে একটি বিহার স্থাপন করেছিলেন। এই বিহার থেকেই বিহার শরিফ নাম হয়েছে।

পরেশনাথ কলকাতা থেকে ১৯৮ মাইল পশ্চিমে একটি জৈন তীর্থ। ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পরেশনাথ বা পার্শ্বনাথ এখানকার ৪,৪৮০ ফুট উঁচু

পাহাড়ের উপরে অনশনে নির্বাণ লাভ করেছিলেন। এই পাহাড়ের পাদদেশে মধুবনে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর জৈনদের অনেকগুলি মন্দির আছে। প্রধান মন্দিরগুলি পাহাড়ের উপরে। পরেশনাথ ও নিমিয়াঘাট নামে দুটি রেলস্টেশনের যে কোন একটিতে নেমে এখানে আসতে হয়। যাঁরা পায়ে হেঁটে পাহাড়ে উঠতে অক্ষম, তাঁদের জন্য ডুলি ভাড়া পাওয়া যায়। উপরে রাত্রিবাসের জন্য একটি ডাক বাংলো আছে।

বৈদ্যনাথ ধাম

হাওড়া-পাটনা রেলপথে কলকাতা থেকে ২০০ মাইল দূরে জসিডি জংসন এখান থেকে শাখা লাইনে ৪ মাইল দূরে দেওঘর বা বৈদ্যনাথ ধাম হিন্দুর একটি বিখ্যাত তীর্থ ও স্বাস্থ্য নিবাস। এটি পীঠস্থান। সতীর হৃদয় পড়েছিল এই স্থানে। দেবীর নাম জয় দুর্গা আর বৈদ্যনাথ তাঁর ভৈরব। বৈদ্যনাথ শিবের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম বলেও পরিচিত। তিনি রাবণেশ্বর শিব। তাঁর এই নামের একটি পৌরাণিক কাহিনী আছে। আবার রাবণেশ্বর শিবের নাম বৈদ্যনাথ কেন হল, তা নিয়েও কিংবদন্তী আছে। ত্রেতা যুগে রাক্ষসরাজ রাবণ ছিলেন শিবের বড় ভক্ত। শিবকে তিনি লঙ্কায় নিয়ে যাবেন এবং শিব যেতে রাজী না হলে পুরো কৈলাস পর্বতটাই নিয়ে যেতে চান মাথায় করে। শিব রাবণকে তাঁর দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটি দিয়ে সেটি লঙ্কায় প্রতিষ্ঠা করতে বললেন। কিন্তু পথে কোথাও নামালেই তিনি সেখানে অচল হয়ে যাবেন। শিবের এই কথা শুনে দেবতারা উদ্বিগ্ন হলেন। লঙ্কায় শিবের প্রতিষ্ঠা হলে লঙ্কাপুরী অজেয় হবে, দশানন রাবণ দেবতাদের মাথা কাটবেন। বিষ্ণু এর বিহিত করলেন। জ্যোতির্লিঙ্গ হাতে নেবার আগে রাবণ যখন হাত পা ধুয়ে আচমন করছিলেন, তখন বরুণ তাঁর পেটে প্রবেশ করলেন। তারপর শিবলিঙ্গ মাথায় করে রাবণ যখন এই বৈদ্যনাথ ধামের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বরুণের চাপে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। দূর দিয়ে এক ব্রাহ্মণকে যেতে দেখে তাঁকে ডেকে বললেন, এই শিবলিঙ্গ একটু ধর,

আমি এখুনি আসছি। শিবলিঙ্গ হাতে নিয়ে ব্রাহ্মণ বললেন, এ যে বিষম ভারী, এ আমি বেশিক্ষণ ধরতে পারব না। রাবণ রাস্তার ধারেই বসে পড়েছিলেন। কিন্তু কর্মনাশা নদী বয়ে গেল, তবু উঠতে পারছিলেন না। এ দিকে ব্রাহ্মণ বিরক্ত হয়ে বললেন, আমি আর পারছি না, এই রইল তোমার শিবলিঙ্গ। বলে জ্যোতির্লিঙ্গটি মাটিতে নামাতেই বরুণ রাবণের পেট থেকে বেরিয়ে গেলেন, আর ব্রাহ্মণও হলেন অন্তর্হিত। ব্রাহ্মণ তো অন্য কেউ নন, স্বয়ং বিষ্ণু এসেছিলেন ছলনা করতে। কিন্তু বেচারা রাবণ শিবলিঙ্গ আর মাটি থেকে তুলতে পারলেন না। অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হবার পর শিবের মাথায় যে আঘাত করেছিলেন, এখনও তা দেখতে পাওয়া যায়। ত্রেতা যুগে তিনি রাবণেশ্বর শিব নামেই পরিচিত ছিলেন। রাবণ তাঁর মন্দির নির্মাণ করেন ও চন্দ্রকূপ কুণ্ড খনন করেন। তারপরে লোকে এ সব কথা ভুলে যায়, ঘন অরণ্যে আবৃত হয় এই স্থান।

কলিকালে অনার্য সাঁওতালরা এই অঞ্চলে বাস করত। এখানে একটি সুস্বাদু জলের সরোবর দেখে এক দল আর্য ব্রাহ্মণ এসে এখানে বসবাস শুরু করেন। তাঁরা ছিলেন শিবের উপাসক, একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করে শিব পূজা করতে থাকেন। এরই নিকটে সাঁওতালদের তিন খণ্ড পাথর ছিল। তাদের পূর্ব পুরুষেরা এই পাথরের পূজা করত বলে তারাও সবাই এই পাথরের পূজা করত। আর্যরা চাষবাস শুরু করল, সরোবরের জল ক্ষেতে সেচ দিয়ে প্রচুর শস্য পেল। অনার্যরা শিকার করে মাছ মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করত। তারা সেই সব দেখে আশ্চর্য হল। ভাবল যে শিব পূজার জন্যেই বোধহয় ব্রাহ্মণদের এই সম্পদ। তারাও শিবের ভক্ত হয়ে ব্রাহ্মণদের জীবন যাত্রার অনুকরণ করতে লাগল। ক্রমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। এই অঞ্চলের ব্রাহ্মণরা অলস ও বিলাসী হয়ে পড়ল। শিবের পূজায় তাদের আগ্রহ আর রইল না। দেবতাকে তারা অশ্রদ্ধা করতে লাগল। এইবারে ব্রাহ্মণদের এই আচরণে অনার্যরা হল ক্রুদ্ধ। বৈজু নামে এক অনার্য দলপতি প্রতিবাদ জানাবার এক অদ্ভুত উপায় স্থির করল। ব্রাহ্মণদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের জন্য প্রত্যহ

আহারের পূর্বে শিবের মাথায় দণ্ডের আঘাত করতে লাগল। কিছু দিন পরে বুঝতে পারল যে নিরাহারী অবস্থায় শিবের দর্শন ও তাঁকে স্পর্শ করবার জন্য মন তার আকুল হয়ে উঠছে। শেষে তার প্রতিজ্ঞার চেয়ে মনের ব্যাকুলতাই বড় হয়ে উঠল। এক দিন বনের মধ্যে তার গরু হারিয়ে গিয়েছিল। সেই গরু খুঁজতে দিবা উত্তীর্ণ হয়ে যায়। সন্ধ্যা বেলায় পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত বৈজু স্নান করে খেতে বসতেই তার শিবের কথা মনে পড়ে গেল। শিবের দর্শন হয় নি, লাঠির আঘাত করা হয় নি তাঁর মাথায়। কাজেই বৈজু খাওয়া ফেলে তখুনি ছুটে গেল শিবের দর্শনে। শিব ভাবলেন, এই বৈজুই আমার যথার্থ ভক্ত, আমার কথা মনে পড়তেই তার ক্ষুধা তৃষ্ণা ও পরিশ্রমের কথা ভুল হয়ে গেল। তাই বৈজুকে দেখা দিয়ে তিনি বললেন, বর নাও। বৈজু বলল, আমার তো কোন কিছুর প্রয়োজন নেই প্রভু, যদি কিছু দিতে চাও তো আমার নামেই যেন তোমার পরিচয় হয়। শিব বললেন, তথাস্তু। আজ থেকে তোমার নাম হবে বৈজুনাথ, আর আমাকে সবাই বৈদ্যনাথ বলে জানবে।

কিন্তু শিবপুরাণে অন্য কাহিনী আছে। শিবকে লঙ্কায় নিয়ে যাবার জন্য রাবণ একটি একটি করে নটি মুণ্ড কেটে শিবের পায়ে দিয়েছিলেন। ভক্ত তাঁর শেষ মাথাটিও কেটে ফেলবেন এই ভয়ে শিব লঙ্কায় যেতে রাজী হয়েছিলেন। তারপর তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টিতে সেই মুণ্ডগুলি আবার জোড়া লেগেছিল। শিব অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী বৈদ্য ছিলেন। আর এই ঘটনার জন্যই রাবণেশ্বর শিবের নাম হয়েছিল বৈদ্যনাথ।

বৈদ্যনাথের মন্দির রেলওয়ে স্টেশন থেকে বেশি দূরে নয়, শহরের মাঝখানে বাজারের গায়েই মন্দির। পাথরে বাঁধানো একটি প্রশস্ত অঙ্গনের মধ্যে দুটি বড় মন্দির—বৈদ্যনাথ ও জয়দুর্গার। দুই মন্দিরের চূড়ায় নানা রঙের ধ্বজা নিশান রঙীন কাপড় বা জরির সূতা দিয়ে যুক্ত। যাত্রীরা মানত করে এই ধ্বজা নিশান বাঁধে। স্বামী-স্ত্রী গাঁটছড়া বেঁধে এই মন্দির প্রদক্ষিণ করে, ঢাক ঢোল বাজে। অঙ্গনের চারি দিক ঘিরে আরও গোটা দশেক ছোটখাট মন্দির আছে নানা দেবদেবীর। কিন্তু শিল্প সমন্বিত কারুকার্যমণ্ডিত

কিছু নেই। প্রাচীন বলেই এই মন্দির সমাদৃত। মন্দির নয়, মন্দিরের দেবতা। বর্তমান মন্দির নির্মাণ করেছেন গিধৌরের প্রথম রাজা পুরাণমল প্রায় পৌনে চারশো বছর আগে। তারকেশ্বরের মতো এখানেও অগণিত যাত্রী আসে রোগমুক্তির আশা নিয়ে। পায়ে হেঁটে কাঁধে করে তারা গঙ্গাজল আনে প্রায় মাইল চল্লিশেক দূর থেকে। বাঁশের বাঁকের দুধারে দুটো ঝুড়ি, নিচে তিনটি করে পায়া। মাটিতে নামালে তা মাটি স্পর্শ করে না। রঙীন কাপড়ের টুকরো সাজানো সেই গঙ্গাজলের বাঁক নিয়ে একসঙ্গে অনেক যাত্রী দল বেঁধে আসে শ্রাবণ মাসে। শিব গঙ্গার বাঁধানো ঘাটে স্নান করে যাত্রীরা বৈদ্যনাথের পূজা করে, মানত করে, ধর্না দেয়, কায়িক পরিশ্রম দিয়ে দণ্ড খেটে চায় দেবতার আশীর্বাদ। আর ধনীর পূজার জাঁক-জমক দেখে সাধারণ যাত্রী বিস্ময়াপন্ন হয়।

গয়া

গয়া বিহার রাজ্যের শ্রেষ্ঠ তীর্থ ও ভারতের তীর্থস্থানগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কলকাতা থেকে গয়ার দূরত্ব ২৯২ মাইল, পাটনা থেকে সড়ক পথে বিহার শরিফ ও রাজগির হয়ে ১০৪ মাইল। কলকাতা দিল্লী পাটনা ও কিউল জংশন থেকে ট্রেন যাতায়াত করে। রেলওয়ে ষ্টেশনে রিটায়ারিং রুম আছে। শহরে সার্কিট হাউস ও ডাকবাংলো আছে। ধর্মশালা ও দেশী হোটেলের অভাব নেই। ভারত সেবাশ্রম সংঘেও আশ্রয় পাওয়া যায়। পিতৃপক্ষে পিণ্ডদানের জন্য এখানে অগণিত যাত্রী সমাগম হয়। তার জন্য ভারত সেবাশ্রম সংঘের সুব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য।

গয়া পীঠস্থান নয়। গয়া তীর্থে পরিণত হয়েছে গয়াসুর নামে এক অসুরের আত্মত্যাগের জন্য। বায়ুপুরাণে এই কাহিনী আছে। জাতে অসুর হলেও গয়াসুরের আচরণ ছিল ধার্মিকের মতো। একবার তিনি কোলাহল পর্বতে উঠে কঠোর তপস্যায় বসেছিলেন। দেবতারা দেখলেন, মহা বিপদ। একে ধার্মিক, তার উপর এই তপস্যা। ইনি তো স্বর্গ থেকে

দেবতাদের তাড়াবেন না, নিজেই দেবতা হয়ে বসবেন, আর দেবতারা বঞ্চিত হবেন নিজ অধিকারে। কাজেই তাঁরা পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে তপস্যা শেষ করবার আগেই গয়াসুরকে বর দেওয়া যাক। তারপর দেবতারা সবাই গিয়ে কোলাহল পর্বতে উঠে বললেন, বৎস, তোমার তপস্যায় আমরা তুষ্ট হয়েছি, তুমি বর নাও। গয়াসুর বললেন, তবে আমাকে এই বর দিন যে আমার দেহ যেন পৃথিবীর পবিত্রতম বস্তু হয়। দেবতারা ভাবলেন, এ আবার এমন কী বর! তাই 'তথাস্তু' বলে সবাই বিদায় নিলেন।

গয়াসুর এবারে দেশে ফিরে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে লাগলেন। আর যত পাপী তাপী পশু পাখি তাঁর পবিত্র দেহ দেখে উদ্ধার হয়ে যেতে লাগল। সোজা স্বর্গবাস। গয়াসুর এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে যাচ্ছেন, এক নগর থেকে অন্য নগরে, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে। জীবের মুক্তির জন্য তিনি দিশেহারা। আর তাঁর দর্শন পেয়েই সবাই স্বর্গে যাচ্ছে। দেখতে না দেখতে নরক শূন্য হয়ে গেল, আর স্বর্গে হল স্থানাভাব। বিপদ দেখে দেবতারা স্থির করলেন, গয়াসুরকে নিশ্চল করতে হবে, ও যেন আর নড়তে না পারে! অমনি তাঁরা গয়াসুরের কাছে গিয়ে বললেন, যজ্ঞের জন্য তোমার দেহ আমাদের দরকার, আমরা তোমার পবিত্র দেহের উপরেই যজ্ঞ করব। গয়াসুর বললেন, সে তো আমার সৌভাগ্য প্রভু। বলেই শুয়ে পড়লেন। গয়ায় মাথা, উড়িষ্যার যাজপুরে নাভি ও অন্ধ্রের পীঠাপুরমে পা। তাঁকে নিশ্চল করবার জন্য ব্রহ্মা যমরাজকে বললেন ধর্মশিলাটি তাঁর দেহের উপরে রাখতে। আর সমস্ত দেবতারা সেই ধর্মশিলার উপর উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু গয়াসুর নিশ্চল হলেন না। তখন বিষ্ণুও তাঁর উপর উঠলেন। গয়াসুর এবারে নিশ্চল হয়ে বললেন, আমাকে নিশ্চল করবার জন্য আপনাদের এত কষ্টের কী দরকার ছিল! আমাকে একবার বললেই তো পারতেন! দেবতারা স্বীকার করে বললেন, ঠিকই তো! তাহলে তুমি আর একটি বর নাও। গয়াসুর বললেন, আমার নিজের জন্য আমি কিছুই চাই না। আপনারা এই বর দিন যে যত দিন পৃথিবী থাকবে আর

আকাশে উঠবে চন্দ্র সূর্য, ততদিন আপনারা সবাই এই শিলায় অবস্থান করবেন, আর এই স্থান একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত হবে। দেবতারা বললেন, তথাস্তু। গয়াসুরের নামে এই তীর্থের নাম হল গয়া। উড়িষ্যার যাজপুর ও অন্ধ্রের পীঠাপুরমও তীর্থ বলে পরিচিত হল।

ধর্মশিলারও একটি কাহিনী আছে। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি মুনির পত্নী ধর্মব্রতা তাঁর স্বামীর শাপে শিলায় পরিণত হয়েছিলেন। তবে অহল্যার মতো পাপে নয়, বিনা দোষে। পৃথিবী পরিভ্রমণ করে বেড়াবার সময় মরীচি এক যুবতী কন্যাকে দেখেছিলেন কঠোর তপস্যারত। প্রশ্ন করে তাঁর পরিচয় জানলেন, তিনি রাজা ধর্মের কন্যা ধর্মব্রতা, বিশ্বরূপা তাঁর মা। পতিব্রতা হবার জন্য তপস্যায় তিনি নিজের যৌবন ক্ষয় করছেন। এই কথা জেনে মরীচি বললেন যে তিনিও এমনি এক পতিব্রতাকে পাবার জন্য সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মরীচি তাঁকে বিবাহ করতে চাইলেন এবং ধর্মব্রতা তাঁর পিতার কাছে এই প্রস্তাব করতে বললেন। শেষ পর্যন্ত তাঁদের বিবাহ হয়ে গেল। একদিন মরীচি তাঁকে পদসেবার আদেশ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ভাঙলে দেখলেন যে স্ত্রী নেই, কোলের উপর থেকে পা নামিয়ে রেখে কখন এক সময়ে তিনি উঠে গেছেন। আর যায় কোথা! কিছু না জেনে শুনেই তিনি শাপ দিলেন যে তুমি শিলা হও। ধর্মব্রতা অকারণে উঠে যান নি। তাঁর শ্বশুর ব্রহ্মা এসেছিলেন বেড়াতে, তাঁরই অভ্যর্থনার জন্য তাঁকে উঠতে হয়েছিল। স্বামীর এই অন্যায় শাপে ধর্মব্রতাও ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন যে এর জন্য শিব মরীচিকে শাপ দেবেন। কিন্তু ধর্মব্রতার দুঃখ তাতে ঘুচল না, দেবতাদের কাছে তিনি প্রার্থনা জানালেন যে স্বামীর অভিশাপ তো খণ্ডাবার নয়, তাই তিনি যে শিলায় পরিণত হবেন তা যেন পবিত্র হয় তীর্থের মতো। দেবতারা বললেন, তাই হবে। কিন্তু গয়াসুরের দেহের উপর স্থাপন করে দেবতারা যখন তার উপর উঠবেন তখনই তা পবিত্র হবে এবং সেই শিলার উপরে পিণ্ড দিলে মুক্তি হবে পূর্বপুরুষের।

অনেকে মনে করেন যে গয়ার চেয়ে বুদ্ধ গয়া বেশি প্রাচীন এবং এই বৌদ্ধ তীর্থই কালক্রমে হিন্দু তীর্থে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এ কথা ঠিক

নয়। রামায়ণ ও মহাভারতেও গয়ার উল্লেখ আছে এবং তা বুদ্ধের জন্মের অনেক আগের ঘটনা। রাজর্ষি গয় এখানে একটি বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন বলেই এই স্থানের নাম হয়েছিল গয়া। হরিবংশে অন্য কথা আছে। মনুর এক পৌত্রের নাম গয়। এই গয় গয়াপুরীতে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। গয়া একটি পবিত্র স্থান ছিল বলেই রাজকুমার গৌতম এখানে তপস্যার জন্য এসেছিলেন এবং তিনি বুদ্ধ হবার পরে এটি বৌদ্ধ তীর্থে পরিণত হয়েছে।

গয়ায় পাহাড় আছে তিনটি—রামশিলা, প্রেতশিলা ও ব্রহ্মযোনি পাহাড়। শহরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ফল্গু নদী। এই নদীর তীরে বিষ্ণুপাদ মন্দির ঘিরেই গয়া শহরটি গড়ে উঠেছে। মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে খানিকটা দূরে সূর্যকুণ্ড নামে একটি জলাশয় আছে। তার দক্ষিণ দিয়ে একটি পথ ব্রহ্ম সরোবরের দিকে গেছে। রামশিলা পাহাড়ের পথ বেরিয়েছে চকের কাছ থেকে। পথের ধারে দুঃখহরণ দেবী। তারপরে পথ গেছে রেলের পুলের নিচে দিয়ে। নিচে কাকবলী দেবীর মন্দিরে যাত্রীরা পিণ্ড দেয়। পাহাড়ের উপরে পাতালেশ্বর শিব ও রাম লক্ষ্মণের মন্দির। বিষ্ণুপাদ মন্দির থেকে এ জায়গার দূরত্ব হবে মাইল তিনেক; কিন্তু প্রেত শিলা এখান থেকে দু মাইল দূরে। পাহাড় বেশি উঁচু নয়, শ চারেক সিঁড়ি। নিচে ব্রহ্মকুণ্ড, আর উপরে একটা মণ্ডলের নিচে পাথরের গায়ে স্বর্ণ রেখা। লোকে বলে ব্রহ্মার লিপি। নিচে ব্রহ্মকুণ্ডের বাঁধানো ঘাটে বসে পিণ্ড দিতে হয়। গয়ায় এসে প্রথম পিণ্ড দিতে হয় প্রেত শিলায়, তারপর রাম শিলায়। মূল পিণ্ড ফল্গু নদীর ধারে। বিষ্ণুপাদেও পিণ্ড দেবার নিয়ম আছে।

আগে সঙ্কীর্ণ পথ ধরে বিষ্ণুপাদ মন্দিরে আসতে হত। এখন যে কোন যানবাহনে মন্দিরের অন্য ধারে আসা যায়। একটি মস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে ছোট বড় অনেকগুলি মন্দির আছে। প্রাঙ্গণের ভিতরে আঁকাবাঁকা পথে ফল্গু নদীর তীরে আসা যায়। নদী অনেক নিচে, বহু সিঁড়ি নেমে নদীর শুকনো বালির চড়ায় পৌঁছতে হয়। ফল্গু অন্তঃ সলিলা। বালি খুঁড়ে

জল পাওয়া যায়। নদীর ওপারে সীতাকুণ্ড। মন্দিরে রাজা দশরথের হাত আছে। হাত বাড়িয়ে তিনি মা জানকীর হাত থেকে পিণ্ড গ্রহণ করেছিলেন।

বুদ্ধগয়া যাবার পথে ব্রহ্মযোনি পাহাড় বিষ্ণুপাদ মন্দির থেকে মাইল খানেক দূরে। এখানেও চারশোর বেশি সিঁড়ি। দুটি সঙ্কীর্ণ গুহা আছে। সেখানে যাবার পথে অক্ষয় বট ও মঙ্গলা গৌরী। রুক্মিণী কুণ্ডে স্নান করে অক্ষয় বটের নিচে শেষ পিণ্ড দানের বিধি। পাণ্ডারা সেখানেই সুফল দেয়। সুফল মানে, শ্রাদ্ধ শান্তি পিণ্ডদানের পর বটগাছের নিচে বসে যাত্রীরা পাণ্ডাকে দক্ষিণা দেয়, আর পাণ্ডা দেয় সুফল। পাণ্ডা যাত্রীকে বলে, তোমার গয়ার কাজ সফল হল। এইখানেই একটি প্রিয় ফল যাত্রীকে মৃতের জন্য ত্যাগ করতে হয়। সে ফল সে আর কখনও খাবে না।

বিষ্ণুপাদ মন্দিরের প্রাঙ্গণে গয়েশ্বরী দেবী আছেন। ফল্গু নদীর ধার থেকে ফেরার সময়ে প্রথমে একটি মন্দিরে এই শক্তি মূর্তি। অন্ধকার ঘরে তাঁর উজ্জ্বল চোখ জ্বল জ্বল করে জ্বলে। শিব অন্যত্র আছেন। পূর্ব দিকের সদর দরজার সামনেই হনুমানের বিশাল মূর্তি। উত্তরে রাণী অহল্যা বাঈ-এর মূর্তিও আছে। বিষ্ণুপাদ মন্দির তিনিই নির্মাণ করে দিয়েছেন। এত বড় পাথরের মন্দির এ অঞ্চলে আর নেই। মূল মন্দির সংলগ্ন সভা মণ্ডপটিও সুন্দর। প্রাঙ্গণের একটি বৃক্ষের নিচেও যাত্রীরা পিণ্ডদান করে। বিষ্ণুপাদ মন্দিরে বিষ্ণুর পদচিহ্ন। তারই উপরে মন্দির। এই পদচিহ্নই দেবতা। এই চিহ্নই সেই বিরাট পুরুষের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

রেলওয়ে স্টেশনে বিহার সরকারের টুরিস্ট অফিস আছে। শহরে বাস ট্যাক্সি টাঙ্গা ও সাইকেল রিক্সা পাওয়া যায়।

বুদ্ধ গয়া

বুদ্ধগয়া গয়া থেকে ৮ মাইল দূরে। বাস যাতায়াত করে, ট্যাক্সি টাঙ্গা বা সাইকেল রিক্সাও চলে। আড়াই হাজার বছর আগে রাজকুমার

গৌতম এখানকার বোধিদ্রুমের নিচে তপস্যা করে বুদ্ধ হয়েছিলেন। নিরঞ্জনা নদীর তীরে এই সুন্দর স্থানটি এখন একটি বৌদ্ধ তীর্থ। এইখানেই নির্মিত হয়েছে মহাবোধি মন্দির। ১৭০ ফুট উঁচু বর্তমান মন্দিরটি প্রায় হাজার বছরের পুরনো। লোকের বিশ্বাস যে সপ্তম শতাব্দী বা তারও আগে এই জায়গায় ঠিক এই রকমেরই একটি মন্দির ছিল। মন্দিরে বুদ্ধের একটি বিরাট মূর্তি আছে। যেখানে যে ভাবে বসে তিনি তপস্যা করেছিলেন, ঠিক সেইখানে সেই ভাবেই সেই মূর্তিটি স্থাপিত হয়েছে। মন্দিরের মধ্যে একটি শিবলিঙ্গও প্রতিষ্ঠিত আছে। বাহিরে সেই বিশাল বোধিদ্রুম সমগ্র মন্দির প্রাঙ্গণ ছায়া শীতল করে রেখেছে। অপূর্ব এই মন্দিরের স্থাপত্য কর্ম। তার চারি ধার ঘিরে নানা আকারের অসংখ্য স্তূপ গত দু হাজার বছরের বৌদ্ধ শ্রমণদের স্মৃতি রক্ষা করে আসছে। অদূরে অনিমেষলোচন বিহার। বুদ্ধ হবার পরে গৌতম যেখানে দাঁড়িয়ে বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতায় ভরা দৃষ্টি নিয়ে বোধিদ্রুমের দিকে চেয়েছিলেন অনিমেষ লোচনে, সেইখানেই এই সুন্দর ছোট মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। বোধিদ্রুমের নিচে বজ্রাসন, উত্তর দিকের মন্দির গাত্রে চঙ্ক্রমণ নামের বেদী, রত্নগর চৈত্য, তোরণ এবং কারুকার্য করা পাথরের রেলিঙ—এই সবও দর্শনীয়। অনতিদূরে একটি অশোকের স্তূপ, তারাদেবীর মন্দির, একটি পাথরের উপরে বুদ্ধের পদচিহ্ন, মহাবোধি সংঘারাম, পদ্মপুকুর ও মুচলিন্দ সরোবর।

তারপরে দেখতে হয় এ কালের দর্শনীয় স্থানগুলি—চীনা মন্দির, তিব্বতী মহাযান গোম্ফা, থাই ও বার্মিজ মন্দির এবং একটি জাদুঘর। এখানে টুরিস্ট বাংলো আছে। পি. ডব্লু. ডি. ইনস্পেক্সন বাংলো, স্টেট রেস্টহাউস, মহাবোধি রেস্টহাউস, ইয়ুথ হস্টেল ও বিড়লা ধর্মশালা। মন্দিরগুলিতেও আশ্রয় পাওয়া যায়। টুরিস্ট ইনফর্মেশন সেণ্টার আছে।

উড়িষ্যা

ভুবনেশ্বর

উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বর কলকাতা থেকে ২৭২ মাইল পশ্চিমে। প্লেনে সময় লাগে দেড় ঘণ্টা, আর ট্রেনে একটি রাত সময় লাগে। কলকাতা থেকে ম্যাড্রাস গামী ট্রেন ভুবনেশ্বরে দাঁড়ায়, পুরী এক্সপ্রেস ভুবনেশ্বরের উপর দিয়ে খুর্দারোড জংশন থেকে শাখা লাইনে পুরী পৌঁছয়।

আধুনিক পরিকল্পনায় তৈরি এই নূতন রাজধানীর পাশেই পুরনো শহরটি বারাণসীর মতো পবিত্র। চারিদিকে ছড়ানো স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন তৃতীয় খৃষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ষোড়শ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দুহাজার বছরের ইতিহাসের সাক্ষ্য দিচ্ছে। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বিন্দু সরোবরের তীরে ও আশে পাশে একদা সাত হাজার মন্দির ছিল বলে জনশ্রুতি। এখনও শ-পাঁচেক মন্দির আছে এই শহরে। কিন্তু সব মন্দিরে দেবতা নেই। অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে এই মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল। উড়িষ্যার মন্দির শৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। জগমোহন নামে একটি প্রশস্ত চতুষ্কোণ কক্ষের পিছনে দেউল নামের উচ্চ শিখর বিশিষ্ট দেবতার গর্ভগৃহ। বড় মন্দিরে জগমোহনের সামনে ভোগ মন্দির ও নাট মন্দিরও যুক্ত থাকে। মন্দিরের সমস্ত অংশ সুন্দর কারুকার্য মণ্ডিত।

শহরে শিবের লিঙ্গরাজ মন্দিরটিই সবচেয়ে বিশাল ও সুন্দর। মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে অভিভূত হতে হয়। মন্দির যে এমন বিশাল হয় তা ধারণার অতীত। গর্ভগৃহে বিরাট আকারের লিঙ্গমূর্তি, সার্থক তাঁর লিঙ্গরাজ নাম। অসংখ্য ছোট মন্দিরে সমস্ত প্রাঙ্গণ ছেয়ে আছে। ছোট বড় ষাটটি মন্দিরের মধ্যে পার্বতীর মন্দিরটিই সবচেয়ে সুন্দর।

পৌরাণিক যুগে এ স্থানের নাম ছিল একাম্র কানন। অপরূপ সুন্দর স্থান। একদিন শিব পার্বতীকে বললেন যে কাশীর চেয়ে একাম্র কানন তাঁর বেশি প্রিয়। পার্বতীর ভারি কৌতূহল হল। তিনি গোপিনী বেশে এই স্থান দেখতে এলেন। তাঁর রূপ দেখে কৃত্তি আর বাস নামে দুই দৈত্য

মোহিত হল। এগিয়ে এসে তাঁকে বিয়ে করতে চাইল। পার্বতী বললেন, বেশ, আগে আমাকে কাঁধে চড়াও। দৈত্যদের মহাপুলক। দুজনে মিলে তাঁকে কাঁধে তুলে নিল। আর যায় কোথায়! দেবীর দেহের ভারে তারা ছাতু হয়ে গেল, কিন্তু পার্বতীর পেল তৃষ্ণা। ততক্ষণে শিব এসে উপস্থিত হয়েছেন। জলের জন্য তিনি যে সরোবর তৈরি করলেন, তারই হল নাম বিন্দু সরোবর। শিব সমস্ত নদী ও সরোবরকে ডেকে বলেছিলেন, এক এক বিন্দু করে জল দাও। সবাই দিল বিন্দু বিন্দু জল। বিন্দু সরোবরে স্নান করে তাই সমস্ত তীর্থের পুণ্য হয়। লিঙ্গরাজ মন্দির থেকে বেরিয়ে উত্তরের পথ ধরতে হয়। বাজারের ভিতর দিয়ে সেই পথ বিন্দু সরোবরে পৌঁছেছে। পূর্ব পারে অনন্ত বাসুদেবের মন্দির।

বিন্দু সরোবর দেখে সবাই সিদ্ধারণ্যে যান। এক সময়ে সেখানে একটি আম্রবন ছিল, আর ছিল সুস্বাদু জলের প্রস্রবণ। তাই দেখে কয়েকজন সিদ্ধ এসে বসবাস শুরু করেন। পাহাড় নেই, সমুদ্র নেই, নদীও নেই। তবু এই মনোরম স্থান মন্দির নির্মাণের উপযোগী বলে রাজাদের মনে হল। তৈরি হল মুক্তেশ্বর, কেদারেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর ও পরশুরামেশ্বরের মন্দির। সিদ্ধারণ্যে এখন কোন আম্রবন নেই, কোন অরণ্যও নেই। শুধু প্রস্রবণ আছে কেদার গৌরী ও গৌরীকুণ্ড। গৌরী কুণ্ড এখন একটি বাঁধানো সরোবর। অনেক মেয়ে পুরুষ ঘাটে স্নান করে। কেদার গৌরীর জলে যেমন নানা গুণ আছে, স্বাদও তেমনি সুন্দর। মুক্তেশ্বরের মন্দিরে দেবতা আছেন, কিন্তু যাত্রীরা আসে মন্দিরের শিল্পকলা দেখতে। আধ মাইল দূরে ব্রহ্মকুণ্ডের পূর্বে ব্রহ্মেশ্বরের মন্দির।

নূতন রাজধানী থেকে ৪ মাইল পশ্চিমে উদয়গিরি-খণ্ডগিরি। দুই দিকে দুই পাহাড়। এতে বৌদ্ধ ও জৈন গুহা আছে অনেকগুলি। খণ্ডগিরি পাহাড়ের উপরে একটি জৈন মন্দির আছে।

ভুবনেশ্বরে স্টেট গেস্ট হাউস ও সার্কিট হাউস আছে। টুরিস্ট বাংলো, পান্থনিবাস, ইনস্পেকসন বাংলো, ভুবনেশ্বর ক্লাব ও খণ্ডগিরি ইয়ুথ হস্টেলেও থাকা যায়। রেলওয়ে স্টেশনে রিটায়ারিং রুম আছে। শহর দেখার

জন্য বাস ট্যাক্সি ও সাইকেল রিক্সা আছে। উড়িষ্যা সরকারের টুরিস্ট ইনফর্মেশন ব্যুরোতে গাইড পাওয়া যায়।

পুরী

ভুবনেশ্বর থেকে ৩৯ মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরের তীরে পুরী একটি তীর্থস্থান ও জনপ্রিয় যাত্রী কেন্দ্র। কলকাতা থেকে ট্রেনে পুরীর দূরত্ব ৩১০ মাইল, যাত্রা এক রাত্রির। তীর্থযাত্রীরা ধর্মশালায় ওঠেন আর ভ্রমণ বিলাসীরা ওঠেন সমুদ্রের ধারের হোটেলগুলিতে। এ ছাড়াও টুরিস্ট বাংলো, পান্থনিবাস, সার্কিট হাউস, ফরেস্ট রেস্ট হাউস, পি. ডব্লু. ডি. ইনস্পেকসন বাংলো আছে। রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাম্পিং কোচও পাওয়া যায়। শহরে বেড়াবার জন্য আছে অসংখ্য সাইকেল রিক্সা।

জগন্নাথদেবের মন্দির শহরের মাঝখানে। যে উঁচু প্রাচীরে এই মন্দির ঘেরা, তার নাম মেঘনাদ। চারিদিকে চারটি দরজা আছে। উত্তরে হস্তীদ্বার, অশ্বদ্বার দক্ষিণে, পশ্চিমে খাজা দ্বার, আর প্রধান দরজা সিংহদ্বার হল পূর্বে। এই দ্বারের সামনেই অরুণ স্তম্ভ। পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু এক পাথরের এই ধ্বজস্তম্ভটি আনা হয়েছে কোনারক থেকে। বাজার হাট এই দিকেই। যাত্রীরা এই পথেই যাতায়াত করে।

উড়িষ্যার অন্যান্য মন্দিরের মতো এই মন্দিরেও চারটি ভাগ—মূল মন্দির, জগমোহন, ভোগ মন্দির ও নাটমন্দির। ভোগমন্দিরে গরুড় স্তম্ভ। প্রাঙ্গণ দুটি—অন্তর্প্রাঙ্গণ ও বহির্প্রাঙ্গণ। অন্তর্প্রাঙ্গণের চারিধার ঘিরে শতাধিক দেবদেবীর ছোট ছোট মন্দির। মূল মন্দিরের দেউল ১৯২ ফুট উঁচু, গর্ভগৃহে কালো পাথরের বেদীর উপরে জগন্নাথ কৃষ্ণ ভাই বলভদ্র ও ভগিনী সুভদ্রার দারু মূর্তি। চোদ্দ বছর পর পর এই কাঠের মূর্তি বদল হয়। তার নাম নবকলেবর উৎসব। পূজার্চনা ও অন্যান্য কাজের জন্য এই মন্দিরে ছয় হাজার মানুষ নিযুক্ত আছে। কুড়ি হাজার মানুষের অন্ন সংস্থান হয় এই মন্দির থেকে। একটি কমিটির উপরে এই মন্দির পরিচালনার ভার, পুরীর রাজা তার সভাপতি। পঞ্চায়েতের খাতায় টাকা

জমা দিয়ে যাত্রীরা জগন্নাথদেবের ভোগ দিতে পারে। সাধারণ ডাল ভাত তরকারির ভোগ দিতে হলে একশো বত্রিশ টাকা জমা দিতে হয়, পাঁচ হাজার দুশো টাকা লাগে ছাপান্ন পদের ভোগের জন্য। একে আট্‌কে বা আটকিয়া বন্ধন বলে। অল্প টাকায় আট্‌কে হয় না। অন্য ভোগ হয়, পূজা হয়, মালা হয়।

অবন্তীর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই মন্দিরে দেবতার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে কিংবদন্তী আছে। জগন্নাথদেব শবর জাতির দেবতা ছিলেন। হাজার বছর আগে শবররাই তাঁর পূজা করত। তারা ছিল তান্ত্রিক। জৈনরা কোন সময়ে জগন্নাথদেবকে নিয়ে গিয়ে প্রাচী নদীর তীরে পূজা করতে শুরু করে। শবররা এই মূর্তি উদ্ধার করে দেবতার মূর্তি বদল করে নাম রাখে নীলমাধব। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলমাধবের দর্শন চেয়ে পেলেন না। এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ করে পেলেন দারুব্রহ্ম। সমুদ্রের জলে ভেসে ভেসে নিমের কাঠ এল। রাজা বললেন, এই দিয়েই মূর্তি গড়ব। ঠাকুর এলেন কারিগরের ছদ্মবেশে। বললেন, বন্ধ ঘরে মূর্তি গড়ব, একুশ দিন কেউ যেন না দেখে। রাজা বললেন, তথাস্তু। মূর্তি গড়া শেষ হচ্ছে না দেখে ব্যস্ত হয়ে রাজা ঘরে ঢুকলেন, দেখলেন, তিনটি অসমাপ্ত মূর্তি, আর কারিগর নেই। রাজা নিজের দোষ বুঝতে পেরে আবার প্রার্থনা করলেন। তখন ব্রহ্মা এলেন। আর সেই তিনটি অসমাপ্ত মূর্তিকে রথে চড়িয়ে মন্দিরে এনে প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই থেকেই বছরে বছরে রথ যাত্রা। তিনখানা রথ বেরোয়। নন্দী ঘোষ জগন্নাথের রথ, তার রঙ লাল ও হলদে। বলভদ্রের রথ তালধ্বজ, রঙ লাল আর নীল। সুভদ্রা ওঠেন দর্পদলনে, তার রঙ লাল ও কালো। এক এক খানা রথ যে কত বড় তা না দেখলে ধারণা হয় না। এপাশে ওপাশে পঁয়ত্রিশ ফুট, আর উঁচুতে পঁয়তাল্লিশ ফুট। লক্ষ লক্ষ লোক রথের দড়ি টানে। এই রথে চড়ে দেবতারা গুণ্ডিচা বাড়িতে গিয়ে এক সপ্তাহ কাটিয়ে উল্টো রথে মন্দিরে ফেরেন। ব্রহ্মা নিজে এই রথযাত্রা পৃথিবীতে চালু করেছিলেন।

পুরীতে আরও অনেক দর্শনীয় স্থান আছে। স্বর্গদ্বারের কাছে আছে

হরিদাস ঠাকুরের সমাধি আর সারস্বত গৌড়ীয় মঠ। যবন হরিদাস ছিলেন চৈতন্যদেবের ভক্ত। পুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠ ও মিশন গৌড়ীয় মঠও আছে। বেদান্ত চর্চার জন্য গোবর্ধন মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শঙ্করাচার্য। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সরদা মঠ দ্বারকায়, হিমালয়ে যোশীমঠ ও শ্রীঙ্গেরীমঠ কর্ণাটক রাজ্যে। বাসুদেব আশ্রমে কৃষ্ণমূর্তি আছে, আর সিদ্ধ বকুলে একটি প্রাচীন বকুল গাছ। গাছের গুঁড়ি ফেটে গেছে চৌচির হয়ে, শুধু বাকলের সঙ্গে যুক্ত থেকে অত বড় একটা গাছ মাটি থেকে রস গ্রহণ করছে। এই বকুল গাছের নিচে তপস্যা করে যবন হরিদাস সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এই নিয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে। যবন হরিদাস তপস্যা করতেন প্রখর সূর্যের নিচে। একদিন একখণ্ড বকুলের ডালে দাঁত ঘষতে ঘষতে চৈতন্যদেব এলেন ভক্তকে দেখতে। এসে তাঁর কষ্ট দেখে সেই ডালটি মাটিতে পুঁতে দিলেন। দেখতে দেখতে একটি বকুল গাছ বেড়ে উঠে তাঁর মাথার উপরে স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করল। তারপর যখন জগন্নাথদেবের নবকলেবর হবে তখন রাজা বললেন, ওই বকুল গাছটি চাই। কারও কোন কথা মানলেন না, লোক পাঠালেন গাছটা কাটবার জন্য। কিন্তু রাজার লোক এসে দেখল, আশ্চর্য ব্যাপার, গাছ আছে, কিন্তু গুঁড়ি নেই, কাঠের বদলে ভিতরটা একেবারে ফাঁপা। সিদ্ধ বকুলের পাশে এখন নতুন গাছ হয়েছে।

গম্ভীরার আবহাওয়া গম্ভীর ও শান্তিপ্রদ। সেখানে আছে চৈতন্যদেবের পাদুকা কমণ্ডলু ও কাঁথা। বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য যেখানে চৈতন্যদেবের সঙ্গে তর্ক করেন, সে জায়গাটিও আছে। আর আছে রাধাকান্ত মন্দির। শ্বেতগঙ্গা একটি চতুষ্কোণ বাঁধানো সরোবর। ত্রেতাযুগে শতবর্ষ অনশন করবার পর শ্বেতরাজ মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের সঙ্গে জগন্নাথদেবের অর্চনা করেছিলেন। এখন তিনি বিষ্ণুর মৎস্য অবতারের সঙ্গে শ্বেতমাধব রূপে বিরাজিত। এই সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে জগন্নাথদেবের মন্দিরের চূড়া দেখা যায়। মন্দিরের পিছন দিয়ে ঘুরে মার্কণ্ডেয় সরোবরে যেতে হয়। বেশ গ্রাম্য পরিবেশ, কিন্তু সরোবরটি বাঁধানো। মার্কণ্ডেয় মহাদেবের মন্দির রাস্তার ধারেই। লোকে বলে যে সত্য যুগে মহারাজা

ইন্দ্রদ্যুম্ন এই মন্দিরও নির্মাণ করেছিলেন, এই তীর্থ দর্শনে অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য হয়। পুরীতে কপোতেশ্বর ও লোকনাথ শিবও আছেন। এই সব শিব প্রতিষ্ঠারও গল্প আছে।

সদর রাস্তার উপরে জগন্নাথ বল্লভ একটি প্রশস্ত উদ্যানের মধ্যে মঠ। নিকটে নরেন্দ্র সরোবর স্বচ্ছ জলের বিরাট পুষ্করিণী। এরই ধার দিয়ে বাঁধানো রাস্তায় আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সমাধি মন্দিরে যেতে হয়। আর একটু এগিয়ে কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর সমাধি আশ্রম একটি নিরিবিলি নির্জন স্থান। এখান থেকে গ্রাম্য পথে আঠারো নালা যেতে হয়। শহর ছাড়িয়ে একটি মনোরম স্থান। সবাই একে নালা বলে না, বলে ভাগীরথী নদী। অনেক দিন আগে সমুদ্রের সঙ্গে যোগ ছিল। আজও তাই বারো বছর পর পর সমুদ্রের পূজা হয়। কিংবদন্তী আছে যে দেশের কল্যাণের জন্য রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁর আঠারোটি ছেলেকে এখানে বলি দিয়েছিলেন। এরই কাছে লক্ষ্মীজলায় বারোমাস ধান হয়।

মন্দিরের সামনে থেকে যে বড় রাস্তাটা সোজা এগিয়ে গেছে, তারই শেষ প্রান্তে গুণ্ডিচা বাড়ি। দূরত্ব প্রায় দু মাইল হবে। এই তীর্থের সঙ্গে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের নাম ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। গুণ্ডিচা নাকি তাঁর পাটরাণীর নাম। এই নামেই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু মন্দির খুব পুরনো মনে হয় না। বাহির থেকে উঁচু প্রাচীর দেখে জেলখানার মতো মনে হয়। রথযাত্রার সময় জগন্নাথদেবের দারুমূর্তি সিংহদ্বার দিয়ে ভিতরে আনা হয়, আর বাহির করা হয় বিজয়দ্বার দিয়ে। বিশ্বকর্মা নাকি এই গুণ্ডিচা বাড়িতেই দারুব্রহ্মের ওঙ্কার মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর বেশি দূরে নয়। মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যজ্ঞের দক্ষিণায় অসংখ্য গাভী দান করেছিলেন। সেই সব গরুর ক্ষুরে গর্ত ও উৎসর্গের জলে জলাশয় হয়েছে। এই সরোবরে স্নান ও তর্পণ করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়। পাথর দিয়ে বাঁধানো এই সরোবরটি ছোট নয়, কিন্তু অসংখ্য কচ্ছপ দেখে জলে নামতে ভয় হয়।

ফেরার পথে চক্রতীর্থ ও সোনার গৌরাঙ্গ। সমুদ্রের ধারে একটি ছোট

জলাশয়, তারই নাম চক্রতীর্থ। শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেছিলেন প্রভাসতীর্থে। যে গাছটির উপরে দেহত্যাগ করেছিলেন, একদিন সেই গাছটিই ভেসে এসে চক্রতীর্থে ঠেকেছিল। দারুব্রহ্মের আবির্ভাব হয়েছিল এইখানে। চক্র নারায়ণ দেখে সোনার গৌরাঙ্গ দেখতে হয়। একটি ছোট মন্দিরের মধ্যে গৌরাঙ্গের সোনার মূর্তি। পুরীর তীর্থ শেষ হয়েছে এইখানে। সমুদ্রের ধারে স্বর্গদ্বারের নিকটে একটি নূতন মন্দির স্থাপিত হয়েছে। তার মধ্যে আছেন শঙ্করাচার্য, কৃষ্ণচৈতন্য ও জয়দেব পদ্মাবতী।

সাক্ষীগোপাল

সাক্ষীগোপাল নামে আর একটি তীর্থ আছে পুরী থেকে ১২ মাইল উত্তরে। এই সব তীর্থস্থান দেখবার ব্যবস্থা ভাল। সকালবেলায় ভুবনেশ্বর ও কোণারকের টুরিস্ট বাস ছাড়ে, সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসে পুরী। এই বাসে উঠলে সাক্ষীগোপালও দেখা যায়। সাক্ষীগোপাল নামে একটি রেল স্টেশনও আছে, মন্দিরের দূরত্ব আধ মাইলেরও কম। বাজারের রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখানেই মন্দির। সামনে অরুণ স্তম্ভ ও পাশে একটি ছোট পুকুর। বৃন্দাবন থেকে কৃষ্ণ এক ভক্তের জন্য পুরীর রাজার কাছে সাক্ষী দিতে এসেছিলেন। এক যুবক রাজার কাছে আবেদন করেছিল যে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বৃন্দাবনে মরণাপন্ন হয়েছিলেন। শুশ্রূষা করে সে তাঁকে বাঁচিয়ে তুললে ব্রাহ্মণ প্রতিদানে তাঁর কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে ব্রাহ্মণেতর বলে সমাজের চাপে এই প্রতিজ্ঞার কথা অস্বীকার করছেন। রাজা তাই বিচারের জন্য একজন সাক্ষী চেয়েছিলেন। বৃন্দাবনের ঘটনা। তাই অন্তর্যামী কৃষ্ণই একমাত্র সাক্ষী ভেবে সেই যুবক কৃষ্ণকে আনছিলেন পুরীতে। শর্ত ছিল যে যুবক পিছন ফিরে তাকাবে না, আর কৃষ্ণ নূপুর পায়ে বাঁশি বাজিয়ে আসবেন পিছনে। এক সময়ে কৃষ্ণের পা মাটিতে আটকে যেতে তিনি আর এগোতে পারলেন না। যুবক অনেকটা এগিয়ে গিয়ে তাঁর নূপুরের ধ্বনি আর বাঁশির সুর

শুনতে না পেয়ে পিছন ফিরে তাকাল। শর্ত ভঙ্গ হল কৃষ্ণ রয়ে গেলেন এই গ্রামে। তাঁর নাম হল সাক্ষী গোপাল।

কোণারক

পুরী থেকে ভুবনেশ্বরে যাবার পথে কতকটা মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত পিপ্‌লি থেকে কোণারকের পথ বেরিয়েছে। ৫৩ মাইল পথ পুরী থেকে, ভুবনেশ্বর থেকেও দূরত্ব প্রায় এই রকম। একদা একটি সূর্যের মন্দির ছিল। কিন্তু দেউল ভেঙ্গে পড়েছে। গর্ভগৃহে দেবতা নেই। পরিত্যক্ত মন্দির। কিন্তু শিল্প সৌন্দর্যে অতুলনীয় বলে এর আকর্ষণ অব্যাহত আছে। এখানে একটি নবগ্রহের মন্দির আছে। যাত্রীরা সেখানে পূজা দেন।

যাজপুর

হাওড়া-ম্যাড্রাস লাইনে যাজপুর রোড স্টেশন থেকে ১৮ মাইল দূরে যাজপুর একটি তীর্থস্থান। বিরজার মন্দিরের জন্য বিরজা ক্ষেত্র বলে। কথিত আছে যে দেবতাদের যজ্ঞের জন্য গয়াসুর যখন তাঁর দেহদান করেছিলেন, তখন সেই বিরাট দেহের নাভি ছিল এইখানে। সেইজন্য যাজপুরকে নাভি গয়াও বলা হয়। ৫০০ থেকে ৯৫০ সাল পর্যন্ত যাজপুর উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। রাজা যযাতি কেশরী এই রাজধানী স্থাপন করে বৈতরিণীর তীরে দশাশ্বমেধ ঘাটে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন।

দক্ষিণাঞ্চল

অন্ধ্রপ্রদেশ

আরসাবল্লী

উড়িষ্যা রাজ্যের সীমান্তে অন্ধ্রপ্রদেশে দক্ষিণাঞ্চলের বহু তীর্থস্থান অবস্থিত। হাওড়া থেকে ম্যাড্রাসের পথে ৪৬৬ মাইল দূরে শ্রীকাকুলম রোড স্টেশনে নেমে দুটি তীর্থস্থান দেখা সম্ভব। রেলওয়ে স্টেশন থেকে ৮ মাইল দূরে শ্রীকাকুলম শহরেব নিকটে আরসাবল্লীতে সূর্যের একটি মন্দির আছে। দেবরাজ ইন্দ্র এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন বলে কিংবদন্তী। ১৭৭৮ সালে এই মন্দিরটি পুনরায় নির্মাণ করেছিলেন পাস্তলু নামে এক ব্যক্তি। সূর্যের মূর্তিটি বড় সুন্দর। কালো কষ্টি পাথরের দণ্ডায়মান মূর্তি, তাঁর দুহাতে দুটি পদ্ম, মাথার উপরে আদিশেষের ফণা ছত্রের মতো বিস্তৃত। অন্য দিকে তাঁর তিন পত্নী—উষা পদ্মিনী ও ছায়া। পুরাণে সূর্যের পত্নীর নাম সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞা ছায়াকে সূর্যের সেবায় নিযুক্ত করে তপস্যা করতে যান। মনে হয়, এই সব নামের একটা ব্যাখ্যা সম্ভব। সূর্যই মানুষের জ্ঞান বা চেতনার উৎস বলে সংজ্ঞাকে সূর্যের স্ত্রীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। তিনি উষাকে অনুসরণ করেন এবং পদ্মিনী প্রস্ফুটিত হয় সূর্যালোকে। আর ছায়া তো সূর্যেরই সঙ্গী। এই কারণেই বোধহয় তিনজনকেই সূর্যের স্ত্রীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। সূর্যের দুই দ্বারপাল হলেন দণ্ড ও পিঙ্গল এবং চামর হাতে দাঁড়িয়ে আছেন সনক ও সনন্দ ঋষি। ভবিষ্যপুরাণে আছে যে অসুররা যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সূর্য তাঁর প্রচণ্ড তেজে তাদের দগ্ধ করতে আরম্ভ করেন। অসুররা সূর্যকে আক্রমণ করলে নিগৃহীত দেবতারা আসেন সূর্যের সাহায্যে। অগ্নি দাঁড়ালেন সূর্যের ডান দিকে, আর বামে দাঁড়ালেন

দেব সেনাপতি স্কন্দ। স্কন্দ হলেন দণ্ড নায়ক, দুষ্টকে দমন করেন তিনি। আর পিঙ্গলবর্ণ অগ্নিই পিঙ্গল নামে পরিচিত।

আরসাবল্লীর মন্দিরের গোপুর একটি দোতলা বাড়ির মতো। মাঝখান দিয়ে ভিতরে যাবার পথ। ছাদের উপরে সামান্য কারুকার্য। স্থল পুরাণে এই মন্দির প্রতিষ্ঠার একটি কাহিনী আছে। দেবরাজ ইন্দ্র অসময়ে এসেছিলেন কোটীশ্বরের মন্দিরে। জোর করে মন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা করতেই দ্বাররক্ষী নন্দী তাঁকে এক লাথি মারেন। অজ্ঞান হয়ে ইন্দ্র ছিটকে পড়লেন মাইল দুয়েক দূরে। অজ্ঞান অবস্থাতেই তিনি সূর্যকে দেখতে পেলেন নিজের অন্তরাত্মায়। সূর্য তাঁকে বললেন যে এক মন্দির নির্মাণ করে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করলে সকল যন্ত্রণার অবসান হবে। জ্ঞান হবার পর ইন্দ্র তাই করলেন। এই আরসাবল্লীতেই ইন্দ্র ছিটকে পড়েছিলেন। এইখানেই তিনি সূর্যের প্রতিষ্ঠা করে নিজের যন্ত্রণামুক্ত হয়েছিলেন।

দেবতা এখানে খুব জাগ্রত। বহু যাত্রী আসেন নানা রকমের প্রার্থনা নিয়ে। কুষ্ঠরোগী আসে, আসে বন্ধ্যা নারী। অনেক অলৌকিক কাহিনী এখানে প্রচলিত আছে। গোদাবরী জেলার বছর কুড়ি বয়সের একটি ছেলের সারা গায়ে কুষ্ঠ হয়েছিল। কাশীতে মরবে বলে সে কাশী গিয়েছিল। সেখানে এক সাধু তাকে এই আরসাবল্লীতে চল্লিশ দিন ধর্মাচরণ করতে বলেন। সে এখানে এসে পুকুরে স্নান করে রোজ একশো আটবার মন্দির প্রদক্ষিণ করত। ত্রিশ দিন পরে সে ভাল হতে আরম্ভ করে। আর চল্লিশ দিনে সম্পূর্ণ সেরে যায়। ছেলেটি এখন বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। কিন্তু প্রতি বছর বৈশাখ মাসে সপরিবারে এসে সূর্যের পূজা করে যায়। এ কতকটা পুরাণের গল্পের মতো। কৃষ্ণের পুত্র শাম্বেরও কুষ্ঠ রোগ হয়েছিল এবং সূর্যের উপাসনা করেই নিরাময় হয়।

শ্রীকূর্মম

আরসাবল্লী থেকে ১২ মাইল পূর্বে শ্রীকূর্মম একটি বৈষ্ণব তীর্থ। শ্রীকাকুলম থেকে বাস যাতায়াত করে। এখানে কূর্মাবতারের মূর্তি। বিষ্ণুর

কূর্ম মূর্তি এ দেশের আর কোথাও নেই। মন্দিরের স্থাপত্য কলা ভাল। শিলালিপি থেকে কলিঙ্গের গঙ্গা রাজাদের কথা জানা যায়।

দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনের সময় বিষ্ণু কূর্ম রূপ গ্রহণ করে সমুদ্রে মন্দর পর্বতকে ধারণ করেছিলেন। শ্রীকূর্মমে বিষ্ণু কূর্মনাথ নামে পূজিত হচ্ছেন। স্থল পুরাণে এই মন্দির প্রতিষ্ঠারও একটি কাহিনী আছে। সুত ছিলেন শ্বেতাচলের রাজা। তাঁর রাণী ছিলেন ধর্মপ্রাণ, ব্রত পূজা নিয়ে তিনি দিন কাটাতেন। এক শুদ্ধ একাদশীর দিনে রাজা এসেছিলেন রাণীর কাছে, রাণীর সেদিন ব্রত পালনের দিন। রাজাকে দেখে রাণী চোখ বুজলেন, মনে মনে হরির কাছে প্রার্থনা করলেন যে তাঁর ব্রত ভঙ্গ যেন না হয়। অন্তর্যামী হরি তাঁর কথা শুনলেন। দুজনের মাঝখানে বয়ে গেল গঙ্গা তীর্থ। রাণী এপারে রইলেন, আর রাজা রইলেন ওপারে। তারপর একদিন দেবর্ষি নারদ এলেন রাজার কাছে। দেখলেন যে বংশধরা নদীর ধারেই রাজা কালাতিপাত করছেন। তিনি রাজাকে বললেন যে ঠিক মতো তপস্যা করলেই হরির দেখা পাওয়া যাবে। এই কথা শুনে রাজা নারদের সঙ্গে চললেন সমুদ্র সঙ্গমে। সেখানেই তাঁর কাছে সূর্যমন্ত্র পেয়ে কঠিন তপস্যায় রত হলেন। যথাসময়ে হরি দেখা দিলেন কূর্ম অবতার রূপে, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হাতে। তারপরে তাঁর দেশের দিকে অগ্রসর হলেন। এক জায়গায় একটি পবিত্র স্থান দেখে বিষ্ণু তাঁর চক্রে ক্ষীর সমুদ্র নামে একটি সরোবর খনন করলেন। নিজেও অধিষ্ঠান হলেন সেইখানে। এই স্থানই শ্রীকূর্মম নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

এখানেও অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। স্বর্গের অপ্সরা তিলোত্তমা আসতেন শ্রীকূর্মনাথের সামনে নাচতে। একদিন আনন্দপুরীর রাজকুমার মৃগয়ায় এসে এক সোনার হরিনের পিছনে ছুটতে ছুটতে এইখানে এসে তিলোত্তমার নাচ দেখতে পেলেন। হরিণের কথা ভুলে গিয়ে মুগ্ধ হলেন অপ্সরার রূপে। কিন্তু নিজের মনের কথা জানিয়ে বিপদ হল, তিলোত্তমা শাপ দিলেন রাজকুমারকে। দেবতার দাসী তিনি, তাঁর ওপর মানুষের লোভ কেন হবে। শাপগ্রস্ত রাজকুমার আর নিজের রাজ্যে

ফিরলেন না, রয়ে গেলেন সেইখানেই। দেবতার মন্দিরে দীর্ঘ দিন তপস্যা করে শাপ মুক্ত হলেন।

ওয়ালটেয়ারে যাবার পথে ট্রেন থেকে নেমে একদিনেই আরসাবল্লী ও শ্রীকূর্মম দেখে যাওয়া সম্ভব। আর ওয়ালটেয়ারে নেমে সীমাচলম দেখাই সুবিধাজনক।

সীমাচলম

ওয়ালটেয়ার থেকে ১০ মাইল পূর্বে সীমাচলম বরাহ অবতারের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। এই নামের একটি রেলওয়ে স্টেশনও আছে। সেখান থেকে ৩ মাইল দূরে পাহাড়ের উপরে এই মন্দির। ওয়ালটেয়ার থেকে নিয়মিত বাস যাতায়াত করে। এই বাস আসে পাহাড়ের নিচে গ্রাম পর্যন্ত। মন্দির কমিটির বাসে পাহাড়ে উঠতে হয়। ৮০০ ফুট উঁচু পাহাড়। এক হাজার সিঁড়ি ভেঙেও মন্দিরে পৌঁছনো যায়। এই পথটি সুন্দর ছায়াচ্ছন্ন। দুশো বছর আগে অহল্যাবাঈ এই সিঁড়ি নির্মাণ করিয়েছিলেন।

কিংবদন্তী আছে যে অসুর রাজ হিরণ্যকশিপু তাঁর পুত্র প্রহ্লাদকে সমুদ্রে ফেলে এই পাহাড় চাপা দেবার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু বিষ্ণুর কৃপায় তাঁর মৃত্যু হয় নি বলে প্রহ্লাদ এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন পাহাড়ের উপরে। কালক্রমে মন্দিরটি নষ্ট হয়ে যায় এবং পৌরাণিক রাজা পুরুরবা ও তাঁর রাণী উর্বশী এক অক্ষয় তৃতীয়ায় এই মন্দির পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন। দেবতাকে তাই এখানে অক্ষয় তৃতীয়ায় নিজস্ব রূপে দেখতে পাওয়া যায়। লক্ষ যাত্রী সেদিন দেবতাকে দেখতে আসেন। তাঁর নাম শ্রীবরাহ লক্ষ্মী নরসিংহ স্বামী। সিংহাসনের উপরে সেদিন তাঁর নিরাবরণ রূপ—বরাহ অবতারে বিষ্ণু বক্র ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। চতুর্ভুজ নন, মানুষের মতো দুটি হাত, কিন্তু মুখ বরাহের। গায়ে কোন আবরণ নেই, মুখে নেই চন্দনের প্রলেপ। প্রহ্লাদ এখানে তাঁর রক্ষাকর্তাকে বরাহ রূপে দেখেছিলেন বলেই এখানে বরাহ রূপের পূজা।

এই পাহাড়ের নাম সিংহাচলম বা সিংহ গিরি। নৃসিংহের নামেই

বোধহয় এই নাম হয়েছে। পাহাড়ের নিচে গ্রামের মতো শহর। দোকান-পাট পোষ্ট অফিস সবই আছে। ফলমূল মিষ্টান্ন ও পূজার উপকরণ নিচে সংগ্রহ করে উপরে উঠতে হয়। উপরেও দোকান পাট আছে ও নানারকম জিনিষ বিক্রি হয়। বাস এসে মন্দিরের কাছাকাছি দাঁড়ায়। গঙ্গাধারা নামে একটি ঝর্ণা আছে নিকটে। সেখানে স্নান করে যাত্রীরা মন্দিরে আসে। পুরুষদের অনেকে স্নানের আগে মাথা মুড়িয়ে নেয়।

এখানে কোন গোপুর নেই। একটি অপ্রশস্ত সিংহদ্বার দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে হয়। সামনে সোনার তালগাছ, পিছনে নাটমন্দির। চারিদিকের প্রাচীরের গায়ে গ্র্যানাইট পাথরের সুদৃশ্য বারান্দা। মন্দিরের চত্বরও পাথরে বাঁধানো। তিন দিকেই উঁচু পাহাড়, তারই কোলে মন্দির। অপরূপ কারুকার্যে মণ্ডিত এই মন্দিরের শিখর। সারা গায়ে কারুকার্য, সমস্তই পৌরাণিক চিত্র। মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশের পথ সামনের দিক থেকে। একটি মাত্র দরজা। ব্রাহ্মণেরা দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন, কাছে যাবার উপায় নেই। দূর থেকেই দর্শনের রীতি। যাত্রীদের পূজার উপকরণ ব্রাহ্মণেরাই উৎসর্গ করে ফিরিয়ে দেন।

মূল মন্দিরকে এখানে মুখ্য মণ্ডপ বলে। তার সামনে ষোলটি স্তম্ভের নাট্যমণ্ডপ। মন্দির গাত্রে নানা রকমের কারুকার্য আছে—ফুল লতাপাতা মূর্তি ও বিষ্ণু পুরাণের নানা দৃশ্য। মুসলমান আক্রমণে অনেক কিছু ধ্বংস হয়েছে, আছেও অনেক কিছু। প্রবাদ আছে যে দেবতা এক ঝাঁক মৌমাছি সৃষ্টি করেছিলেন মন্দির রক্ষার জন্য। সেই মৌমাছির দল মুসলমানদের তাড়া করে অনেক দূর তাড়িয়ে দিয়ে এসেছিল। প্রাঙ্গণের এক ধারে একটি পাথরের রথ আছে, তার দুটি ঘোড়া। প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে কল্যাণ মণ্ডপ। এক এক দিকে তিনটি করে ছ সারির স্তম্ভের উপরে মণ্ডপ, প্রতিটি স্তম্ভই কারুকার্য মণ্ডিত। চৈত্র মাসের শুক্লা একাদশীতে এখানে দেবতার বিবাহ উৎসব করা হয়। বরুণ ধন্বন্তরি এবং বিষ্ণুর মৎস্য ও নৃসিংহ অবতারের অনেক মূর্তি আছে।

মন্দিরের একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে গঙ্গা বংশের রাজা

প্রথম নরসিংহ এই মন্দিরের মূল অংশ মুখ্য মণ্ডপ নাট মণ্ডপ এবং চারিদিকের প্রাচীর নির্মাণ করেন ১২৬৭-৬৮ সালে। আর একটি শিলালিপির একাংশ থেকে একাদশ শতাব্দে এই মন্দিরের মাহাত্ম্য জানা যায়। ১০৯৯ সালে কলিঙ্গ জয়ের পরে কোলরাজা কুলোত্তুঙ্গ এই শিলা স্থাপন করেন। বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়ও এই রাজ্য জয়ের পরে একটি জয় স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন।

যাত্রীদের রাত্রিবাসের জন্য পাহাড়ের নিচে চৌল্টি বা ধর্মশালা আছে। ওয়ালটেয়ার শহরেও চৌল্টি ও হোটেলের অভাব নেই।

আন্নাভরম

ওয়ালটেয়ার থেকে ৭১ মাইল দূরে রত্নগিরি পাহাড়ের উপরে আন্নাভরম সত্যনারায়ণের একটি মন্দিরের জন্য পরিচিত। স্টেশন থেকে এই পাহাড় ২ মাইল দূরে।

পিঠাপুরম

আরও ১৬ মাইল এগিয়ে পিঠাপুরম একটি তীর্থ স্থান। গয়াসুরের দেহদানের সময় তার পা এখানে পড়েছিল বলে এই স্থান পাদ গয়া নামে পরিচিত। শিবরাত্রির সময় কুক্কুটেশ্বর শিবের মন্দিরে বহু যাত্রী সমাগম হয়।

গোদাবরী

রাজমন্ত্রীর সন্নিকটে গোদাবরী নদীর তীরে গোদাবরী মার্কণ্ডেয়ও কোটি লিঙ্গেশ্বর শিবের মন্দিরের জন্য তীর্থ রূপে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতে গোদাবরী নদী গঙ্গার মতো পবিত্র। বারো বছর পর পর এখানে পুষ্করম উৎসব হয়।

কোটি পল্লী

গোদাবরী যেখানে সমুদ্রে পড়েছে তারই নিকটে কোটিপল্লী। কেউ রাজমন্ত্রী থেকে যান, কেউ যান কাকিনাড়া থেকে। শিবরাত্রির দিনই

সবচেয়ে বেশি যাত্রী সেখানে যান। সোমেশ্বর স্বামী শিব, পার্বতীর নাম রাজরাজেশ্বরী অম্বাভরু। অতি প্রাচীনকালেও কোটি তীর্থ নামে এই স্থানের প্রসিদ্ধি ছিল। গোদাবরী ও কোটি তীর্থের মাহাত্ম্য নিয়ে অনেক অলৌকিক কাহিনী আজও প্রচলিত আছে। দেবরাজ ইন্দ্র এই তীর্থে শাপ মুক্ত হয়েছেন এবং কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত অনেক মানুষও নিরাময় হয়েছে। কোটি পল্লী নাম হয়েছে ফল্গ বা ফলি শব্দ থেকে। একটি পুণ্যের এখানে এক কোটি ফল পাওয়া যায় বলে তীর্থের নাম হয়েছে কোটি ফলি বা কোটি পল্লী।

দ্রাক্ষারাম

দ্রাক্ষারাম শব্দেরও এমনি একটি মানে আছে। দ্রাক্ষা মানে আঙুর নয়। দক্ষের আরাম বা বাগান। পুরাকালে এইখানেই দক্ষ প্রজাপতির বাগান ছিল বলে দক্ষ তপোবন বা দক্ষ বাটিকা বলত। দক্ষিণ ভারতের অনেকেরই বিশ্বাস যে দ্রাক্ষারামেই দক্ষ যজ্ঞ করেছিলেন, তাই তাঁরা সেখানে যজ্ঞ পণ্ড হবার ভয়ে কোন যজ্ঞ করেন না। দ্রাক্ষারামকে দক্ষিণ কাশীও বলে অনেকে। ভীমেশ্বর স্বামীর যে মন্দিরের জন্য দ্রাক্ষারাম এখন বিখ্যাত, অনেকের বিশ্বাস যে বেদব্যাস স্বয়ং সেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে সূর্য নিজে শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী প্রচলিত আছে। শিব এখানে স্বয়ম্ভু, লিঙ্গমূর্তিতে ভীমেশ্বর নামে প্রকাশিত হন। সপ্ত শাখায় বিভক্ত হয়ে গোদাবরী সমুদ্রে পড়েছে। সপ্ত গোদাবরীতে সপ্ত ঋষির বাস —কশ্যপ অত্রি গৌতম ভরদ্বাজ বিশ্বামিত্র জমদগ্নি ও বশিষ্ঠ। সপ্ত গোদাবরীর জলে শিবের অভিষেক করবেন বলে ঋষিরা স্থির করলেন এবং জল আনতে গেলেন। ফেরার পথে তাঁরা তুল্য ঋষির দেখা পেলেন। তিনি তাঁর আশ্রমে কাজ করছিলেন, বললেন যে সপ্ত গোদাবরীর জলে তাঁর আশ্রম ভেসে যাবে ও যজ্ঞ নষ্ট হবে। সেই জন্য তিনি সপ্ত ঋষিকে বাধা দিলেন। এই সময়ে বেদব্যাস এসে উপস্থিত। তিনি বললেন যে

কোন ভয় নেই, দ্রাক্ষারামে সপ্ত গোদাবরী অন্তর্বাহিনী হয়ে আসবেন, মাটির নিচে দিয়ে হবেন প্রবাহিত। এই কথায় বিবাদ মিটল। সপ্ত গোদাবরী হলেন পুষ্করিণী। কিন্তু ঋষিরা সূর্যোদয়ের পূর্বে পৌঁছতে পারলেন না দেখে সূর্য নিজেই প্রথম অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন।

এই লিঙ্গমূর্তি সম্বন্ধে আরও একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। সূর্য যে লিঙ্গটি প্রতিষ্ঠা করেন তা অতি বৃহৎ ছিল। সপ্ত ঋষি তাঁর পূজা করতেন। একদা এই লিঙ্গটি ভেঙ্গে পাঁচটি টুকরো হয়ে পাঁচ জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এখন এই পাঁচটি জায়গাতেই শিবের পূজা হচ্ছে—ভীমাভরম পালকল্লু অমরাবতী কোটিপল্লী ও দ্রাক্ষারামে।

ভীমেশ্বর শিবের মন্দিরে তিনশো একাশিটি শিলালিপি আছে ১০৮০ থেকে ১৪৩৪ সালের। মন্দিরের স্থাপত্য চালুক্য ও চোলা শৈলীর সমন্বয়ে সুন্দর। দ্রাক্ষারামে আরও অনেক মন্দির আছে—শঙ্কর নারায়ণের মন্দির, লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দির, নবগ্রহ ও অষ্ট দিকপালের মন্দির।

ভদ্রাচলম

গোদাবরীর তীরে একটি বিখ্যাত তীর্থ স্থান ভদ্রাচলম। রাজমন্ত্রী স্টেশন থেকে ১০০ মাইল দূরে স্টিমারে মাইল চল্লিশেক পথ। ট্রেনে ওরঙ্গল থেকে ৮৮ মাইল দূরে ভদ্রাচলম রোড স্টেশনে নেমে বাসে ২০ মাইল দূরে বোরগম পাহাড়ে যেতে হয়। কথিত আছে যে সীতার অন্বেষণে কিষ্কিন্ধ্যা যাবার পথে রাম এইখানে গোদাবরী নদী পার হয়েছিলেন। অনেকে বলেন যে ভদ্র নামে এক ঋষি এখানে বাস করতেন। সীতাহরণের আগেই রাম তাঁর আশ্রমে কিছু দিন কাটিয়েছিলেন। ভদ্র ঋষির নামেই ভদ্রাচলম নাম। ছোট একটি পাহাড়ের উপরে রামের মন্দির। তার বিশাল গোপুরম্ অনেক দূর থেকে দেখা যায়। নদীর ধার থেকে গোটা চল্লিশেক ধাপ উঠে মন্দিরের প্রাঙ্গণ। মূল মন্দিরটির চারিদিক ঘিরে আছে আরও চল্লিশটি ছোট মন্দির। মন্দিরে বিগ্রহ রাম সীতা ও লক্ষ্মণ। ধনুর্বাণ হাতে চতুর্ভুজ রামের ত্রিভঙ্গ মূর্তি। পদ্ম হাতে সীতারও

ত্রিভঙ্গ মূর্তি। এমন সুন্দর মূর্তি সচরাচর চোখে পড়ে না। যাত্রীরা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

এই মন্দির প্রতিষ্ঠার একটি কাহিনী আছে। এই অঞ্চলের একজন স্ত্রীলোক স্বপ্ন দেখেছিল যে বিগ্রহ মূর্তিগুলি পাহাড়ের উপরে অযত্নে পড়ে আছে। পরদিন সে তার মেয়েকে নিয়ে পাহাড়ে উঠে মূর্তিগুলি দেখতে পায়। সে-ই প্রতিষ্ঠা করে মূর্তি। তারপরে যাত্রীরা আসতে থাকে। একবার কবীর নামে একজন মুসলমানও আসেন যাত্রীদের সঙ্গে। কিন্তু পুরোহিতরা তাঁকে বিগ্রহের সামনে যেতে দেয় না। কিন্তু অন্যান্য যাত্রীরা মন্দিরে গিয়ে দেখেন যে বিগ্রহ নেই। এই দৃশ্য যাঁরা দেখলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন গোলকুণ্ডার নবাবের একজন কর্মচারী। তাঁর নাম রামদাস। তিনি পুরোহিতদের বললেন যে জাত ধর্মের বিচার এখানে চলবে না। তাঁর কথা মতো কবীরকে নিকটে আসতে দিতেই বিগ্রহ আবার দেখা গেল।

রামদাস এই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। নবাবের টাকা গোলকুণ্ডায় না পাঠিয়ে সেই টাকায় এখানে মন্দির তৈরি করে দিলেন। তারপর ধরা পড়ে তাঁর জেল হয়ে গেল। কিন্তু কী আশ্চর্য! রামদাসকে জেল খাটতে হল না। রামদাসের মূর্তি ধরে একজন এলেন নবাবের কাছে, ফিরিয়ে দিলেন তাঁর টাকা। রামদাস মুক্তি পেয়ে গেলেন। ভক্তের ভগবান নিজে এসে টাকা ফেরৎ দিয়ে গেলেন।

আজ এ গল্প সকলের বিশ্বাস হবে না। কিন্তু শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে সেই থেকে এই মন্দিরের জন্য হায়দ্রাবাদের রাজকোষ থেকে প্রতি বছর কুড়ি হাজার টাকা আসত। মুসলমান নিজাম হিন্দু মন্দিরের খরচ বহন করতেন।

বিজয়ওয়াড়া

বিজয়ওয়াড়া তীর্থস্থান না হলেও যাঁরা মঙ্গলগিরি বা অমরাবতী যাবেন, তাঁরা এই জংশন স্টেশনে নেমে কনক দুর্গার মন্দির দেখবেন। কৃষ্ণা নদীর তীরে এই প্রাচীন শহরে ইন্দ্রকিল পাহাড়ের উপরে মন্দির। উপরে

উঠবার জন্য পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে সিঁড়ি হয়েছে, যানবাহনের জন্যও পথ আছে। এখানকার লোকে বিশ্বাস করেন যে শিবের কাছে পাশুপত অস্ত্র লাভের জন্য অর্জুন এইখানে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। অর্জুনকে ছলনা করবার জন্য পার্বতীর সঙ্গে শিব এসেছিলেন কিরাতের বেশে। একটা বুনো শুয়োর তাড়িয়ে এনেছিলেন অর্জুনের সামনে, আর একই সঙ্গে তীর ছুঁড়ে শুয়োরটাকে মেরেছিলেন। তারপর বিবাদ শুরু হয়েছিল দুজনে। কিরাত বললেন, শুয়োরটা আমি মেরেছি। আর অর্জুন বললেন, আমি। তারপর এই বিবাদ যুদ্ধে পরিণত হল। হেরে গিয়ে অর্জুন তাড়াতাড়ি একটি মাটির শিবলিঙ্গ তৈরি করে পুজো করলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! যে ফুল বেলপাতা তিনি শিবের মাথায় দিলেন তা পড়ল কিরাতের মাথায়। অর্জুন এই দৃশ্য দেখেই বুঝতে পারলেন যে শিব এসেছেন তাঁকে ছলনা করতে। তারপরেই সবিস্ময়ে দেখলেন যে কিরাত নয়, স্বয়ং শিব সহাস্যে দাঁড়িয়ে আছেন। অর্জুন তাঁকে প্রণাম করে পাশুপতাস্ত্র পেলেন, আর সেইখানেই প্রতিষ্ঠা করলেন বিজয়েশ্বর শিবের। ইন্দ্রকিল পাহাড়ের একটি গুহামন্দিরে কিরাতার্জুনের এই গল্প খোদাই করা আছে।

কনকদুর্গা মল্লেশ্বর ও বিজয়েশ্বর—এই তিনটি মন্দির নিয়ে বিজয়ওয়াডা। কনকদুর্গার প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায় না বলে লোকে স্বয়ম্ভু বলে। এই ইন্দ্রকিল পাহাড়ে যুধিষ্ঠির রামেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর অগস্ত্য ঋষি জয়সেন মহাদেবের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অনেকে বলেন যে নিজেদের মল্ল যুদ্ধের পর অর্জুন শিবের নাম দিয়েছিলেন মল্লেশ্বর। শিবালয় নামে আর একটি মন্দির আছে বাজারে।

মঙ্গলগিরি

গুন্টুর জংসনের পথে বিজয়ওয়াডা থেকে ৮ মাইল দূরে পূর্বঘাট পর্বতের উপরে মঙ্গলগিরি একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান। কৃষ্ণা নদীর পরপারে ন্যাশনাল হাইওয়ের ধারে অবস্থিত বলে বাসে যাতায়াত করা যায়। মঙ্গলগিরি পাহাড়ের আকার একটা হাতির মতো এবং হাতির মুখের কাছে

মন্দির। পাহাড়ের আকার হাতির মতো কেন হল, তা নিয়ে একটি গল্প আছে। এক রাজার ছেলের জন্ম হয়েছিল বিকৃত দেহ নিয়ে। সে বড় হয়ে নারায়ণের দয়ার জন্য তপস্যা শুরু করে। রাজা ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলেন, কিন্তু ছেলে দেবতাকে না পেয়ে ফিরে যেতে রাজী হল না। তাই সে একটা হাতির মতো পাহাড়ের আকার ধারণ করল। আর ভক্তের এই অনুরাগ দেখে নারায়ণ তার মুখে অধিষ্ঠান করলেন লক্ষ্মী নরসিংহস্বামী মূর্তিতে।

এখানে পাহাড়ের নিচেও একটি মন্দির ও গোপুরম আছে। এগারো তলা উঁচু গোপুরম। এমন ক্ষীণ দেহের উঁচু গোপুরম এ দেশের আর কোথাও নেই। মন্দিরে আছেন লক্ষ্মীনরসিংহস্বামী। কিন্তু উপরের মন্দিরের মতো তিনি জাগ্রত নন। উপরের দেবতা যাত্রীদের কাছে শুধু পানকা নামের শরবৎ খান—গুড়ের জল। আধখানা খেয়ে আধখানা দেন ফিরিয়ে। নিচের বাজার থেকে গুড় আর জলভরা কলসি নিয়ে উপরে উঠতে হয়। পাহাড়ের গায়ে প্রায় সাড়ে তিনশো সিঁড়ি আছে। ছোট একটি প্রাঙ্গণে লক্ষ্মী নরসিংহ স্বামীর মন্দির। আরও শ খানেক সিঁড়ি উপরে উঠলে মহালক্ষ্মীর মন্দির। এক কলসী জল আর গুড় নিয়ে পাহাড়ে উঠবার জন্য কুলি পাওয়া যায়। মন্দিরের ভিতরে একটা শিলপাটায় গুড়ের ডেলা ভেঙে শরবৎ তৈরি হয়। তারপর টিকিট কেটে গর্ভ মন্দিরে ঢুকতে হয়। দেবতা দরজার সামনে নন, ডানপাশের দেওয়ালে। তাঁর সোনার মুখ। নৃসিংহ অবতার। পূজারী ভোগ নিবেদন করেন। একটা উঁচু জায়গায় কলসী রেখে একটা শঙ্খে শরবৎ তুলে দেবতার মুখে কিছু ঢালেন, আর কিছু একটা পাত্রে। এমনি করে শঙ্খের পর শঙ্খ ভরে শরবৎ দেবতাকে খাওয়ান। শরবৎ মুখে ঢালবার সময় এমন একটা শব্দ হয় যে মনে হয় দেবতা বুঝি সত্যিই শরবৎ পান করছেন। অর্ধেক শরবৎ দেবতাকে খাওয়াবার পর পূজারী থামেন। কলসীর বাকি শরবৎটা ফিরিয়ে দেন যাত্রীকে। এরই নাম দেবতা অর্ধেক শরবৎ খেয়ে বাকিটা ফিরিয়ে দেন যাত্রীকে।

পাহাড় থেকে নামবার পথে এক জায়গায় থমকে দাঁড়াতে হয়। চৈতন্যদেবের পদচিহ্ন আছে একটি ছোট মন্দিরে। সাড়ে চারশো বছর আগে তিনি এই তীর্থে এসেছিলেন। পাহাড়ের নিচের মন্দিরটি মহাভারতের যুগের বলে লোকের বিশ্বাস।

অমরাবতী

বিজয়ওয়াডা থেকে অমরাবতী চল্লিশ মাইল দূরে। ট্রেনে গুণ্টুর এলে বাকি ১৬ মাইল পথ বাসে যাতায়াত করা যায়। কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরে এই জায়গাটি এক সময়ে অন্ধ্র রাজ্যের রাজধানী ছিল। প্রথম খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এই রাজধানী বৌদ্ধ ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। অমরাবতীর বিখ্যাত স্তূপ ছিল দেশের সবচেয়ে বড় স্তূপ। ১০০ ফুট উঁচু, আর ব্যাস ১৭২ ফুট। ১৫ ফুট প্রশস্ত প্রদক্ষিণ পথের ১৪ ফুট উঁচু রেলিঙ ছিল। বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলী উৎকীর্ণ ছিল এই রেলিঙে। সৌন্দর্যে সাঁচীর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত। এই স্তূপ এখন ভেঙে পড়েছে। পাশেই একটি ঘরে স্থাপত্য-শিল্পের কিছু নমুনা রাখা আছে।

অমরাবতী এখন একটি গ্রাম। কৃষ্ণা নদীর তীরে অমরেশ্বর শিবের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। প্রাকার দিয়ে ঘেরা মস্ত বড় প্রাঙ্গণের মধ্যে এই মন্দির। গোপুরম আছে। মন্দিরের শিখরও আছে। খুব উঁচু ভিতের উপরে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মূল মন্দিরের সংলগ্ন নাটমণ্ডপ। এই মণ্ডপে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণা নদী দেখা যায়, শ্রান্তি দূর হয় শীতল বাতাসে। স্থল পুরাণের মতে এই মন্দির খুব প্রাচীন। কলিযুগের প্রারম্ভে সৌনকাদি ঋষি দেবর্ষি নারদের কাছে মুক্তির উপায় জানতে চেয়েছিলেন। নারদ তাঁদের এইখানে বাস করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কৃষ্ণায় স্নান করে অমরেশ্বরের অর্চনাতেই তাঁদের মুক্তি হবে। এই শিব প্রতিষ্ঠার গল্পও আছে স্থলপুরাণে। শিবভক্ত অসুর তারক শিবের বরে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জয় করেছিল, দেবতারা কেঁদে বেড়াচ্ছিলেন। বিষ্ণু বললেন, কোন উপায় নেই, তারকাসুর অবধ্য। শিব বললেন, আমারও শক্তি নেই আমার ভক্তকে বধ করবার। শেষ পর্যন্ত

কুমারস্বামীকে সেনাপতি করে দেবতারা অগ্রসর হলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আবার ফিরে এলেন। শিব বললেন, তারকাস্থরের গলায় আমি বাঁধা আছি, ঐ শিবলিঙ্গটি না সরালে তার মৃত্যু নেই। কিন্তু শিবলিঙ্গ ভাঙলেই তা বাড়তে আরম্ভ করবে, তখনই তাকে প্রতিষ্ঠা করা দরকার। দেবতারা আবার অগ্রসর হলেন, কুমারস্বামী আবার আক্রমণ করলেন তারকাস্থরকে। বাণ মেরে প্রথমেই তিনি শিবলিঙ্গটি টুকরো টুকরো করে দিলেন। তারপরে বধ করলেন তারকাস্থরকে। শিবলিঙ্গের মূল অংশ পড়েছিল এইখানে। গুরু বৃহস্পতিকে নিয়ে ইন্দ্র ছুটে এসে-ছিলেন। দেখেছিলেন যে শিবলিঙ্গটি ক্রমেই বাড়ছে। তাড়াতাড়ি অভিষেক করে প্রতিষ্ঠা করতেই বৃদ্ধি বন্ধ হয়েছিল। সত্যিই, এখানকার শিবলিঙ্গ একটি স্তম্ভের মতো উঁচু। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে শিবের অভিষেক করতে হয়। লোকে বলে যে কৃষ্ণা হল গঙ্গার মতো পবিত্র এবং কৃষ্ণায় স্নান করে অমরেশ্বর শিবের দর্শনে কাশীর বিশ্বনাথ দর্শনের পুণ্য হয়।

দ্রাক্ষারামের প্রসঙ্গে জানা গিয়েছিল যে সূর্য যে বৃহৎ শিবলিঙ্গটি সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তারই এক পঞ্চমাংশ ভেঙে ছিটকে এসে পড়েছিল অমরাবতীতে।

চেজেরলা

গুণ্টুর জেলার নরসারাওপেট স্টেশন থেকে ৩৫ মাইল দূরে চেজেরলা পাহাড়ে ঘেরা একটি গ্রাম। এখানে তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর একটি মন্দির আছে। বাস্তু শাস্ত্রে এই অদ্ভুত গড়নের মন্দিরকে বলে হস্তি-প্রস্থ। মন্দিরটি কপোতেশ্বর শিবের। মহাভারতের শিবি রাজার গল্প এখানে প্রচলিত আছে। যযাতির পৌত্র ও মান্ধাতার পুত্র শিবি ছিলেন কাশ্মীরের রাজা। তাঁর দুই ভাই ছিল মেহডম্বর ও জীমূতবাহন। দীর্ঘ প্রব্রজ্যায় বেরিয়ে মেহডম্বর আর ফিরলেন না, তাঁর খোঁজ করতে বেরিয়ে জীমূতবাহনও রয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত শিবি রাজা নিজে বেরিয়ে পড়লেন। খুঁজতে খুঁজতে এই অঞ্চলে এসে দেখলেন যে তাঁর ভাই তপস্যায় লিঙ্গ শরীর লাভ

করেছে। তিনিও স্থির করলেন যে এই সুন্দর জায়গায় তিনি শত যজ্ঞ করবেন। শত যজ্ঞে ব্রহ্মলোক লাভ হয়। তাই দেবতারাও শিবির ধর্ম পরীক্ষার আয়োজন করলেন। নির্বিঘ্নে নিরানব্বইটি যজ্ঞ হয়ে গেল। তারপর শততম যজ্ঞটি আরম্ভ হতেই বিঘ্ন উপস্থিত। এক কপোত উড়ে এসে রাজাব কোলে পড়ল। রাজা দেখলেন যে একজন ব্যাধ এসেছে তীর ধনুক হাতে, ঐ কপোতটি বধ করে সে খাবে। ব্যাধ কপোতটি চাইল। রাজা বললেন, আশ্রিতকে ত্যাগ করতে পারি না। ব্যাধ বলল, পশু পাখি আমার খাদ্য। রাজা বললেন, শরণাগতকে রক্ষা করা রাজার ধর্ম। ব্যাধ বলল, আপনাব ধর্মে বাধা থাকলে উপযুক্ত ব্যবস্থা করুন। ধার্মিক রাজা বললেন, এর সম পরিমাণ মাংস আমি নিজের শরীর থেকে কেটে দিচ্ছি। কিন্তু কী আশ্চর্য! নিজের শরীরের আধখানা কেটে দিয়েও যে কপোতের সমান ওজন হচ্ছে না! তারপরেই দেবতারা রাজার সামনে আবির্ভূত হলেন। দেখা গেল যে কপোত হলেন বিষ্ণু আর ব্যাধ শিব, ব্যাধের হাতের তীর হলেন ব্রহ্মা। শিবিকে এঁরা বর দিলেন। তাঁর শরীরও লিঙ্গাকার হল। কপোতেশ্বর নামে তাঁরই পূজা হচ্ছে চেজেরলায়।

নরসারাওপেট স্টেশন থেকে কিছু দূর পর্যন্ত বাস যাতায়াত করে, তারপরে হাঁটতে হয়। বছরের কিছু সময় জীপ চলে। এখন হয়তো শেষ পর্যন্তই বাস যাতায়াত করছে। এই মন্দির এত প্রাচীন যে একে মন্দির বলে মনেই হবে না। মনে হবে যে মাটির উপরেই একটা বেয়াড়া আকারের গম্বুজ। মণ্ডপ নেই, থাম নেই, কোন কারুকার্যও নেই। লোকে তাই সন্দেহ করে যে পুরাকালে এটি হয়তো বৌদ্ধ চৈত্য ছিল।

মহানন্দী

বিজয়ওয়াড়া-গুণ্টাকল রেলপথে নাণ্ডিয়াল রেলওয়ে স্টেশন থেকে ১০ মাইল দূরে মহানন্দী। নাল্লামালাই পাহাড়ের পাদদেশে গভীর অরণ্যের মাঝখানে অবস্থিত এই তীর্থ। দক্ষিণ ভারতের এই পবিত্র নাল্লামালাই পাহাড় উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। চারটি বিখ্যাত তীর্থ আছে এই পাহাড়ে—

উত্তরে শ্রীশৈলমে মল্লিকার্জুন ও দক্ষিণে তিরুপতি। মাঝখানে মহানন্দী ও অহোবলম। তিরুপতি ও অহোবলম বৈষ্ণব তীর্থ, শ্রীশৈলম ও মহানন্দী শৈবতীর্থ।

মহানন্দী পাহাড়ের উপরে নয়। গাড়ি এসে পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়ায়। সেইখানেই মন্দির। মূল মন্দিরে আছেন শিব, আর শিবলিঙ্গের নিচে থেকে পাঁচটি জলের ধারা প্রবাহিত হয়ে সামনের সরোবরে পড়েছে। আশ্চর্য সুন্দর এই সরোবরটি, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল সারাক্ষণ টল টল করে। কিন্তু জল কবোষ্ণ। একটা বাঁধানো মুখ দিয়ে জল এসে সরোবরে পড়ছে দেখা যায়, কিন্তু এর উৎস কোথায় তা কেউ জানে না। সরোবরে জল পাঁচ ফুট গভীর। অতিরিক্ত জল কোথা দিয়ে বেরিয়ে যায়, তাও দেখতে পাওয়া যায় না। এই জলে স্নান করে নানা রোগ সারে। তাই নানা স্থান থেকে যাত্রী আসে এখানে স্নান করতে। সরোবরের মাঝখানে একটি ছোট মণ্ডপ আছে। আর মূল মন্দিরটি ঘিরে আছে আরও অনেক-গুলি মণ্ডপ। মন্দিরও আছে অনেকগুলি। দেবীর মন্দির মূল মন্দিরের পাশেই। পিছনে আরও তিনটি শিবের মন্দির আছে।

এই মন্দিরের স্থাপত্য লক্ষণীয়। মূল মন্দিরের বিমানটি উড়িষ্যার মন্দিরের মতো। দক্ষিণ ভারতের কোনখানে এমন উঁচু বিমানযুক্ত মন্দির নেই। এই বিমান ছাড়া আর সব কিছুই দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যের নিদর্শন। এমনকি একটি গোপুরমও আছে, কিন্তু সেটি মন্দিরের চেয়ে উঁচু নয়। এই সব দেখে অনেকে মনে করেন যে হিমালয় থেকে এক সিদ্ধ পুরুষ এসে এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তিনি নাকি মজুরদের কাজের মজুরি দিয়েছিলেন এক অদ্ভুত উপায়ে। মন্দির তৈরি হয়ে যাবার পরে তাদের একটা বালির পাহাড় গড়তে বলেছিলেন, আর মন্ত্রবলে সেই বালিকে সম্পদে পরিণত করেছিলেন।

মন্দিরের সামনে একটি নদী আছে। এই নদীর নামেই তীর্থের মহানন্দী নাম হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। এই অঞ্চলে আরও নটি নন্দীর মন্দির আছে। তাদের আলাদা আলাদা নাম—পদ্মনন্দী নাগনন্দী

বিনায়কনন্দী গরুড়নন্দী ব্রহ্মানন্দী সূর্যনন্দী বিষ্ণুনন্দী সোমনন্দী ও শিবনন্দী। ধার্মিক যাঁরা তাঁরা একদিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের মধ্যে এই সব নন্দীর দর্শন করে পূজা করে আসেন। একাদশ শতাব্দে এই অঞ্চলে নাকি নন্দ রাজারা রাজত্ব করতেন। তাঁদের কুলদেবতা ছিলেন নন্দী। এক একজন রাজা তাই এক একটি নন্দীর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মূল মন্দিরের নাম মহানন্দী, আর নন্দীর আলয় থেকে স্টেশনের নাম হয়েছে নন্দী আলয় বা নান্দিয়াল।

মহানন্দীর শিব স্বয়ম্ভু। এঁর আবিষ্কারের গল্প অন্যান্য স্বয়ম্ভু লিঙ্গের আবিষ্কারের মতোই। একজন নন্দরাজা দুধ দিয়ে দেবতার অভিষেক করবেন। তাই চারিধার থেকে অনেক গাভী আনা হল। এদের মধ্যেই ছিল একটি কালো গরু। রাজা নিজে সেই গরুর দুধ খেতেন। কিন্তু দেখা গেল যে দিন দিন সেই গরুর দুধ কমে যাচ্ছে। একদিন রাখাল সেই গরুকে অনুসরণ করে দেখে যে গরুটি একটা উই-এর ঢিবির উপরে এসে দাঁড়িয়েছে, আর দুধের ধারা ঝরে পড়ছে সেই ঢিবির উপরে। তারপর আরও আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। বালক মূর্তিতে প্রভু দেখা দিলেন গরুকে। রাখাল এই ঘটনা রাজার গোচরে আনল। আর রাজাও একদিন এই দৃশ্য দেখলেন। বিস্ময়ে ও পুলকে তাঁর পায়ের নিচে শুকনো পাতা মর্মরিয়ে উঠল। আর গরুটা চমকে একটা পা তুলে দিল উই-এর ঢিবির উপরে। গরুর সেই পায়ের ছাপ আজও মহানন্দীর শিবের মাথায় দেখতে পাওয়া যায়।

অহোবলম

নাণ্ডিয়াল রেল স্টেশন্ থেকে ৩০ মাইল দূরে অহোবলম নরসিংহের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। পাহাড়ের নিচে প্রহ্লাদবরদা নরসিংহের মন্দির এবং ৬ মাইল দূরে ২,৮০০ ফুট উঁচুতে নরসিংহের মূল মন্দির। মহানন্দীর নবনন্দীর মতো অহোবলমেও নৃসিংহের নবরূপ আছে। উগ্র বীর ভীষণ ভদ্র জ্বলন্ত এই সব রূপ। পাহাড়ের উপরে ও নিচে এই মন্দিরগুলি দেখতে

দশ মাইল হাঁটতে হয়। এই জায়গার নাম অহোবলম কেন হল, সে সম্বন্ধে একটা কাহিনী আছে। হিরণ্যকশিপু বধের সময়ে বিষ্ণুর সেই ভীষণ মূর্তি দেখে দেবতারা নাকি বলে উঠেছিলেন, নরসিংহ পরমং দেবং অহো বলং অহো বলং। এই কথা থেকেই তীর্থের নাম হয়েছে অহোবলম। একটা বিরাট স্তম্ভ দেখিয়ে বলা হয় যে হিরণ্যকশিপু সেই স্তম্ভটি ভেঙে-ছিলেন পদাঘাতে, আর একটি কুণ্ডের লাল্‌চে জল দেখিয়ে বলা হয় যে হিরণ্যকশিপুর রক্তে সেই জল লাল হয়েছে। অসুরকে বধ করবার পর নরসিংহ সেই কুণ্ডের জলে হাত ধুয়েছিলেন।

অহোবলমের একটি বড় উৎসবের নাম ব্রহ্মোৎসব। শিবরাত্রির এক পক্ষ পরে সেই উৎসব হয়। এই পাহাড়ে চেঞ্চু নামে এক আদিবাসী জাত আছে। তারা বলে যে লক্ষ্মী হলেন চেঞ্চেটা, মানে চেঞ্চুদের ঘরের কনে। বিষ্ণু নৃসিংহ অবতার হচ্ছেন শুনে লক্ষ্মী এই আদিবাসীদের ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন। ব্রহ্মোৎসব হল এঁদের বিবাহের উৎসব। দেবতার উৎসব মূর্তি আনা হয় কল্যাণ মণ্ডপে। স্থানীয় পদ্মশালীরা বসে লক্ষ্মীর পক্ষ নিয়ে। বিষ্ণুর সঙ্গে বিবাহের কথাবার্তা হবে। তারপর তাদেরই একজন বিবাহ দেবে। যে বারে যার নাম উঠবে, সে নিজেকে কৃতার্থ ভাববে।

এখানে বড় মঠ আছে বৈষ্ণবদের। সেখানে এই তীর্থের মাহাত্ম্য শুনতে পাওয়া যায়। মঙ্গল শ্লোক শুনে মনে হবে যে এর চেয়ে বড় তীর্থ আর নেই। বৈষ্ণব কবি তিরুমঙ্গাই আলোয়ার দশটি শ্লোকে দেবতার নাম গান করেছেন। মন্দিরে যে সোনার উৎসব মূর্তিটি আছে, তা দিয়েছিলেন কাকতীয় রাজা প্রতাপরুদ্র দেব। শ্রীশৈলম দর্শনের পর ফেরার পথে অহোবলম থেকে ১৬ মাইল দূরে রুদ্রভরমে কিছু দিন তিনি বিশ্রাম করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল যে একটি সোনার শিবলিঙ্গ গড়বেন। কিন্তু যতবার তা গড়বার চেষ্টা হয়, ততবারই দেখা যায় যে ছাঁচে নরসিংহের মূর্তি উঠছে। রাজা আশ্চর্য হয়েছিলেন এই ব্যাপার দেখে। শেষে ধ্যানে দেখলেন যে প্রভু তাঁর সামনে এসে বলছেন যে বিষ্ণু আর শিবে কোন প্রভেদ নেই। প্রভুর কথায় রাজা সেই সোনার মূর্তি অহোবলমে পাঠালেন।

এই মন্দিরে চালুক্য রাজা বিক্রমাদিত্য ও বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়ও এসেছিলেন। কলিঙ্গ বিজয়ের পর কৃষ্ণদেব রায় দেবতাকে একটি হীরের মালা ও একটি সোনার থালায় এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলেন।

আলমপুর

হায়দ্রাবাদ-ব্যাঙ্গালোর রেলপথে আলমপুর রোড স্টেশন থেকে ৬ মাইল দূরে আলমপুর কয়েকটি চালুক্য আমলের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে দু জায়গায় এই মন্দিরগুলি ব্রহ্মেশ্বর মন্দির ও পাপনাথ মন্দির নামে পরিচিত। মূল মন্দিবটি নব ব্রহ্মার মন্দির নামে নটি মন্দিরের সমষ্টি। তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণাব সঙ্গমের নিকটে সঙ্গমেশ্বরের মন্দির। তুঙ্গভদ্রার তীরে আব একটি মন্দির আছে বাল ব্রহ্মেশ্বরের। পশ্চিমের যাত্রীরা আলমপুরের মন্দির দেখে শ্রীশৈলম যাত্রা করেন।

লেপাক্ষী

হায়দ্রাবাদ-ব্যাঙ্গালোর রেলপথের হিন্দুপুর স্টেশন থেকে ১০ মাইল দূরে লেপাক্ষী একটি ছোট গ্রাম। এই গ্রামে বিজয়নগর শৈলীতে তৈরি ষোড়শ শতাব্দীব একটি সুন্দর মন্দির আছে। মন্দিরের দেওয়ালে ও ছাদে শিব ও তাঁর ভক্তদের অনেক সুন্দর চিত্র চিত্রিত আছে। কিংবদন্তী আছে যে পৌরাণিক যুগে অগস্ত্য এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান মন্দিরটি বিজয়নগর রাজার কোষাধ্যক্ষ বিরূপান্নার তৈরি। মুখোমুখি শিব ও বিষ্ণুর মন্দিরের মাঝখানে বীরভদ্রের মন্দির। নাটমণ্ডপ ও অর্ধমণ্ডপের কারুকার্য অপরূপ। কল্যাণ মণ্ডপটি অসম্পূর্ণ। দুশো গজ দূরে একটি বিশাল নন্দী আছে। উচ্চতায় কুড়ি ফুট ও তিরিশ ফুট লম্বা। এত বড় নন্দী ভারতের আর কোথাও নেই।

হিন্দুপুর থেকে লেপাক্ষীতে নিয়মিত বাস যাতায়াত করে ও রাত্রিবাসের জন্য দুজায়গাতেই ডাকবাংলো আছে।

টাডপত্রি

বম্বে-ম্যাড্রাস লাইনে গুণ্টাকল থেকে ৪৭ মাইল দূরে দুটি সুন্দর মন্দিরের জন্য টাডপত্রি বিখ্যাত। এই মন্দির দুটি ভেঙ্কটরমণ ও রাম লিঙ্গেশ্বর শিবের। ভেঙ্কটরমণ মন্দিরটি বিজয়নগরের প্রথম রাজা হরিহর ও বুক্কা রায়ের আমলে তৈরি। মন্দির গাত্রে রামায়ণ ও পুরাণের কাহিনী উৎকীর্ণ আছে এবং মন্দিরের সামনে একটি পাথরের রথ। পরবর্তী কালে রামলিঙ্গেশ্বর শিবের মন্দিরটি নির্মাণ করেন বিজয়নগরের রাজা প্রৌঢ় দেবরায়। এই মন্দিরটি পেন্নার নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ও সুন্দর কারুকার্যের জন্য পরিচিত। কিংবদন্তী আছে যে পরশুরাম এখানে বাস করতেন এবং এই শিবের পূজা করতেন।

রাত্রিবাসের জন্য এখানে পি. ডবলু. ডির ইন্স্পেক্সন বাংলো আছে।

শ্রীশৈলম

শ্রীশৈলম দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ শৈব তীর্থের অন্যতম। গুণ্টুর থেকে মার্কাপুর রোড বা নাণ্ডিয়াল হয়ে এবং হায়দ্রাবাদ থেকে কুর্ণুল হয়ে বাস যাতায়াত করে। নাগার্জুন সাগর থেকেও শ্রীশৈলমের বাস পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কাল থেকে পরিচিত এই তীর্থ নাল্লামালাই পর্বত শ্রেণীর ঋষভগিরি পাহাড়ে অবস্থিত। মহাভারতে এই তীর্থের নাম শ্রীপর্বত। এখানে মল্লিকার্জুন শিবের মন্দির। দেবী ভ্রমরম্বা। মল্লিকার্জুন দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। কৃষ্ণা নদী এখানে পাতাল গঙ্গা নামে প্রবাহিত। শঙ্করাচার্য এই তীর্থে এসেছিলেন এবং স্তোত্র রচনা করেছিলেন। ফা হিয়েন ও হিউএন চাঙের রচনায় শ্রীপর্বতের উল্লেখ আছে। সবচেয়ে পুরাতন শিলালিপিতে ওরঙ্গলের কাকতীয় রাজা প্রতাপরুদ্রের নাম পাওয়া যায়। বিজয়নগরের রাজারা এই মন্দিরের অনেক উন্নতি সাধন করেছিলেন।

আমাদের পীঠস্থানের তালিকায় শ্রীশৈলম বা শ্রীপর্বতের নাম আছে।

কিন্তু দেবতার নাম ভ্রমরম্বা ও মল্লিকার্জুন নয়। শ্রীশৈলম গ্রীবা পীঠ, দেবী মহালক্ষ্মী ও ভৈরব শম্বরানন্দ। মতান্তরে দেবীর নাম মাধবী। মহাভারতের বনপর্বে আছে যে শ্রীপর্বতের পবিত্র জলে স্নান করে দেব দর্শন করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। প্রচলিত একটি শ্লোকে আছে যে শ্রীশৈলের দেব দর্শন হলে পুনর্জন্ম আর হয় না।

প্রায় দেড় হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের একখণ্ড নিচু জমিতে এই মন্দিরটি উঁচু প্রাকারে বেষ্টিত। কৃষ্ণার তীর থেকে বাঁধানো ধাপ মন্দির পর্যন্ত উঠে গেছে। মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশের জন্য তিনটি গোপুর আছে তিন দিকে। আর প্রাঙ্গণের মধ্যে ছোট বড় মন্দির ও মণ্ডপ আছে অনেকগুলি। মাঝখানে মল্লিকার্জুনের মূল মন্দির, তার সামনে মুখ্য মণ্ডপ। পাঁচশো বছর আগে বিজয়নগরের রাজা দ্বিতীয় হরিহর এটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এই মণ্ডপের স্তম্ভগুলি দেখবার মতো সুন্দর, ততোধিক সুন্দর হল শিবের একটি নটরাজ মূর্তি। ব্রোঞ্জের তৈরি এই মূর্তি একটি অপরূপ শিল্পকর্ম।

উত্তর দিকে একটি বটগাছের নিচে ছোট একটি মন্দির আছে। সেটিও মল্লিকার্জুনের। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে ঐটেই হল আসল মন্দির। ঐ মন্দিরে যে শিবলিঙ্গ আছে, রাজকন্যা চন্দ্রাবতীর কালো গরু তারই উপরে দুধ দিত। সেই পুরাতন গল্প। কৃষ্ণার উত্তরে ছিল গুপ্ত রাজাদের চন্দ্রগুপ্ত পত্তন রাজ্য, চন্দ্রাবতী সেই রাজ্যের রাজকন্যা। ধর্মে তাঁর মতি ছিল অচঞ্চল। বড় হয়ে এই শ্রীশৈলে এসেছিলেন তপস্যার জন্যে। সঙ্গে ছিল এক পাল গরু ও রাখাল। কালো গরু দুধ দিচ্ছে না দেখে তাকে অনুসরণ করে স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গের সন্ধান মিলল। স্বপ্নে রাজকন্যা মল্লিকার্জুনের আদেশ পেলেন, আর সেই শিবলিঙ্গের উপরে নির্মাণ করলেন মন্দির। বটগাছের নিচের মন্দিরটিই সেই প্রাচীন মন্দির। মন্দিরের বাহিরের প্রাকারে রামায়ণ ও মহাভারতের নানা কাহিনীর সঙ্গে এই গল্পও উৎকীর্ণ আছে।

ভ্রমরম্বার মন্দিরকে সবাই আম্মন মন্দির বলে। এছাড়াও আছে নন্দীর মণ্ডপ বসন্ত মণ্ডপ বীরভদ্রের মন্দির ও সহস্রলিঙ্গ মন্দির।

এখানেও এই পাহাড়ের আদিবাসী চেঞ্চুদের নিয়ে গল্প আছে। এরা বলে যে শিব একবার এই পাহাড়ে এসেছিলেন মৃগয়ায় এবং এক চেঞ্চু নারীর প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করেছিলেন। মল্লিকার্জুনকে তাই তারা চেঞ্চু মল্লিকা বলে। মন্দিরে তাদের অবাধ গতি। রথের সময় তারা দড়ি টানে, আর শিবরাত্রিতে গর্ভগৃহে ঢুকে শিবের অর্চনা করে। এই মন্দিরে প্রবেশ করে পূজার্চনার অধিকার আছে সব হিন্দুর। এই স্বাধীনতা দক্ষিণ ভারতের আর কোন মন্দিরে নেই।

এখানে দেবস্থানমের একটি গেস্ট হাউস, কয়েকটি কুটীর ও চৌল্‌ট্রি আছে। শিবরাত্রির উৎসবই এখানে সবচেয়ে বড়।

কালাহস্তী

কলকাতা-ম্যাড্রাস লাইনের গুডুর জংসন থেকে শাখা লাইনে ৩৮ মাইল দূরে শৈব তীর্থ কালাহস্তী। দক্ষিণ ভারতে পঞ্চভূতের নামে পাঁচটি লিঙ্গ আছে। ক্ষিতি লিঙ্গ কাঞ্চীপুরমে, অপ্ লিঙ্গ জম্বুকেশ্বরে, তেজলিঙ্গ অরুণাচলে, আকাশ লিঙ্গ চিদম্বরমে এবং কালাহস্তীতে শিবের বায়ুলিঙ্গ। গর্ভগৃহের মধ্যে একটি প্রদীপ জ্বেলে রাখা হয়। বাতাস আসবার কোন রন্ধ্র নেই, অথচ প্রদীপের শিখাটি সারাক্ষণ থরথর করে কাঁপে।

কালাহস্তীর প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় চমৎকার। সুবর্ণমুখী নদীর ধারে দুই পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত এই মন্দির। লোকে এই পাহাড়কে মেরু পর্বত বলে। পবনের সঙ্গে আদিশেষের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় মেরু পর্বতের তিনটি অংশ উড়ে গিয়েছিল। তার একটি পড়েছে কালাহস্তীতে, দ্বিতীয়টি তিরুচিরপল্লীতে এবং সিংহলে তৃতীয়টি। মেরু পর্বতে শক্তির পরীক্ষা হয়েছিল পবনের সঙ্গে নাগরাজ আদিশেষের। পবন সমস্ত মেরুপর্বত হাওয়ায় উড়িয়ে দেবেন, আর আদিশেষ তাঁর সহস্র ফণায় রক্ষা করবেন পর্বতকে। দুজনের যুদ্ধ আরম্ভ হল। পবন প্রবল বেগে বইতে লাগলেন, আর আদিশেষ তাঁর সহস্র ফণা বিস্তার করে মেরু পর্বতকে রক্ষা করতে লাগলেন। পবন দেখলেন যে শক্তিতে হবে না, কৌশলে কৃতকার্য হতে

হবে। তাই এক সময়ে এমন ভাব দেখালেন যে ক্লান্ত হয়ে তিনি হেরে গেছেন। আদিশেষ এই কথা বিশ্বাস করে তাঁর ফণা নামালেন। তারপর পবনকে আবার হঠাৎ বইতে দেখে ফণা বিস্তার করবার আগেই মেরু পর্বতের একটা অংশ উড়ে গেল। বৈষ্ণবরা সেটাই তিরুপতির পাহাড় বলে, আর শৈবরা কালাহস্তীর পাহাড়কে বলে মেরুপর্বত।

আর একটি কিংবদন্তী এখানে প্রচলিত আছে। কালাহস্তীর শিবের পুজা প্রথমে করেছিল এক মাকড়শা সাপ আর হাতী। মাকড়শা শিবের মাথায় জাল বুনত, সাপ দিয়েছিল তার ফণার মণি আর হাতী তার শুঁড় দিয়ে শিবের স্নান করাত। কিন্তু কেউই জানত না যে শিবের ভক্ত আছে তিনজন। একদিন সাপ দেখল যে শিবের গায়ে জল আর বেলপাতা, ভাবল যে নিশ্চয়ই কেউ শিবের ক্ষতি করতে এসেছিল। এই ভেবে সে লুকিয়ে রইল। তারপরে হাতী যেই স্নান করাতে এল, অমনি সাপ তার শুঁড়ের ভিতর ঢুকে পড়ল। যন্ত্রণায় হাতী তার শুঁড়টা শিবের মাথায় ঠুকতেই মাকড়শা আর সাপ দুজনেই মারা পড়ল, হাতী নিজেও মরল। শিব তিনজনেরই মুক্তি বিধান করলেন। তাঁর নাম হল শ্রীকালহস্তীশ্বর— শ্রী মাকড়শা, কাল সাপ ও হাতী এই তিনজনের ঈশ্বর।

আরও কয়েকটি মন্দির আছে এখানে। উত্তরের পাহাড়ে দুর্গাম্বর মন্দির। কান্নাপ্পা মুনির নামে কান্নাবেশ্বরের মন্দির দক্ষিণের পাহাড়ে। এই পাহাড়ের গায়ে ছোট একটি ব্রহ্মার মন্দিরও আছে। কান্নাপ্পা মুনির নামেও সুন্দর একটি গল্প আছে। কান্নাপ্পা ছিলেন একজন সাধারণ লোক, ভক্তির জোরেই মুনি হয়েছিলেন তিনি। বনের পশুপাখি মেরে তিনি শিবের ভোগ দিতেন। একদিন শিব তাঁকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। কান্নাপ্পা দেখলেন যে শিবলিঙ্গের একটা চোখ থেকে জল পড়ছে। কান্নাপ্পা ভাবলেন যে নিশ্চয়ই চোখে কিছু হয়েছে, তাই নিজের একটা চোখ তুলে শিবকে দিলেন। চোখের জল পড়া অমনি বন্ধ হয়ে গেল। খানিকটা পরে দেখলেন যে আর একটা চোখেও জল পড়ছে। কান্নাপ্পা অমনি তাঁর অন্য চোখটা তুলে শিবকে দিতে যাচ্ছিলেন। শিব এই ভক্তি

দেখে ভারি খুশী হয়ে ভক্তের চোখ দিলেন ফিরিয়ে। যাত্রীরা তাই এখন আগে কাম্নাপ্পার পূজা করে পরে শিবপূজা করে। লেপাক্ষীর মন্দিরেও ঠিক এই রকমের একটি গল্প প্রচলিত আছে।

কালাহস্তীর মন্দির প্রাঙ্গণে এখন ছোট বড় অনেকগুলি মন্দির আছে। প্রথমে কাশীর বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার মন্দির, তারপরে মাটির বিশ হাত নিচে পাতাল বিনায়কের মন্দির। এ ছাড়া সূর্য নারায়ণ সুব্রহ্মণ্য ও সদামুক্তি গণপতির মন্দির। দেবীর নাম জ্ঞান প্রসন্নাম্বা। তিনি তিরুপতির বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর ভগিনী। দেবরাজ ইন্দ্রকে পরব্রহ্মের জ্ঞান দিয়েছিলেন বলে তাঁর এই নাম হয়েছে। লোকের বিশ্বাস যে ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রম ছিল এইখানে।

কালাহস্তীর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন একজন পল্লবরাজা, তারপর তোণ্ডামল চক্রবর্তী। পরবর্তীকালে একজন চোল রাজা মন্দিরটি পুনরায় নির্মাণ করেন। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দে এই মন্দিরের প্রাকার ও গোপুরম নির্মিত হয়েছে। শিবরাত্রি এই মন্দিরের প্রধান উৎসব।

তিরুপতি

কালাহস্তী থেকে মাইল ত্রিশেক দূরে তিরুমালাই পাহাড়ের উপরে তিরুপতি ভেঙ্কটেশ্বরের মন্দিরের জন্য ভারত বিখ্যাত। হাওড়া-ম্যাড্রাস লাইনের গুডুর জংসন থেকে ম্যাড্রাস-বম্বে লাইনের রেনিগুণ্টা ৫৩ মাইল দূরে। রেনিগুণ্টা থেকে তিরুপতির বাস তিরুপতি ঈষ্ট নামে মিটার গেজের স্টেশন হয়ে পাহাড়ে ওঠে। তিরুপতি ঈষ্ট স্টেশন গুডুর-কাটপাডি লাইনে। গুডুর বা রেনিগুণ্টা থেকেও মিটার গেজ ট্রেনে তিরুপতি ঈষ্ট এসে তিরুপতির বাস ধরা যায়। এখান থেকে অগণিত বাস সারাক্ষণ পাহাড়ে উঠছে। পূর্বঘাট পর্বতমালার শেষাচলম পাহাড়ের সাতটি শৃঙ্গ পেরিয়ে ২,০০০ ফুট উঁচুতে এই মন্দির অবস্থিত। তিরুপতি ঈষ্ট থেকে ৭ মাইল ও ম্যাড্রাস থেকে ১৪৪ মাইল এর দূরত্ব। এই পাহাড়ের নাম তিরুমালাই বা তিরুপতি পাহাড়। বেঙ্কটেশ্বর বিষ্ণুর নাম। উত্তর ভারতের অনেক যাত্রী বালাজী বলেন।

মন্দিরটি পুরাতন। দ্রাবিড় শৈলী নির্মিত কয়েকটি গোপুরম আছে। উপরে উঠবার সময় এই গোপুরমগুলি দেখতে পাওয়া যায়। হাজার স্তম্ভের মণ্ডপ আছে একটি। সেখান থেকে বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরের ফটকে পৌঁছনো যায়। পল্লব চোল পাণ্ড্য প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের রাজারা এই মন্দিরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সবচেয়ে বড় ছিলেন বিজয় নগরের রাজারা। রাণীদের সঙ্গে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেবরায়ের ধাতুনির্মিত মূর্তি এই মন্দিরে আছে।

দেবদর্শনের জন্য এখানে নানা রকমের নিয়ম কানুন আছে। যাত্রীদের লাইনে দাঁড়াতে হবে, খোঁয়াড়ে ঢুকতে হবে, আবার লাইন। এ সব ব্যবস্থা সাধারণ যাত্রীর কল্পনাতীত। নিতান্ত ভাগ্যবান না হলে এক বেলার চেষ্টায় দেবতার দর্শন হয় না। রেনি গুণ্টা স্টেশন থেকে তিরুপতির বাসের সংখ্যা কম। বাস স্ট্যাণ্ড নেই। স্টেশনের বাইরে থেকে বাস ছাড়ে। তার জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু পাহাড়ের নিচে তিরুপতি একটি ব্যস্ত শহর। দেবী পদ্মাবতীর মন্দির আছে। কিন্তু সেজন্য ব্যস্ত নয়। পাহাড়ে উঠবার জন্য এখানে অসংখ্য বাস লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর সেই বাসে উঠবার জন্য লাইন দেবার অদ্ভুত ব্যবস্থা। এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যে একসঙ্গে দুজন যাত্রী বাসের হাতল ধরতে পারবে না। গুনে গুনে যাত্রী তোলা হবে। একখানা বাস ছেড়ে গেলেই আর একখানা বাস এসে দাঁড়াবে। বাসের একটি অবিচ্ছিন্ন স্রোত পাহাড়ে উঠছে আর নামছে। এই বাস যখন ছিল না তখন হেঁটে উঠতে হত পাহাড়ে। ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভেঙে সাতটি পাহাড় ডিঙিয়ে মন্দিরের দরজায় পৌঁছতে হত। মন্দিরের দেবস্থান পাহাড়ের এই পথঘাট ও বাসের ব্যবস্থা করেছেন।

দিনের খানিকটা সময় ধর্ম দর্শন। তার মানে যে কোন যাত্রী বিনে পয়সায় দেবতার দর্শন পেতে পারেন। শেষ রাতে উঠে লাইনে দাঁড়িয়ে ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে এই দর্শন। তাড়া থাকলে টিকিট কাটতে হবে। অর্চনা একান্তসেবা তমালসেবা—কোনটা সাত টাকা, কোনটা তেরো

টাকা। সাত টাকায় চারজন ও তেরো টাকায় পাঁচজন ঢুকতে পারেন। কিন্তু এই টিকিট কাটবার জন্যেও লাইন দিতে হয়। সম্প্রতি কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য শহরেও টিকিট কাটবার ব্যবস্থা হয়েছে। আবার টিকিট কাটবার পরেও লাইন। এই লাইন সোজা মন্দিরের দরজায় পৌঁছয় নি। প্রথমে একটা খোঁয়াড়ের মতো চৌকো ঘেরা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। এই রকমের সারি সারি খোঁয়াড়। যাত্রীরা সময় কাটাবার জন্যে বই পত্র সঙ্গে আনেন। মন্দিরে যাবার ডাক এলেও শম্বুক গতিতে এগোতে হয়। পাশাপাশি দুজনে দাঁড়াবার উপায় নেই, বসবারও ব্যবস্থা নেই। এঁকে-বেঁকে এমন ভাবে এগোতে হয় যে কোথায় চলেছে তা বোঝাই যায় না। অথচ দেখতে পাওয়া যায় যে কয়েকটি পরিবার মন্দিরের সর্বত্র অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোন উৎসবের জন্য মোটা টাকা জমা দিলে এই স্বাধীনতা। কল্যাণোৎসবের জন্যে পাঁচশো, ব্রহ্মোৎসবের জন্যে সাড়ে সাতশো বা দেড় হাজার এবং বসন্তোৎসবের জন্য দু হাজার টাকা জমা দিতে হয়। তখন আর লাইনে দাঁড়াতে হয় না। লাইনে দাঁড়িয়ে অনেক কষ্টের পর গর্ভ গৃহের কাছে পৌঁছে হতাশ হতে হয়। দেবতার দর্শনের জন্যে সময় পাওয়া যায় না। দরজার সামনে যাত্রীরা একটি মুহূর্ত মাত্র দাঁড়াচ্ছেন, প্রণাম করছেন, তারপরেই সরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। ভাল করে দেখবার জন্য একটু বেশি সময় নেবার চেষ্টা করলেই পূজারীরা হাত নেড়ে সরে যেতে বলছেন। লাইন থামলে চলবেনা। পিছনে যাত্রী আছেন, আরও যাত্রী আছেন বাইরে। এরই নাম ধর্মদর্শন। এরই নাম অর্চনা একান্ত সেবা বা তমাল সেবা। এরই নাম ফুলঙ্গি অভিষেকম বা আরতি। ফুল তুলসি পাতা নেই, নেই কোন ভোগ নিবেদনের নিয়ম। দেবতাকে এক নজরে দেখেই বাইরে হুণ্ডিতে টাকা ফেলতে হয়।

শোনা যায় যে দেবতার বিগ্রহ সাত ফুট উঁচু দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ মূর্তি। পিছনের দুই হাতে শঙ্খ চক্র এবং সামনের এক হাতে অভয় মুদ্রা ও অন্য হাত কোমরে ন্যস্ত। দুটি হাতে ভুজঙ্গ বলয় দেখে অনেকে এটি শিবের মূর্তি মনে করতেন। রামানুজ এই সন্দেহ ভঞ্জন করেন। তিনি যখন এখানে

বাস করতেন, তখন দেবতার হাতে শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ছিল না। ভক্তদের দ্বিধা দেখে রামানুজ এক রাতে একটি শঙ্খ ও চক্র দেবতার সামনে রেখে প্রার্থনা করলেন যে দেবতা নিজেই যেন সন্দেহ ভঞ্জন করেন। লোকের বিশ্বাস যে রামানুজের কথা দেবতা শুনেছিলেন, তিনি সেই রাতেই শঙ্খ ও চক্র নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন।

মন্দিরের গর্ভ গৃহ থেকে বেরোবার পরে আর কোন নিয়ম কানুন নেই। অঙ্গনে দাঁড়িয়ে সোনার পাতে মোড়া মন্দিরের বিমান দেখা যায়। বিমানের নাম আনন্দ নিলয়ম। গর্ভগৃহে যেমন সোনার দরজা, তেমনি সোনার শিখর এই মন্দিরের। কিন্তু চারিদিকের দেওয়াল নিতান্তই সাধারণ। মন্দিরের তৃতীয় প্রাকার এটি, নাম বৈকুণ্ঠ প্রদক্ষিণম্। দ্বিতীয় প্রাকারের নাম বিমান প্রদক্ষিণম্। প্রথম প্রাকারের মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক মূর্তি আছে। মহিষীদের সঙ্গে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেবরায় ভেঙ্কটপতি রায় ও অচ্যুত রায়। আবার বাদশাহের মন্ত্রী টোডরমলের তামার সস্ত্রীক মূর্তি। হুণ্ডি প্রণামী দেবার জায়গা, সেটি আছে রঙ্গমণ্ডপে। খুচরো পয়সা এত পড়ে যে খাজাঞ্চীরা হিমসিম খায়। সারাক্ষণ হুণ্ডি খুলে পয়সা বার করতে হয়। পয়সা গুনবার সময় নেই। আধুলি সিকি দশ পাঁচ তিন দুই এক—এই সব মুদ্রার পাহাড়। বড় বড় দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে বস্তায় ভরতে হয়। টাকা পয়সার ছড়াছড়ি। ভেঙ্কটেশ্বরের কাছে নাকি হিসেব দিতে হয়, যেমন রাজার কাছে হিসেব দেবার নিয়ম।

মন্দিরের সন্নিকটে স্বামী পুষ্করিণীতে যাত্রীরা স্নান করেন। আশেপাশে কয়েকটি সুন্দর জলপ্রপাত আছে। তার মধ্যে প্রধান হল মন্দির থেকে ৪ মাইল দূরে আকাশ গঙ্গা এবং মাইল দেড়েক দূরে কপিলতীর্থম্। যাত্রীদের অনেকেই এখানে মাথা মুড়িয়ে নতুন কাপড় পরেন। মন্দিরের পথে একটা বাড়ির মধ্যে অসংখ্য নাপিত সারাক্ষণ মাথা মুড়োবার কাজে ব্যস্ত আছে। লোকে মানৎ করে মাথা মুড়োতে আসে।

যাত্রীরা এখানে দেবতাকে কর্পূর নিবেদন করে। এ সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। এক বুড়ো ব্রাহ্মণ ঠিক করেছিলেন যে নিজে

পরিশ্রম করে এই মন্দিরের জন্যে একটি পুকুর কাটবেন। তারপর একা সেই পুকুর কাটতে শুরু করেন, আর তাঁর ব্রাহ্মণী মাটি বয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। ব্রাহ্মণীর খুব কষ্ট হচ্ছিল, তবু তিনি কাজ করছিলেন মুখ বুঁজে। হঠাৎ ব্রাহ্মণ দেখলেন যে একটা লোক মাটি বইবার কাজে ব্রাহ্মণীকে সাহায্য করছে। ব্রাহ্মণ ভাবলেন যে তাঁদের পুণ্যে ভাগ বসাতে এসেছে সেই লোকটা। এই ভেবে ব্রাহ্মণ তার কপালে শাবল দিয়ে আঘাত করলেন। লোকটা পালিয়ে গেল। কিন্তু পরে ব্রাহ্মণ মন্দিরে গিয়ে দেখলেন যে দেবতার কপাল ফেটে রক্ত ঝরছে। লোকটার যেখানে তিনি আঘাত করেছিলেন, দেবতার সেইখানেই গেছে ফেটে। হায় হায় করে উঠলেন ব্রাহ্মণ, আর আকুল হয়ে বিগ্রহের কপালে কর্পূর মাখালেন আরামের জন্য। দেবতা যে নিজেই তাঁদের সাহায্য করতে এসেছিলেন, তাতো তিনি বুঝতে পারেন নি!

মন্দিরের অর্থে এখানকার দেবস্থানম্ ভেঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়, ওরিয়েণ্টাল ম্যানস্ক্রিপ্ট লাইব্রেরি প্রভৃতি কতগুলি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। দশদিনব্যাপী ব্রহ্মোৎসব এখানকার প্রধান উৎসব। পাহাড়ের উপরে ও নিচে সরকার ও দেবস্থানম্ পরিচালিত গেষ্টহাউস আছে। যাত্রীরা সপরিবারে থাকতে পারেন, এই রকম কুটীর পাহাড়ের উপরে আছে পাঁচশো। ম্যাড্রাস প্রভৃতি আরও অনেক জায়গা থেকে নিয়মিত বাস যাতায়াত করে।

পণ্ডিচেরি

পণ্ডিচেরি

ম্যাড্রাস থেকে ১০৪ মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরের তীরে পণ্ডিচেরি শহর বর্তমানে একটি তীর্থ রূপে গণ্য হচ্ছে। ঋষি অরবিন্দ এখানকার আশ্রমে তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। ডিভাইন মাদার নামে স্বীকৃত এক ফরাসী মহিলার পরিচালনায় এখানকার আশ্রম ও ইণ্টারন্যাশনাল

সেণ্টার অব এডুকেশন গড়ে উঠেছে। অরোভিল নামে একটি আন্তর্জাতিক শহরও গড়ে উঠছে। ১৯৭৩ সালে মাদার পরলোকগমন করেছেন। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে অরোভিলে একটি মাতৃ-মন্দিরের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয়েছে। শঙ্করাচার্যের জন্মভূমি কালডির ন্যায় শ্রীঅরবিন্দের সাধন ভূমি এই পণ্ডিচেরিও পবিত্র তীর্থ।

পণ্ডিচেরিতে রেলওয়ে স্টেশন আছে। ম্যাড্রাস থেকে ভিল্লুপুরম জংসন হয়ে আসতে হয়। সড়ক পথেও আসা যায়।

তামিলনাড়ু

ম্যাড্রাস

তামিলনাড়ুর প্রধান শহর ম্যাড্রাস কোন তীর্থস্থান নয়। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের তীর্থ দর্শনে এসে এই শহরের দুটি মন্দির উপেক্ষা করা যায় না। সমুদ্রের ধারে ট্রিপ্লিকেনে পার্থসারথির একটি প্রাচীন মন্দির আছে। পুরাকালে এই স্থানের নাম ছিল বৃন্দারণ্য। জনশ্রুতি আছে যে রাজা সুমতি পার্থসারথি রূপে বিষ্ণুর দর্শনের জন্যে এইখানে তপস্যা করেছিলেন। সেই সময়ে ঋষি আত্রেয় বেদব্যাসের নিকট থেকে এখানকার দিব্যমঙ্গল বিগ্রহ এনে রাজাকে দিয়েছিলেন। এই মূর্তিই পার্থসারথির। কালো গ্র্যানাইট পাথরের এই মূর্তিটি এমন জীবন্ত যে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতে হয়। এই মন্দিরেও বলরাম সাত্যকি রুক্মিণী প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধর মূর্তিও আছে। আর আছে সোনার খাপের মধ্যে একটি তরোয়াল। জ্ঞানের এই অসি দিয়ে কৃষ্ণ অজ্ঞানতার অসুর বধ করেছিলেন। পার্থসারথির উৎসব মূর্তিটিও অপরূপ সুন্দর।

৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিরুমালাই আনোয়ার এই মন্দিরের গুণগান করেছিলেন। তাঁর আগে এসেছিলেন দুজন আলোয়ার। মন্দিরটি কোন সময়ে নির্মিত হয়েছে তা জানা যায় না। অষ্টম শতাব্দীর একজন পল্লব রাজা এটির সংস্কার করেছিলেন। সামনের গোপুরম নির্মাণ করেছেন তোণ্ডামণ চক্রবর্তী।

দ্বিতীয় মন্দিরটি কপালীশ্বর শিবের এবং তা শহরের দক্ষিণে মায়লাপুরে অবস্থিত। শিবের নাম কপালীশ্বর কেন হয়েছে, তা নিয়ে একটি উপাখ্যান আছে। ব্রহ্মা একবার কৈলাসে এসে হরপার্বতীকে সম্মান করেন নি। শিব তাই ব্রহ্মার একটি মাথা কেটে নিয়েছিলেন। অনুতপ্ত হয়ে ব্রহ্মা এখানে এসে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে তাঁর আরাধনা করেন। ব্রহ্মার একটি মাথা বা কপাল শিব কেটে নিয়েছিলেন বলে শিবলিঙ্গের নাম হয় কপালীশ্বর।

এই স্থানের নাম মায়লাপুর কেন হয়, তারও একটি কাহিনী আছে। একদিন শিব যখন পার্বতীকে কিছু বলছিলেন, তখন একটি ময়ূরের নৃত্য দেখে পার্বতীর মনোযোগ সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। শিব এই অবজ্ঞা দেখে পার্বতীকে ময়ূরী হও বলে শাপ দিয়েছিলেন। তখন এই স্থানের নাম ছিল কপালীনগর। পার্বতী এইখানে এসে কঠোর তপস্যা করে শাপমুক্ত হন। ময়ূরী হয়েই তিনি তপস্যা করেছিলেন। ময়ূরীকে এদিকে মাইল বলে। মাইল থেকেই এই জায়গার নাম মায়লাপুর হয়েছে।

বামন অবতারের কাহিনীতে দৈত্য গুরু শুক্রের এক চোখ কানা হবার গল্প আছে। মায়লাপুরে এসে কপালীশ্বর শিবের আরাধনা করে শুক্র তাঁর চোখ ফিরে পেয়েছিলেন। তীর্থ পরিক্রমায় বেরিয়ে তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর এইখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এসে দেখেছিলেন যে এক শিব ভক্তের কন্যা সাপের বিষে মারা গেছে, বাপ তার অস্থি একটি পাত্রে রেখে দিয়েছিলেন। তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর এখানকার পুষ্করিণীর জল সেই অস্থির উপরে ছিটিয়ে দিতেই মেয়েটি বেঁচে উঠেছিল। বাপ এই মুনির সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, তা হয় না। পুনর্জীবন দিয়েছেন বলে সে এখন তাঁর কন্যা হয়েছে। ব্রহ্মোৎসবের অষ্টম দিনে এই উৎসব হয়।

ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে বর্তমান মন্দিরটি তিনশো বছরের পুরনো। কিন্তু তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর তাঁর কবিতায় যে মন্দিরের কথা বলেছেন, তা অনেক পুরাতন। সে মন্দির সমুদ্রের ধারে ছিল বলে কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে।

তিরুত্তনি

তিরুপতি থেকে ৪০ মাইল দক্ষিণে এবং ম্যাড্রাস থেকে বম্বের পথে ৫১ মাইল দূরে তিরুত্তনি একটি বিখ্যাত তীর্থ। দক্ষিণ ভারতে দেবসেনাপতি কার্তিকের যে ছটি মন্দির আছে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মন্দিরটি এখানে। অবশ্য কারও কারও মতে পাল্‌নি পাহাড়ের মন্দিরই শ্রেষ্ঠ। তিরুত্তনির স্থান দ্বিতীয়। কার্তিক এদিকে নানা নামে পূজিত হন—সুব্রহ্মণ্য, স্কন্দ, বিশাখ, ষন্মুখ ও মুরুগ। এখানে তাঁর নাম সুব্রহ্মণ্য। বিষ্ণু ও শিবের মতো ইনি প্রধান দেবতাদের অন্যতম। এখানে শোনা যায় যে শিব সুব্রহ্মণ্যের পূজা করেছেন এবং তাঁর কাছে প্রণব মন্ত্র লাভ করেছেন, ইন্দ্র বর পেয়েছেন তাঁর কাছে।

রেলওয়ে স্টেশন থেকে মাইল খানেক দূরে যে পাহাড়, তার স্কন্দগিরি, পূর্ণগিরি, মূলগিরি প্রভৃতি অনেক নাম আছে। ৩৬৫ সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরের দরজায় পৌঁছতে হয়। এখানে প্রায় শ দেড়েক চৌল্‌ট্রি বা ধর্মশালা আছে। দরিদ্র ভোজন এখানে একটি পুণ্য কাজ।

পক্ষীতীর্থ

ম্যাড্রাসের দক্ষিণে চিঙ্গলপুট থেকে ৯ মাইল পূর্বে মহাবল্লীপুরমের পথে পক্ষীতীর্থ একটি জনপ্রিয় তীর্থ। গ্রামের নাম তিরুক্কালুকুন্‌রম। একটি সুন্দর জলাশয়ের ধারে শিবের মন্দির আছে এবং পাঁচশো ফুট উঁচু পাহাড়ের মাথায় আর একটি ছোট মন্দির আছে শিবের। নিচে টিকিট কেটে এই পাহাড়ে উঠতে হয়। ৫৩৭ সিঁড়ি, দুধারে নানারকমের গাছ-পালা। এই ধাপগুলি উঁচু বেশি বলে আর একটি পথও আছে। পাহাড়ে উঠতে অক্ষমদের জন্য ডুলি ভাড়া পাওয়া যায়।

এই তীর্থের একমাত্র আকর্ষণ হল চিলের মতো বড় দুটি সাদা পাখি প্রতিদিন বেলা এগারটার পর এখানে মন্দিরের ভোগ খেতে আসে। লোকে বলে যুগ যুগ থেকে তারা আসছে। এরা শাপভ্রষ্ট ঋষি। কাশীর গঙ্গায় স্নান

করে রামেশ্বরে শিবের পূজার্চনা করে। তারপর পক্ষীতীর্থে আহার করে বিশ্রাম নেয় চিদম্বরমে। এই নিয়ে একটি কাহিনী আছে। অতি ও সম্বু নামে দুই ভাই ঋষি ছিলেন। অতি শিবের ভক্ত এবং সম্বু শক্তির। এই নিয়ে দুজনের বিবাদ। এই বিবাদ ভঞ্জনে এসে শিব বললেন যে শিব ও শক্তি দুজনেই সমান। কিন্তু তাঁরা এ কথা মানলেন না দেখে শিবের শাপে এই দুজনে সাদা পাখি হয়েছেন।

এখানে আরও একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। নন্দী এখানে দীর্ঘ দিন তপস্যা করেছিলেন। একদিন বিষ্ণু এসেছিলেন কৈলাসে শিবের কাছে। বিষ্ণুর বাহন গরুড় শিবের বাহন নন্দীর কাছে শিবের নিন্দে করেছিলেন। নন্দী রেগে তাঁকে আক্রমণ করেন। এইজন্য শিব তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিলেন যে জ্ঞান দিয়ে ক্রোধ জয় করতে হয়। এই অপরাধের জন্যই নন্দী এখানে তপস্যা করে পাপমুক্ত হতে এসেছিলেন। শিব ইন্দ্রকে বলে-ছিলেন নন্দীর তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাতে। ইন্দ্র তিলোত্তমাকে পাঠিয়েছিলেন। তিলোত্তমা গাভীর রূপ ধরে এসে নন্দীকে ভোলাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নন্দী শাপ দিয়েছিলেন তিলোত্তমাকে। শিব তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বর নিতে বলেছিলেন। নন্দী নিজের জন্য কিছুই চান নি, চেয়েছিলেন পক্ষীতীর্থে শিবের পূজা করে ঘোর পাপীরও যেন মুক্তি হয়।

প্রতিদিন দলে দলে যাত্রী সকাল এগারটার সময় পক্ষীতীর্থের পাহাড়ে ওঠেন সাদা পাখি দেখতে। পাখি এখনও আসে। কখনও দুটো, কখনও একটা। পূজারীর হাত থেকে ভোগ খেয়ে যায়।

পক্ষীতীর্থ থেকে ৯ মাইল দূরে মহাবল্লীপুরমেও একটি মন্দির আছে। এই অপরূপ সুন্দর স্থানকে দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যকলার একটি উন্মুক্ত জাদুঘর বলা চলে, কিন্তু একে তীর্থস্থান বলা চলে না।

কাঞ্চীপুরম

ম্যাড্রাস থেকে ৪৫ মাইল দূরে কাঞ্চীপুরম বা কাঞ্চনপুরম ভারতের সপ্ততীর্থের অন্যতম এবং বারাণসীর মতো পবিত্র বলে গণ্য। প্রাচীন

শিলালিপি থেকে জানা যায় যে খ্রীষ্টের জন্মের অনেক আগেও এই শহর অতি সমৃদ্ধ ছিল। গৌতম বুদ্ধ নাকি এখানকার বহু লোককে ধর্মান্তরিত করেছিলেন এবং অশোক এই শহরের নিকটে স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু তার কোন চিহ্ন এখন নেই। ঐতিহাসিক যুগে কোন রাজাদের রাজধানী ছিল এইখানে। পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে চালুক্য রাজা পুলকেশী এই নগর লুঠ করে পুড়িয়ে দেন। তারপরেই পল্লব রাজারা এসে এই নগর নতুন করে নির্মাণ করেন। শুধু স্থাপত্যে নয়, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে কাঞ্চী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হিন্দু ও বৌদ্ধ দার্শনিকেরা বাস করতেন পাশাপাশি। ভারতের প্রথম কূটনৈতিক পণ্ডিত চাণক্য বা কৌটিল্যের জন্ম হয়েছিল এইখানে। তামিল ভাষার রামায়ণ রচয়িতা কবি কাম্বর বাস করতেন এই কাঞ্চীতে। শিব কাঞ্চীর একাম্বর নাথ থেকে তাঁর নাম হয়েছিল কাম্বর। তোড়ল তন্ত্র ও বৃহন্নীল তন্ত্রে কাঞ্চীর উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালের চোল ও বিজয়নগরের আমলেও এই শহরের সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ ছিল। আজও কাঞ্চীপুরম একটি প্রাণবন্ত শহর।

কাঞ্চীপুরম শহরে তিনটি কাঞ্চী আছে—শিব কাঞ্চী, বিষ্ণু কাঞ্চী ও জৈন কাঞ্চী। বাস স্ট্যাণ্ডের নিকটে চিত্রগুপ্তের মন্দির। চিত্রগুপ্ত হলেন যমরাজের পেশকার। 'যমরাজের ভগিনী যমীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। সমগ্র দক্ষিণ ভারতে তাঁর একটি মাত্র মন্দির। একটুখানি এগিয়ে সাঙ্গুপানি বিনায়কের মন্দির। কাশীতে যেমন ঢুণ্ডি গণেশ, কাঞ্চীতে তেমন সাঙ্গুপানি বিনায়ক। অদূরে উলগনাথ পেরুমল মন্দির। দেবতা এখানে বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম বামন মূর্তি। প্রায় ষোল হাত উঁচু। অসুর রাজ বলি যজ্ঞ শেষ করে ব্রাহ্মণদের দান করছেন। সেই সময় বিষ্ণু এলেন বামন রূপে, বলির কাছে ত্রিপাদ ভূমি চাইলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য বিষ্ণুর ছলনা বুঝতে পেরে বলিকে সতর্ক করেছিলেন। শুক্রাচার্য মক্ষীরূপে ভৃঙ্গারের জল আটকাবার চেষ্টা করেন। তাতে তাঁর একটি চোখ কানা হয়। বলি সত্যভ্রষ্ট হতে চান নি, বামনের প্রার্থনা পূরণ করতে চেয়েছিলেন। তারপর বিষ্ণু এক বিরাট মূর্তি ধারণ করলেন। এক পায়ে

পৃথিবী ও আর এক পায়ে আকাশ অধিকার করে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার তৃতীয় পা আমি কোথায় রাখব ? বলি বললেন, আমার মাথায়। বিষ্ণু তাই করলেন, বলি নির্বাসিত হলেন পাতালে আর দেবতারা ফিরে পেলেন স্বর্গরাজ্য।

কুমারকোট্টম সুব্রহ্মণ্যম বা কার্তিকের মন্দির। কার্তিককে এখানে সৃষ্টিকর্তা রূপে কল্পনা করা হয়েছে। ব্রহ্মাকে তিনি শিক্ষা দেবার জন্য বন্দী করেছিলেন এবং সৃষ্টির কাজ নিজের হাতে নিয়েছিলেন। শিব এসে রক্ষা করেন ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা কার্তিকের পূজা করেন এই কুমারকোট্টমে। মন্দিরের এক পূজারী কচিয়াপ্পা শিবাচারিয়ার এইখানে তামিল ভাষায় স্কন্দপুরাণ রচনা করেছিলেন। কচ্ছপেশ্বরের মন্দির তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কূর্ম অবতারে বিষ্ণু এখানে শিবের পূজা করেছিলেন। এরই উল্টো দিকে ইরাবতীশ্বর মন্দির। বৈকুণ্ঠ পেরুমলের নিকটে মুক্তীশ্বর ও মতঙ্গেশ্বর মন্দির ও কামাক্ষী মন্দিরের উত্তরে ইরাবথানেশ্বর মন্দির।

কিন্তু কাঞ্চীপুরমে এসে এইসব মন্দির অনেকেই দেখেন না। স্টেশনে বা বাসস্ট্যাণ্ডে নেমে সোজা চলে যান শিব কাঞ্চীর একাম্বরনাথ দর্শনে। বিরাট মন্দির। দশতলা উঁচু এর গোপুরম ১৮৮ ফুট উঁচু। সামনে একটি ষোল স্তম্ভের মণ্ডপ, তার কারুকার্য চমৎকার। মন্দিরের বিরাট প্রাঙ্গণ। গোপুরগুলি মুখোমুখি, প্রাকারগুলিও নয় সমান্তরাল। খানিকটা এগিয়ে হাজার স্তম্ভের মণ্ডপ। তাতে হাজার স্তম্ভ নেই, আছে ৫৪০ থাম। শিবের এখানে ক্ষিতি লিঙ্গ বলে প্রচার। বালির তৈরি শিবলিঙ্গ, তাই জলে তাঁর অভিষেক হয় না, তেল আর মধু দিয়ে অভিষেক। একাম্বরনাথ আসলে একাম্রনাথ। এই মন্দির প্রাঙ্গণে একটি প্রাচীন আমগাছ আছে। সেই গাছে নাকি টক মিষ্টি কটু ও তেতো এই চার রকম স্বাদের ফল হত। তার মানে, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল। কিন্তু প্রতিদিন একটি করে আম পাকত, আর সেই সেই আমটি দেওয়া হত শিবের ভোগে। এক আম্র থেকে একাম্রনাথ। চতুর্বর্গ ফলদাতা তিনি।

একাম্বরনাথের একটি ভোগ মূর্তি আছে। তাতে পার্বতী শিবকে

আলিঙ্গন] করে আছেন। এই নিয়ে একটি কাহিনী আছে। পার্বতী একদিন খেলাচ্ছলে শিবের চোখ দুহাতে চেপে ধরেছিলেন। শিবের ত্রিনয়ন হল চন্দ্র সূর্য ও অগ্নি। এই তিনটি চোখ ঢাকা পড়তেই পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল। শিব অসন্তুষ্ট হয়ে পার্বতীকে ত্যাগ করলেন। তপস্যায় আবার শিবকে সন্তুষ্ট করবার জন্য পার্বতী কাঞ্চীতে এলেন চম্পা নদীর তীরে। বালি দিয়ে লিঙ্গমূর্তি তৈরি করে শিবের পূজায় নিমগ্ন হলেন। শিব পার্বতীর ভক্তি পরীক্ষার জন্য নদীকে বললেন বন্যার মতো প্রবাহিত হতে। কিন্তু পার্বতী সেই বন্যা দেখে ভয় পেলেন না। দুহাতে আঁকড়ে ধরলেন শিবলিঙ্গ। নদী আর বইতে পারল না, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দূরে। এই মূর্তিই একাম্বরনাথের ভোগমূর্তি।

কাশীতে পার্বতীব নাম বিশালাক্ষী, মাতুরায় মীনাক্ষী এবং কামাক্ষী নাম কাঞ্চীতে। পার্বতীর চোখ দুটি যে সুন্দর ছিল, এই সব নামেই তা প্রমাণ হয়। দেবীর সামনে শ্রীচক্র। শঙ্করাচার্য এটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। একটি ছোট মন্দির শঙ্করাচার্যের। তাঁর সমাধি এইখানে। কাঞ্চীর লোক দাবী করে যে শঙ্কর এই মন্দিরে পূজার্চনা করে তাঁর শেষ জীবন কাটিয়েছেন।

কৈলাসনাথের মন্দির একেবারে অন্য জাতের। আকাশ ছোঁয়া গোপুর নেই সামনে। বিমানটি পিরামিডের মতো চৌকো, কিন্তু মণ্ডপ আর অন্তরাল আছে। এক হাজার বছরের পুরনো এই মন্দিরটি পল্লব স্থাপত্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মন্দিরের এলাকা একটি প্রাকার দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে একটি দেওয়ালে তা দুভাগে বিভক্ত। একটি ছোট মন্দিরের দুধার দিয়ে যাতায়াতের পথ। বড় অঙ্গনটির মধ্যে ছোট ছোট অনেকগুলি মন্দির, আর ছোটটির মধ্যে আটটি মন্দির আছে মহাবলীপুরমের রথের মতো। দেওয়ালে অনেক চিত্র আছে।

শিবকাঞ্চী থেকে বিষ্ণুকাঞ্চী দু-তিন মাইল দূরে। বাস যাতায়াত করে। টাঙ্গা ও সাইকেল রিক্সাও পাওয়া যায়। রাস্তার ধারে ছোট ছোট অনেক মন্দির আছে। বিষ্ণু কাঞ্চীতে বরদরাজ স্বামীর মন্দির।

এ মন্দিরের প্রাঙ্গণও অত্যন্ত প্রশস্ত। সামনেই একটি উঁচু মণ্ডপ, আর নিচু মন্দিরের মতো কক্ষ। বাঁ দিকে একটি একশো স্তম্ভের মণ্ডপ, তার অপরূপ কারুকার্য। এই মণ্ডপের পিছনে একটি বিরাট সরোবর আছে। একাম্বরনাথ মন্দিরের তুলনায় এ মন্দির অনেক ছোট। সাততলা গোপুর ১০০ ফুট উঁচু, কিন্তু কারুকার্যে অপরূপ। বিষ্ণুর নৃসিংহ মূর্তি দেখবার পরে লক্ষ্মীর মন্দির দেখতে অনেকটা ঘুরে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হয়। মূল মন্দিরে বিষ্ণুর চতুর্ভুজ মূর্তি নানা অলঙ্কারে শোভিত। নিচে নেমে তাঁর ভোগ মূর্তি দেখতে হয়। বোঝা যায় না যে বরদরাজ স্বামীর মূর্তি নগ্ন। এ সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। ব্রহ্মা যজ্ঞ করবার জন্য এই স্থান নির্বাচন করেছিলেন। নারদের মুখে সরস্বতী এই কথা শুনলেন। ব্রহ্মা তাঁকে খবর দেন নি বলে ক্রুদ্ধ হয়ে এই যজ্ঞস্থল ভাসিয়ে দেবেন বলে তিনি নদীরূপে প্রবাহিত হলেন। বিষ্ণু আর উপায় না দেখে নগ্ন হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেন নদীতে। সেই নগ্ন মূর্তি দেখে লজ্জিত হলেন সরস্বতী, থমকে দাঁড়ালেন। ব্রহ্মার যজ্ঞ সমাপ্ত হল, আর বিষ্ণু সেই নগ্ন মূর্তিতে বরদরাজ স্বামী নামে এইখানেই রয়ে গেলেন।

কাঞ্চীতে এক হাজার শিব মন্দিরে দশ হাজার শিব লিঙ্গ ছিল। বিষ্ণুর মন্দিরও ছিল অনেক। এখনও কম করে একশো চল্লিশটা মন্দির আছে। কিন্তু অনেক মন্দিরেই পূজা হয় না। বৈকুণ্ঠ পেরুমলের মন্দিরে নিত্য পূজা হয়। অনেক পরবর্তী কালের মন্দির এটি, তাই এর পরিকল্পনা অনেক পরিণত বুদ্ধির।

জৈনকাঞ্চী বাস ষ্ট্যাণ্ড থেকে প্রায় আড়াই মাইল দূরে পালার নদীর ধারে। এখানে চোল রাজাদের আমলের একটি জৈন মন্দির আছে।

কাঞ্চীপুরমে রাত্রিবাসের জন্য পি. ডবলু. ডি. ইনস্পেক্সন বাংলো, মিউনিসিপাল ট্রাভ্‌লার্স বাংলো ও টুরিস্ট ডিপার্টমেণ্টের ক্যাণ্টিন-কাম্ রেস্ট হাউস আছে। ম্যাড্রাস থেকে নিয়মিত বাস যাতায়াত করে। টুরিস্ট বাস আছে, ট্রেনেও যাতায়াত করা যায়। মন্দির দেখবার জন্য বাস ট্যাক্সি টাঙ্গা ও সাইকেল রিক্সার অভাব নেই।

চিদম্বরম

ম্যাড্রাস থেকে ১৫১ মাইল দক্ষিণে চিদম্বরম নটরাজ শিবের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। দক্ষিণ ভারতের আর কোথাও যা নেই, তা এই চিদম্বরমে আছে। একই মন্দিরের প্রাঙ্গণে শিব ও বিষ্ণু দুজনেই আছেন সগৌরবে। এক সময়ে এই শহর চোল রাজাদের রাজধানী ছিল। সেই সময়েই এই মন্দির নির্মিত হয়েছে। শুধু চোল রাজা নয়, পল্লব পাণ্ড্য ও নায়ক রাজাদেরও অনেক কীর্তি এখানে আছে। দুটি নদীর মাঝখানে বত্রিশ একর জমির উপরে নটরাজের মন্দির। চারিদিকে পাথরের প্রাকার। মন্দিরের চারটি গোপুরমের দুটির উপরে নাট্যশাস্ত্রের একশো আটটি ভঙ্গি উৎকীর্ণ আছে। ভিতরে পাঁচটি সভা। এক হাজার স্তম্ভের রাজসভায় পাণ্ড্য ও চোল রাজারা যুদ্ধ জয়ের উৎসব করতেন। চিৎ সভায় শিবের আকাশ লিঙ্গ, অর্থাৎ এখানে তিনি সম্পূর্ণ নিরাকার। সামনে একটি পর্দা ঝোলানো থাকে, প্রয়োজন মতো সেটা সরিয়ে নেওয়া হয়। দেবসভায় ও কনক সভায় শিবের নটরাজ মূর্তি। আর নৃত্যসভাটি একটি রথের আকারে নির্মিত, চাকাওয়ালা এই রথটি যেন কয়েকটি ঘোড়ায় টানছে। মোটের উপরে এই মন্দিরের সর্বত্র—মণ্ডপে স্তম্ভে গোপুরমে—একটা নৃত্যের আবহাওয়া লীলায়িত হয়ে উঠেছে। কিংবদন্তী আছে যে দশম শতাব্দে বীর চোলরাজা সমুদ্র তীরে হরপার্বতীকে নৃত্যরত দেখে নটরাজ বা নাটেশ্বরকে কনক সভায় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেই আছে গোবিন্দরাজ বিষ্ণুর মন্দির। অনন্ত শয়নে বিষ্ণু। বিজয়নগর রাজাদের আমলে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। রাত্রিবাসের জন্য এখানে একটি ইনস্পেক্সন বাংলো আছে।

মায়াভরম

মায়াভরম বা ময়ূরমের তীর্থস্থান হিসাবে কিছু খ্যাতি আছে। কাবেরী নদীর তীরে শহর। কার্তিক মাসে তুলা কাবেরীর মেলা একটি বিশেষ

আকর্ষণ। লোকের বিশ্বাস যে তুলারাশিতে রবির অবস্থানের সময় গঙ্গা মিলিত হন কাবেরীতে।

এখানে শিব মায়ানাথ। আর বিষ্ণু পরিমল রঙ্গনায়ক। মাইল তিনেক ব্যবধানে দুই মন্দির। মাঘ মাসে বিষ্ণু যখন কাবেরীতে স্নান করেন, তখন এক মাস ব্যাপী তার উৎসব হয়।

কুম্ভকোনাম

কুম্ভকোনাম খুব প্রাচীন শহর। পুরাণেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রলয়ের সময় যে কুম্ভে অমৃত রাখা হয়েছিল, তারই একটি কানা পড়েছিল এখানকার মহামোক্ষম সরোবরে। বারো বছর পরে পরে তাই এখানে পূর্ণ কুম্ভের উৎসব হয়। শহরের ছোট বড় আঠারোটি মন্দির তখন যাত্রী সমাগমে মুখর হয়ে ওঠে। এই শহরও কাবেরী নদীর তীরে। বছরে সাত আটটি মেলা বসে। উৎসবও হয় অনেকগুলি। এখানকার চক্রপাণি বিষ্ণু মূর্তির একটা বিশেষত্ব আছে। চক্রপাণি এখানে অষ্টভুজ ও ত্রিনেত্র —শিব ও বিষ্ণুর মিলিত মূর্তি। সারঙ্গপানি বিষ্ণুর মন্দিরটি সবচেয়ে বড়। তার এগারো তলা গোপুর ১৪৭ ফুট উঁচু। কুম্ভেশ্বর শিবের মন্দিরের পথটি আচ্ছাদিত। মহামোক্ষম সরোবর রেলওয়ে স্টেশন থেকে মন্দিরে যাবার পথের পাশে।

এই শহরে শঙ্করাচার্যের কামকোটি পীঠের একটি মঠ আছে। রাত্রিবাসের জন্য আছে একটি মিউনিসিপাল টুরিস্ট বাংলো।

তাঞ্জোর

তাঞ্জোর বা তানজাভুর ম্যাড্রাস থেকে ২১৮ মাইল দক্ষিণে। রাতের ট্রেনে ম্যাড্রাস ছাড়লে ভোরবেলায় তাঞ্জোরে পৌঁছনো যায়। দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত তাঞ্জোর চোল রাজাদের রাজধানী ছিল। শহরে যে চুয়াত্তরটি মন্দির নির্মিত হয়েছিল তার মধ্যে বৃহদীশ্বরের মন্দিরই সব চেয়ে বড়। দশম শতাব্দের শেষের দিকে রাজরাজ চোল এটি নির্মাণ করেছিলেন।

মূল মন্দিরটি ২১৬ ফুট উঁচু। দক্ষিণভারতে গোপুরম নির্মাণের যে রীতি দেখা যায়, এখানে তার ব্যতিক্রম। মন্দিরের চেয়ে গোপুরম বড় নয়, মন্দিরই এখানে বড়। রেলওয়ে স্টেশন থেকে অনতিদূরে শিবগঙ্গা দুর্গের ভিতরে এই মন্দির। হেঁটে যাওয়া যায়। যান বাহনও আছে। উঁচু প্রাকার দিয়ে ঘেরা মন্দির। গোপুরমের ভিতর দিয়ে মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে হয়। প্রাঙ্গণে অনেকগুলি মন্দির ও মণ্ডপ। সামনেই নন্দীর মণ্ডপ। এত বড় নন্দী যে আশ্চর্য হয়ে দেখতে হয়। কুড়ি ফুট লম্বা ও বারো ফুট উঁচু এই নন্দী। লেপাক্ষীর নন্দীই শুধু এর চেয়ে বড়। মন্দিরের গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ দেখেও আশ্চর্য হতে হয়। তেরো ফুট উঁচু। অমরাবতীর শিবলিঙ্গ এর চেয়েও উঁচু, কিন্তু গাম্ভীর্যে এমন বৃহৎ নয়। এখানে বিস্ময়ে ও ভক্তিতে আপনা থেকেই মাথা নত হয়ে যায়। অজন্তার মতো চিত্র আছে দেওয়ালে ও ছাদে। অপরূপ এই সব চিত্র। মনোযোগ দিয়ে না দেখলে মন্দির দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আরও একটি বৃহৎ বস্তু আছে এই মন্দিরে। মন্দিরের চূড়ায় একটি অখণ্ড গোল পাথর বসানো আছে। তার ওজন দুশো মন। কী করে এই ভারি পাথর মন্দিরের এত উঁচু শিখরে উঠল, স্তম্ভিত হয়ে তা অনেকক্ষণ ভাবতে হয়। শোনা যায় যে চার মাইল দূর থেকে মাটি উঁচু করে গড়িয়ে গড়িয়ে এই পাথরটিকে মন্দিরের শিখরে তোলা হয়েছিল। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় বৃহদীশ্বরের মন্দিরকেই ভারতের সুন্দরতম মন্দির ও তামিল শিল্পীকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মন্দির নির্মাতা বলা হয়েছে।

প্রাঙ্গণের পিছনের দিকে ডান হাতে সুব্রহ্মণ্যের একটি সুন্দর মন্দির আছে। এর কারুকার্য ঠিক কাঠের উপরে কারুকার্যের মতো। অন্য ধারে বিনায়কের মন্দির। বৃহন্নায়কী আম্মন ও আরও অনেক দেবদেবী আছেন। কামাক্ষীর মন্দির অনেকটা দূরে। সদর রাস্তার ধারে একটি পবিত্র পরিবেশে এই মন্দির। জনশ্রুতি যে কাঞ্চীর কামাক্ষী নকল। আসল কামাক্ষী কাঞ্চী থেকে সরিয়ে এনে তাঞ্জোরের এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

শহরে অনেক দেশী হোটেল, টুরিস্ট বাংলো, ইসপেক্শন বাংলো ও রেষ্টহাউস আছে। রেলওয়ে স্টেশনে রিটায়ারিং রুমও আছে। চারিদিকের বড় শহর থেকে নিয়মিত বাস যাতায়াত করে। শহর দেখবার জন্য ট্যাক্সি টাঙ্গা ও সাইকেল রিক্সা পাওয়া যায়।

তিরুচিরপল্লী

তিরুচিরপল্লী সংক্ষেপে তিরুচি। পূর্বে ত্রিচিনপল্লী বা ত্রিচি নামে অভিহিত হত। ত্রিরুশিরপল্লী থেকে এই নাম হয়েছে। কিংবদন্তী আছে যে তিরুশির বা ত্রিশির নামে এক তিন মাথার দৈত্য এখানে শিবের তপস্যা করে বরলাভ করেছিল। ট্রেনে এই শহর ম্যাড্রাস থেকে ২৪৯ মাইল এবং তাঞ্জোর থেকে ৩৫ মাইল দূরে। এই শহরের উপকণ্ঠে উরায়ুর নামে একটি প্রাচীন স্থান চোল রাজাদের রাজধানী ছিল। রক ফোর্ট নামে ২৬০ ফুট উঁচু একটি পাহাড়ের শিখরে গণেশের মন্দিরের জন্য এই স্থান তীর্থ রূপে পরিগণিত। এই পাহাড় সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। একদা শিব যখন মেরু পর্বতে তপস্যা করছিলেন, তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবতাদের সঙ্গে শিবের দর্শনের জন্য এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন নাগরাজ আদিশেষ। দেবতারা আদিশেষের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন এইজন্য যে তিনি তাঁর মণিভূষিত সহস্র ফণায় পৃথিবী ধারণ করে আছেন এবং অনন্ত শয়নে বিষ্ণুকে ধারণ করে থাকেন। এই প্রশংসায় ঈর্ষান্বিত হয়ে বায়ু বললেন, শক্তির পরীক্ষা হোক। আদিশেষ মেরু পর্বতকে বেষ্টন করে থাকবেন, আর বায়ু তাঁকে উৎপাটিত করবেন। এই শক্তির পরীক্ষায় বায়ু হেরে গেলেন, প্রবল বেগে বয়েও মেরু পর্বতকে উৎপাটিত করতে পারলেন না। তখন শিব আদিশেষকে তাঁর বন্ধন একটু শিথিল করতে বললেন। তাতেই মেরু পর্বতের তিনটি অংশ উড়ে গিয়ে তিন জায়গায় পড়ল—সিংহল, কালাহস্তী ও তিরুচিরপল্লীতে। এখানকার রক ফোর্ট সেই মেরু পর্বতেরই একটি অংশ। বৃষভের আকার বলে এই পাহাড়কে রিষভাচলম বলে। এরই কুঁজের উপরে বিনায়কের মন্দির। এই নিয়েও একটি কাহিনী প্রচলিত

আছে। বিভীষণ যখন অযোধ্যা থেকে লঙ্কায় ফিরছিলেন, তখন রাম তাঁকে একটি রঙ্গ বিমান দিয়েছিলেন। বিভীষণ সেই বিমান একটি যুবকের হাতে দিয়ে তাকে তা মাটিতে রাখতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু যুবক তা মাটিতে নামিয়ে রাখেন। আর বিভীষণ মাটি থেকে সেই বিগ্রহ কিছুতেই তুলতে না পেরে তাঁর গালে একটি চড় মেরেছিলেন। তারপরে তাড়া খেয়ে যুবকটি এই পাহাড়ের উপর উঠে বিনায়কে রূপান্তরিত হয়ে যান। বিনায়কের গালে সেই চড়ের চিহ্ন এখনও আছে।

এই পাহাড়ের পাদদেশেও একটি বিনায়কের মন্দির আছে। তারই পাশ দিয়ে পাহাড়ে উঠবার সিঁড়ি। পাহাড়ে একশো স্তম্ভের একটি মণ্ডপ আছে। সেখানে ধর্মালোচনা ও সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। একটি গুহা-মন্দিরের কারুকার্য সুন্দর। মণি মণ্ডপে একটি বিরাট ঘণ্টা আছে, তার ওজন প্রায় আটষট্টি মণ। এই পাহাড়ে যে শিব আছেন, তাঁর নাম তায়ুমানাভার। তামিল ভাষায় তায়ুম আনাভার মানে যিনি মা হয়েছিলেন। এই কাহিনী একটি ধার্মিক মেয়ের। ছেলে হবে বলে সে মায়ের কাছে আসছিল কাবেরী পেরিয়ে। কিন্তু ঝড় জলের জন্য নদী পেরোবার উপায় ছিল না। অসহায় মেয়েটি নদীর তীরে কষ্টে দেবতাকে স্মরণ করতে লাগল। সেই ডাকে মা এসে ধাত্রীর কাজ করলেন। মা তো নয়, স্বয়ং শিব এসেছিলেন মায়ের বেশে। তাই শিবের নাম এখানে তায়ুমানাভার।

পাহাড়ের নিচে একটি বৃহৎ জলাশয় আছে। তার নাম টেপ্পাকুলম।

শ্রীরঙ্গম

তিরুচি স্টেশন থেকে মাইল তিনেক দূরে শহরের উপকণ্ঠে শ্রীরঙ্গম একটি বিখ্যাত তীর্থ। কাবেরী নদীর দুই বাহুর মধ্যে এই ছোট শহরটি অবস্থিত। দ্বীপের মধ্যে শহর। দ্বীপটি তিরুচির সঙ্গে পুল দিয়ে যুক্ত।

কিংবদন্তী আছে যে লঙ্কার রাজা বিভীষণ রঙ্গনাথজীর মন্দির স্থাপন করেছিলেন। মন্দিরে বিভীষণের রঙ্গনাথকে অর্চনার মূর্তি আছে। লোকের বিশ্বাস যে এই মন্দির খ্রীষ্টের জন্মের আগে তৈরি হয়েছিল। নাভাজীর

ভক্তমাল গ্রন্থে আছে যে রঙ্গনাথজীর দুই ভক্ত মামা আর ভাগনে স্পর্শমণি চুরি করে এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। স্বামী রাম কৃষ্ণানন্দের শ্রীরামানুজ চরিতে এই বিবরণ অন্য রকম। অষ্টম শতাব্দে তিরুমঙ্গাই আলোয়ার একজন ভক্ত কবি নামে খ্যাতিলাভ করেন। এঁর শিষ্যদের মধ্যে চারজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। একজন তর্কে সকলকে পরাস্ত করতে পারতেন, একজন ফুঁ দিয়ে তালা খুলতে পারতেন, একজন পা দিয়ে ছায়া স্পর্শ করে লোকের গতিরোধ করতে পারতেন এবং আর একজন জলের উপরে বিচরণ করতে পারতেন। গভীর অরণ্যের মধ্যে শ্রীরঙ্গনাথজীর ভাঙা মন্দিরটি সংস্কারের জন্য তিরুমঙ্গাই যখন রাজা ও ধনীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চেয়ে ব্যর্থ হলেন, তখন এই চারজন শিষ্য নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতায় প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করলেন। সেকালে এই তিরুমঙ্গাই ছিলেন দেশের আসল রাজা। নিজে ভিক্ষুক থেকেও দুষ্টের দমন ও দরিদ্রের পালন করে গেছেন। পরবর্তীকালে অবশ্য দক্ষিণ ভারতের রাজারা নানা ভাবে এই মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি করেছেন।

প্রথম প্রাকারটি একুশ ফুট উঁচু ও তার বেড় দু মাইলের বেশি। প্রথম গোপুরম পেরিয়েই একটা শহর—ঘর বাড়ি লোকজন, প্রশস্ত পথ ঘাট, বাজার হাট। আরও দুটি গোপুরমের ভিতরে ঠিক এই রকম ভাবেই হাজার হাজার লোক বসবাস করছে। যাত্রীদেরও থাকবার ব্যবস্থা আছে, যানবাহন আছে। এরই নাম শ্রীরঙ্গম শহর। প্রথম তিনটি প্রাকার পেরোবার জন্য চারি ধারে চারটি করে গোপুরম আছে। কিন্তু চতুর্থ প্রাকারে আছে তিনটি গোপুরম। আর এ গোপুরম ছোট নয়। প্রায় দেড়শো ফুট করে উঁচু, কারুকার্যও সুন্দর। এইখানে আছে হাজার স্তম্ভের মণ্ডপ। তার নিচে পাথরে তৈরি বিভীষণের বিরাট রথ। একটি বন্ধ দরজার নাম বৈকুণ্ঠ দ্বার। বৈকুণ্ঠ একাদশীতে রঙ্গনাথের সবচেয়ে বড় উৎসব হয়। সেদিন এই দরজা দিয়ে শোভাযাত্রা করে দেবতা বৈকুণ্ঠে যান। হাজার স্তম্ভের সভামণ্ডপে আসেন রঙ্গনাথ।

এই মন্দিরে একের পর এক সাতটি প্রাকার ও একুশটি গোপুরম। শেষ

প্রাকারের পর মূল মন্দির। মন্দিরটি ছোট, কিন্তু আকার ওঙ্কারের। শিখরে সোনার গম্বুজ। উপরে যে চারটি সোনার কলস তা চার বেদের প্রতীক। বিমানং প্রণবাকারং বেদশৃঙ্গম্। ঠিক চূড়ার কাছে আদি বিষ্ণুর সোনার মূর্তি। মন্দিরের প্রাঙ্গণে সোনার তালগাছ ও পাথরের গরুড় মূর্তি। গর্ভগৃহে অনন্ত শয়নে শায়িত বিষ্ণুমূর্তি, তাঁর মাথায় শেষ নাগ ফণা বিস্তার করে আছেন। ইনিই রঙ্গনাথ। প্রদীপের আলোয় তাঁর দর্শন। দেবী রঙ্গনায়কী লক্ষ্মী আছেন স্বতন্ত্র মন্দিরে।

মন্দির প্রাঙ্গণে আরও অনেক দেবদেবী আছেন—বিষ্ণু, শ্রীদেবী, ভূদেবী, লীলাদেবী ও গোদাদেবী। গোদাদেবীর উপাখ্যান বড় সুন্দর। মাদুরা থেকে কিছু দূরে বাস করতেন বিখ্যাত বিষ্ণুভক্ত পেরিয়া আলোয়ার। পেরিয়া অপুত্রক ছিলেন। একদিন তুলসীর বনে তিনি এক কন্যা লাভ করেন। পরে এই মিষ্টভাষী কন্যারই নাম হয় গোদা। গোদা মানেই মিষ্টভাষী। নারায়ণে অসীম ভক্তি ছিল গোদার। তাই বড় হয়ে বললেন যে নারায়ণ ভিন্ন আর কাউকে তিনি বিয়ে করবেন না। পেরিয়া উদ্বিগ্ন হলেন। কিন্তু তার পরেই স্বপ্নে আদেশ পেলেন যে গোদা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এবং নারায়ণই তাঁকে বিয়ে করবেন। এদিকে শ্রীরঙ্গমের পূজারী ব্রাহ্মণও আদেশ পেলেন যে গোদাকে বিবাহ সজ্জায় সাজিয়ে মন্দিরে আনতে হবে। তার পরের ঘটনা অলৌকিক। শিবিকা থেকে নেমে গোদা যখন বিগ্রহের সামনে এলেন, নারায়ণ দুহাত বাড়িয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন, আর গোদা অদৃশ্য হয়ে গেলেন সেই বিগ্রহ মূর্তিতে।

আরও অনেক দেবদেবী আছেন—নৃসিংহ, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও হনুমান। তামিল রামায়ণ রচয়িতা বিখ্যাত কবি কাম্বারের সমাধি আছে। বৈষ্ণবাচার্য রামানুজ দীর্ঘকাল এই মন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং একশো কুড়ি বছর বয়সে এখানেই তিনি দেহরক্ষা করেন। তাঁর সম্প্রদায়ের নাম আচারী বা শ্রীসম্প্রদায়। শঙ্করাচার্যের মায়াবাদে নাস্তিকতা প্রবেশ করবার পর তিনি সাধারণের উপযোগী করে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। তিনি বলেছিলেন, ঈশ্বর তর্কের নন, তিনি মর্মের। বুদ্ধি দিয়ে তাঁর দর্শন

নেই, হৃদয় দিয়ে তাঁর উপলব্ধি। ভক্তি ও প্রেম দিয়ে তাঁর প্রসাদ ভিক্ষা করতে হয়। হে শরণ্য, আমি অবিচল ও অনন্য গতি হয়ে তোমার পাদমূলে শরণ নিচ্ছি।

জম্বুকেশ্বর

শ্রীরঙ্গম থেকে জম্বুকেশ্বর শিবের মন্দির মাইল খানেকের বেশি হবে না। এই মন্দিরও পাঁচটি উঁচু প্রাকারে বেষ্টিত। প্রথম প্রাকারের ভিতরে পথের দুধারে অনেক ঘরবাড়ি। অন্য প্রাঙ্গনগুলি ছোট। প্রাঙ্গনের কোথাও মণ্ডপ, কোথাও বা মন্দির। মূল মন্দিরের ভিতরে সারাক্ষণ জল আসছে কোনখান থেকে। শিবের অপ্ লিঙ্গ নাম এখানে সার্থক হয়েছে। ব্রাহ্মণেরা বলেন যে কাবেরীর স্রোতের সঙ্গে যুক্ত একটি কূপের জল এখানে প্রস্রবনের মতো সারাক্ষণ নির্গত হচ্ছে।

মন্দিরের প্রাঙ্গনে একটি প্রাচীন জাম গাছ আছে। ত্রিপুরারি শিব এই গাছের নিচে দীর্ঘকাল তপস্যা করে জম্বুকেশ্বর নামে পরিচিত হয়েছেন। অনেকে বলেন যে পার্বতী এখনও এখানে শিবের জন্য তপস্যা রত। প্রাঙ্গণে তাঁরও মন্দির আছে এবং তার সামনের চাতালে মন্দিরের কাহিনী উৎকীর্ণ করা আছে চমৎকার ভাবে।

তিরুচিরপল্লীতে বাসস্থানের কোন অভাব নেই। অনেক হোটেল ও লজ আছে। টুরিস্ট বাংলো ও ইনস্পেকসন বাংলোও আছে কয়েকটা। রেলওয়ে স্টেশনে রিটায়ারিং রুমও আছে। শহরে বেড়াবার জন্য বাস ট্যাক্সি প্রভৃতি যানবাহনের কোন অভাব নেই।

তিরুভান্নামালাই

অরুণাচল পাহাড়ে তিরুভান্নামালাই একটি বিখ্যাত তীর্থ। শিবের এখানে তেজ লিঙ্গ। ম্যাড্রাস থেকে রামেশ্বরের পথে ৯৯ মাইল দূরে ভিল্লুপুরম জংশন। সেখানে ট্রেন বদল করে কাটপাডি লাইনে ৪২ মাইল দূরে তিরুভান্নামালাই। অরুণাচল পাহাড়ের পাদদেশে পঁচিশ একর জমি

জুড়ে এই মন্দির। তার এগারতলা গোপুর ২০০ ফুট উঁচু। চার দিকে চারটি গোপুরম। প্রাকার দিয়ে ঘেরা মন্দির প্রাঙ্গণে এক হাজার স্তম্ভের একটি অপরূপ মণ্ডপ আছে। সভামণ্ডপ নাটমন্দির পার্বতী ও গণেশের মন্দিরও আছে।

এখানে কার্তিগাই দীপম দশ দিনের উৎসব। তখন লক্ষ লক্ষ যাত্রী এখানে আসেন। বিরাট সমারোহ। আলোয় উজ্জ্বল মন্দির, আগুনে উজ্জ্বল পাহাড়, এই রূপের তুলনা কোথাও নেই। তপস্যা করে পার্বতী কার্তিকের পূর্ণিমা তিথিতে শিবের দর্শন পেয়েছিলেন একটি আগুনের শিখার মতো। সেই থেকে চলে আসছে এই কার্তিগাই দীপম উৎসব। সেদিন সুন্দর করে সাজিয়ে শিব ও পার্বতীর উৎসব মূর্তি মণ্ডপে আনা হয়। আর তখনই একটি হাওয়াই বাজী ছোঁড়া হয় আকাশে। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের উপরে আগুন জ্বলে ওঠে। এর জন্য অবশ্য আগে থেকেই ব্যবস্থা করা থাকে।

ভক্ত কবি অরুণ গিরিনাথর এখানে বাস করতেন। জীবনে বীতরাগ হয়ে একদিন তিনি মন্দিরের গোপুর থেকে লাফিয়ে পড়েছিলেন। নিচে দাঁড়িয়ে সুব্রহ্মণ্য তাঁকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। সুব্রহ্মণ্য হলেন দেব সেনাপতি কার্তিক। অরুণ গিরিনাথরকে তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন। এর পর তিনি ষোল হাজার গান লেখেন। তার মধ্যে তেরশো গান এখনও লোকের মুখে মুখে শোনা যায়। সুব্রহ্মণ্যের সঙ্গে এই কবিরও একটি সুন্দর মূর্তি আছে পাহাড়ের পূর্ব দিকে।

আর একজন মহাপুরুষ বাস করতেন এখানে। মহর্ষি রমন। এখনও তাঁর আশ্রম আছে এখানে, কিন্তু মহর্ষি আর নেই।

মাদুরাই

তিরুচিরপল্লী থেকে ৮৬ মাইল দক্ষিণে মাদুরাই তামিলনাড়ুর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং নিঃসন্দেহে দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনতম শহর। এইখানেই ছিল তামিল সঙ্গম। খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচশো বছর আগে এখানকার এক

পাণ্ড্য রাজার জামাতা বিজয় সিংহলের প্রথম রাজা হয়েছিলেন। মাদুরাই নাম কেন হয়েছিল সে সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে। পাণ্ড্য রাজাদের গুরু ছিলেন অগস্ত্য। এঁরা শৈব ছিলেন। একদিন ধনঞ্জয় নামে এক বণিক এখানকার কদম্ব বনের ভিতর দিয়ে আসবার সময় দেবরাজ ইন্দ্রকে এক স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গের পূজা করতে দেখেন। ধনঞ্জয় রাজা কুলশেখরকে এই সংবাদ দিলে স্বপ্নে তিনি সুন্দরেশ্বর শিবের দর্শন পান। শিবের জটা থেকে যেন মধুর মতো অমৃতক্ষরণ হচ্ছিল দেখে রাজা বুঝতে পারেন যে এই খানেই সুন্দরেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই ঘটনার পরেই রাজা কদম্ব বনের নাম করন করেন মধুর। মধুর থেকেই মাদুরাই। মন্দিরে একটি কদম গাছের গুঁড়ি আছে। তার চারিদিকে নাগের মূর্তি। মহিলারা এর পূজা করেন। শুধু এখানে এই মন্দিরে নয়, দক্ষিণ ভারতের যেখানেই নাগ মূর্তি বেষ্টিত স্থলবৃক্ষ আছে সেখানেই মহিলারা পূজা করে থাকেন।

রেলওয়ে স্টেশন থেকে আধ-মাইল দূরে মীনাক্ষী মন্দির। কে একজন বলেছিলেন যে শ্রীরঙ্গমের মন্দির শ্রেষ্ঠ তার বিশালত্বে, রামেশ্বর গাম্ভীর্যে শ্রেষ্ঠ, আর সৌন্দর্যে মাদুরার মীনাক্ষী মন্দিরের তুলনা নেই। প্রাকারে ঘেরা এই মন্দিরের নটি গোপুরম আছে। ভিতরে জোড়া মন্দির মীনাক্ষী ও সুন্দরেশ্বর শিবের। বসন্ত মণ্ডপ মন্দিরের বাহিরে একটি সুন্দর মণ্ডপ। বিজয়নগর রাজ-বংশোদ্ভুত নায়ক রাজাদের মানুষ প্রমাণ মূর্তি এই মণ্ডপে সাজানো আছে। অষ্ট লক্ষ্মীর মণ্ডপে এখন দোকান বসেছে। এই মণ্ডপে স্তম্ভ নেই, তার বদলে অষ্ট ঐশ্বর্যের অধিকারিনী আটজন লক্ষ্মী এই মণ্ডপের ছাদ মাথার উপরে ধারন করে আছেন। দরজার দুধারে গনেশ ও কার্ত্তিকের সুবিশাল মূর্তি। উপরের দিকে দেওয়ালের গায়ে অনেকগুলি রঙীন চিত্রে মীনাক্ষী দেবীর কাহিনী রূপায়িত করা আছে। মলয়ধ্বজ নামে এক পাণ্ড্য রাজার পুত্র ছিল না। পুত্রকামেষ্টি যজ্ঞ করে তিনি যে কন্যা লাভ করেছিলেন, তাঁরই নাম মীনাক্ষী। ইনি মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার মতো মানুষ হয়েছিলেন। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যুদ্ধে যিনি তাঁকে পরাজিত করতে পারবেন তাঁরই গলায় তিনি বরমাল্য দেবেন।

তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন আটজন প্রার্থী। একে একে সাতজন তাঁর কাছে পরাস্ত হলেন। যাঁর কাছে মীণাক্ষীর পরাজয় হল তিনিই সুন্দরেশ্বর। স্বয়ং শিব এসেছিলেন সুন্দরেশ্বর রূপে। পরিণয় হল দুজনের।

একটু চেষ্টা করলেই মন্দিরের পরিকল্পনাটি বুঝতে পারা যায়। স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় যে দুটি বিরাট মন্দির আছে পাশাপাশি, একটার গায়ে আর একটা, সুন্দরেশ্বর শিব ও দেবী মীনাক্ষীর মন্দির। পূর্ব দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে যদি সোজা এগিয়ে যাওয়া যায় তো সুন্দরেশ্বর শিবের দর্শন পাওয়া যাবে। আর ডান হাতে পড়বে সহস্র স্তম্ভের মণ্ডপ। এখন এই মণ্ডপ আর্ট গ্যালারিতে পরিণত হয়েছে। পঞ্চাশ পয়সা দর্শনী দিয়ে ভিতরে ঢুকতে হয়। মীনাক্ষী মন্দির এরই উত্তরে। শিবের মন্দির থেকে সে মন্দিরে যাবার পথ আছে। আবার দক্ষিণের দ্বার দিয়ে ভিতরে এলে এই মন্দিরই প্রথমে পাওয়া যাবে, আর প্রবেশ পথের ডান দিকেই দেখা যাবে পাথরে বাঁধানো একটি সুন্দর জলাশয়। দেবরাজ ইন্দ্র এই সরোবরে স্বর্ণকমল দেখেছিলেন। এখনও এই জলাশয়ে পদ্মফুল ফোটে। পুরাকালে এর জলে সাহিত্যের বিচার হত। লোকে বিশ্বাস করত যে মূল্যহীন সাহিত্য ডুবে যাবে জলের তলায়, যে ভেসে থাকবে তারই দাম হবে সেকালের মানুষের কাছে। এই মন্দিরের আর একটি দর্শনীয় বস্তু হল মিউজিকাল পিলার। কয়েকটি সরু স্তম্ভে আঘাত করে যন্ত্র সঙ্গীতের ধ্বনি শোনা যায়।

মাদুরাই শহর থেকে ১২ মাইল উত্তর-পূর্বে আলাগার পাহাড়ে আলাগার কয়েল একটি বিষ্ণুর মন্দির। বিষ্ণুর নাম এখানে সৌন্দর রাজ পেরুমল বা আলাগার। আলাগার মানেই সুন্দর। একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষের নিকটে এই মন্দির।

মাদুরায় উৎসব লেগেই আছে। এই জন্য বিদেশীরা এই শহরকে বলত, এ সিটি অব ফেস্টিভালস্। শহরে বাসস্থানের কোন অভাব নেই। হোটেল টুরিস্ট বাংলো প্রভৃতি সব রকমের বাসস্থান আছে। রেলওয়ে স্টেশনে রিটায়ারিং রুমও আছে। দক্ষিণ ভারতের সমস্ত জায়গা থেকে

নিয়মিত বাস যাতায়াত করে। শহরে বেড়াবার জন্য ট্যাক্সি ও সাইকেল রিক্সা পাওয়া যায়।

পালনি

মাদুরা জেলায় পালনি পাহাড়ের উপরে পালনি দক্ষিণ ভারতের একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান। পালনি কোডাইকানাল, পাহাড়েরই একটি অংশ। ডিণ্ডিগুল জংসন স্টেশন থেকে ৩৭ মাইল দূরে। মাদুরা থেকেও বাস যাতায়াত করে। সুব্রহ্মণ্যের এই মন্দিরটিই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।

অগস্ত্য ঋষি কৈলাসে শিবের আরাধনা করে চেয়েছিলেন যে শিব ও পার্বতী তাঁর তৈরি দুটি পাহাড়ে দেখা দিন। এই পাহাড় দুটির নাম শিবগিরি ও শক্তিগিরি। তাঁরা সম্মত হয়ে সেই পাহাড় দুটির উপর দেখা দিলে তিনি বললেন আমি দক্ষিণে আমার বাসস্থানে আপনাদের নিয়ে যাব। তারপর ইডুম্বন নামে তাঁর এক শিষ্যকে সেই পাহাড় দুটি নিয়ে দক্ষিণে যাত্রা করতে বললেন। ইডুম্বন গুরুর কাছে মন্ত্র শক্তি নিয়ে একটা বাঁকে এই পাহাড় দুটি ঝুলিয়ে নিয়ে চলল এবং পালনি পাহাড়ে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য বসল। এই সময়ে সুব্রহ্মণ্য খুব বিমর্ষ ভাবে এই দিকে এসেছিলেন। গণপতির কাছে তিনি হেরে গিয়েছিলেন। সেও এক সুন্দর গল্প। একদিন শিব ও পার্বতী তাঁর দুই পুত্র গণপতি ও সুব্রহ্মণ্যকে ডেকে বলেছিলেন, পৃথিবী পরিক্রমা করে যে আগে ফিরে আসতে পারবে, সে একটি আশ্চর্য ফল পাবে। এই কথা শুনে সুব্রহ্মণ্য তাঁর বাহন ময়ূরে চড়ে ছুটলেন। আর তিনি অদৃশ্য হবার পরে গণপতি শিব ও পার্বতীকে প্রদক্ষিণ করে এসে বললেন, ভূত বর্তমান ও ভবিষ্যতে যত পৃথিবী ছিল আছে ও হবে, তা তোমাদের মধ্যেই আছে। আমি এই সমস্ত প্রদক্ষিণ করে এসেছি, কাজেই ফলটি আমারই প্রাপ্য। শিব বললেন, ঠিক কথা। এবং ফলটি তার হাতেই দিলেন। পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে এসে সুব্রহ্মণ্য যখন এ কথা শুনলেন তখন মর্মাহত হয়ে তিনি এই দিকেই চলে এসেছিলেন। শিব তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে ফল আর কিছু নয়, ফল তিনি

নিজেই। পালম নি, তুমিই ফল। সুব্রহ্মণ্য এখন পালনি পাহাড়ের শিবগিরিতে আছেন। এই পাহাড় ৪৫০ ফুট উঁচু, ৬৫৯ সিঁড়ি ভেঙে এই পাহাড়ে উঠতে হয়।

সুব্রহ্মণ্য এই পাহাড়ে অধিষ্ঠান করছিলেন বলে ইড়ুম্বন এই পাহাড় দুটি আর নড়াতে পারেনি। তাঁর সঙ্গে বিবাদ করতে গিয়ে নিহত হয়েছিল। পরে তার স্ত্রী ও অগস্ত্যের মধ্যস্থতায় প্রাণ ফিরে পেয়ে এই বর লাভ করেছিল যে সে নিজে তাঁর মন্দিরের দ্বারপাল হয়ে থাকবে, আর যারা বাঁকে করে তাঁর পূজার উপকরণ আনবে সুব্রহ্মণ্য তাঁদের মনস্কামনা পূরণ করবেন। সেই থেকে যাত্রীরা এখানে বাঁকে করে পূজার উপকরণ নিয়ে আসে।

পালনি স্টেশন থেকে মন্দিরের দূরত্ব দু মাইল। পাহাড়ের উপরে রাত্রিবাসের ও আহারের ভাল ব্যবস্থা করেছে দেবস্থানম।

রামেশ্বরম

মাদুরাই থেকে প্রায় ১০০ মাইল দক্ষিণে রামেশ্বরম হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ তীর্থের অন্যতম। এটি ভারতের চার ধামের একটি, অন্য তিনটি ধাম হল পুরী দ্বারকা ও বদ্রীনাথ। শিবের এখানে জ্যোতির্লিঙ্গ।

কিছু দিন পূর্বে ধনুস্কোডি নামে আর একটি তীর্থ ছিল রামেশ্বরের নিকটে। এখন তা সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। রামেশ্বরে আসবার আগে যাত্রীরা ধনুস্কোডিতে এসে রত্নাকর নামে ভারত মহাসাগর সংলগ্ন একটি ছোট জলাশয়ে মল বিমোচন স্নান করত। বালি ও পাতার অলঙ্কার কৃত্যার কাছে নিবেদন করে সমুদ্র স্নানের অনুমতি নিত। এখানে এক মাস ধরে ছত্রিশ বার সমুদ্র স্নানের প্রথা ছিল। তিন দিনেও ছত্রিশ স্নানের অনুমতি ছিল। সাধারণ যাত্রীরা এক দিনেই ছত্রিশটা ডুব দিয়ে পূর্ব পুরুষের নামে পিণ্ড দান করত। সীতা উদ্ধারের জন্য রাম এখানে সমুদ্র বন্ধন করেছিলেন। লঙ্কা জয়ের পর সমুদ্র রামের কাছে বন্ধন মোচনের প্রার্থনা করেছিলেন। আর রামের আদেশে লক্ষ্মণ তাঁর ধনু দিয়ে সেতুবন্ধ ভেঙে

দিয়েছিলেন। এই জন্যেই এই স্থানের নাম হয়েছিল ধনুস্কোডি। সিংহলে যাবার জাহাজ তখন এখান থেকেই ছাড়ত। এখন ছাড়ে রামেশ্বর থেকে। নৌকোয় চেপে সমুদ্রে গিয়ে এই জাহাজে উঠতে হয়।

রামেশ্বর একটি দ্বীপ। এই দ্বীপের আয়তন পূর্ব-পশ্চিমে পঁচিশ মাইল এবং উত্তর-দক্ষিণে ছ মাইলের বেশি কোথাও নেই। শঙ্খের আকার এই দ্বীপের। হাজার চল্লিশেক লোকের বাস। মাদুরা থেকে যে ট্রেন ছাড়ে তা সোজা এসে রামেশ্বরে দাঁড়ায়।

মূল মন্দির ছাড়াও এখানে আরও অনেক দর্শনীয় স্থান আছে। তার মধ্যে প্রধান হল গন্ধমাদন পর্বত নামে একটি উঁচু জায়গায় রাম ঝরকা। শহর থেকে মাইল দেড়েক দূরে। একান্ত রামেশ্বরম তিন মাইল, নাম্বি নায়কী আম্মন দু মাইল, সীতাকুণ্ডম ও ভিল্লুরনি তীর্থম মাইল পাঁচেক দূরে। পশ্চিমের রেলপুলের নিকটে ভৈরব তীর্থম এবং ধনুস্কোডির দিকে কোদণ্ডরমন কয়েল।

রামঝরকার দোতলা মন্দিরে আছে রামের চরণ চিহ্ন। এই মন্দিরের উপর থেকেই গোটা রামেশ্বর দ্বীপটা দেখা যায়। উত্তর দক্ষিণ ও পূর্বে অসীম জলরাশি, পশ্চিমে একটি ছোট সেতু দিয়ে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা হচ্ছে। এখানে যাবার পথেও অনেক তীর্থ আছে। সুগ্রীব অঙ্গদ জাম্ববান, পাণ্ডব ধর্ম ভীম অর্জুন নকুল সহদেব—সকলের নামে তীর্থম। তীর্থম মানে কুণ্ড। কোথাও জল আছে একটুখানি, কোথাও নেই। দ্রৌপদী তীর্থমও আছে, তা ভদ্রকালী আম্মন মন্দিরের কাছে। যে বালুকাময় পথ গন্ধমাদন পর্বতে উঠেছে, তার রঙ লাল। এই নিয়ে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। রাম রাবণ বধ করে ফিরে এসে শিব পূজা করবেন। হনুমান কাশী থেকে শিবলিঙ্গ আনতে গেলেন। তাঁর দেরি দেখে রাম বালির লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করলেন। হনুমান ফিরে এসে মর্মাহত, তাঁর সমস্ত শ্রম ব্যর্থ হয়ে গেছে। রাম বললেন, তুমি এই লিঙ্গ তুলে ফেলে নিজের আনা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কর। এই আদেশ পেয়েই হনুমান তাঁর লেজ দিয়ে বালির শিবলিঙ্গ জড়িয়ে তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলেন।

কিন্তু শিবের মায়ায় রক্তাক্ত কলেবরে ছিটকে পড়লেন সমুদ্রের ধারে। সেই দিনই হনুমানের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল রামেশ্বরের বালি।

রামেশ্বরে শিব প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে আরও একটি কাহিনী আছে। রাম সেতু বন্ধের পূর্বেই শিবপূজা করেছিলেন। সারা দিনে তাঁরা যতটা সেতু নির্মাণ করতেন, রাতে রাবণ ততটাই দিতেন ভেঙ্গে। সমুদ্রের পরামর্শে রাম শিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাবণকে জব্দ করতে। তার পরে রাবণ আর কোন অনিষ্ট করতে পারে নি। রাম ঝরকায় দাঁড়িয়ে রাম তাঁর সেতু নির্মাণ দেখতেন, দেখতেন তাঁর সৈন্য পরিচালনা। লঙ্কা জয়ের মন্ত্রণা করেছেন এইখানে বসে। যাঁকে আমরা দেবতা বলে মানি ও মহাকাব্যের নায়ক বলে জানি, এইখানে দাঁড়িয়ে তাঁকে আমাদের মতোই মানুষ বলে মনে হবে। নাসিকের পঞ্চবটি বন থেকে সীতা অপহৃত হয়েছিলেন। সীতার অন্বেষণে বেরিয়ে রাম-লক্ষণ এসেছিলেন তুঙ্গভদ্রার তীরে কিস্কিন্ধ্যায়। হাম্পির ঋষ্যমূক পর্বতে সুগ্রীবের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। সানুচর সুগ্রীব তখন বালীর ভয়ে এই মতঙ্গারণ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। রাম বালী বধ করে সুগ্রীবকে কিস্কিন্ধ্যার রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। সীতার সংবাদ আনলেন হনুমান, লঙ্কার অশোক বনে তিনি বন্দিনী। রামনাদ রেলওয়ে স্টেশন থেকে সাত মাইল দক্ষিণে দর্ভশয়নমে পৌঁছে তৈরী হল সমুদ্রের উপরে সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা। দর্ভ বা কুশের উপরে শয়ন করে বরুণের উপাসনা করে রাম সমুদ্র বন্ধনের অনুমতি নিলেন। খানিকটা দূরে দেবীপত্তনমে নবগ্রহের পূজা করলেন। আজও সমুদ্রের জলে নটি প্রস্তর খণ্ড উপরে জেগে আছে। আদি সেতুর নির্মাণ শুরু হল দর্ভশয়নম থেকে।

শোনা যায় যে এক কুঁড়ের নিচে ছিল রামেশ্বর শিবলিঙ্গ। একজন সন্ন্যাসী তাঁর পূজা করতেন। সিংহলের এক রাজা মন্দিরের গর্ভ গৃহটি নির্মাণ করেছিলেন বলে জনশ্রুতি। সাড়ে তিনশো বছর ধরে এই মন্দিরটি গড়ে উঠেছে। মন্দিরের সব চেয়ে পুরাতন অংশটি সিংহলে পালিশ করা পাথরে তৈরি। কাণ্ডির কররাজা সেকরার নাম এর সঙ্গে যুক্ত। দক্ষিণ ভারতের সমস্ত বন্দরের আয় এই মন্দির নির্মাণের কাজে ব্যয় করা হয়েছিল।

১০০ ফুট উঁচু গোপুরমের ভিতর দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতে হয়। সাহেবরা এই মন্দিরের বয়স তিনশো বছরের কিছু বেশি বলে অনুমান করেন। তাঁদের মতে এই রামেশ্বরের মন্দির হল দ্রাবিড় স্থাপত্য শিল্পের এমন একটি নিদর্শন যে তাতে সৌন্দর্য ও সম্পূর্ণতার সঙ্গে শ্রেণীগত ত্রুটিও প্রকাশ হয়ে পড়েছে। কিন্তু সাধারণ যাত্রী মন্দিরের প্রশস্ত বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যান। কী বিরাট, কী গম্ভীর, কী সুন্দর। ৪,০০০ ফুট লম্বা, আর প্রায় ২৪ ফুট প্রশস্ত। দুধারের বড় বড় স্তম্ভের উপরে ছাদ। সেই থামের গায়ে বিচিত্র কারুকার্য নেই দক্ষিণের অন্যান্য মন্দিরের মতো। দেওয়ালের রঙেও কোন জৌলুস নেই। সমগ্র ভাবে একটি বিরাট কীর্তির মহিমা আছে, নেই কোন সূক্ষ্ম শিল্পের আবেদন।

প্রদীপের আলোয় রামেশ্বর দর্শন করতে হয় দূর থেকে। মন্দিরের সর্বত্র বিদ্যুতের আলো, কিন্তু গর্ভগৃহে ঘৃতের প্রদীপ। কর্পূরের আলোয় আরও ভাল দেখা যায় দেবতাকে। গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছেন পাষাণ দেবতা। কী কঠোর তপস্যায় সেই ধ্যান ভঙ্গ হবে তা তিনিই জানেন। পূজারী উদাত্ত স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করেন, দূরে দাঁড়িয়ে ভক্তরা কর জোড়ে স্তব্ধ হয়ে থাকেন। শান্ত সমাহিত পরিবেশ।

এখানে নিজের হাতে বাবার মাথায় ফুল বেলপাতা চড়াবার অধিকার কারও নেই। এই মন্দির পরিচালনার জন্য এখানে একটি দেবস্থানম কমিটি আছে। একজন বেতনভোগী ট্রাষ্টি মাদুরা থেকে জমিদারী দেখাশোনা করেন। আর রামেশ্বরে তাঁর সহায়তা করেন একজন কোষাধ্যক্ষ ও একজন পেশকার। পূজারীরা বেতনভোগী ব্রাহ্মণ। পূজার্চনা ও অভিষেকাদি করবার রীতি পেশকারের নিকট নানা মূল্যের টিকিট কিনে।

এখানেও অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বর আছেন। বাইশটি তীর্থম আছে মন্দিরের প্রাকারের ভিতরে। তার মধ্যে কোটি তীর্থম ও সর্ব তীর্থমের জল যাত্রীরা দড়ি দিয়ে ঘটি নামিয়ে কুণ্ড থেকে তুলে মাথায় ঢালেন। অনেকে স্নান করেন অগ্নি তীর্থে। মন্দিরের পূর্ব গোপুরম দিয়ে বেরিয়ে সমুদ্রের ধারে এই

তীর্থ। যে কোন তীর্থ স্থানে গেলে দেবতার শেষ আরতি দেখতে হয়। মন্দিরের ভিতর তখন শুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। পূজারীরা উদাত্ত কণ্ঠে বেদপাঠ করেন, বাদ্য ও যন্ত্র সঙ্গীত শোনা যায় অনেক মন্দিরে। শয়ন আরতির নানা ব্যবস্থা দেখা যায়। দেবতার ভোগ মূর্তি নিয়ে দেবীর কাছে যাওয়া হয়। ভোরবেলায় সেই মূর্তি আবার ফিরিয়ে আনা হয়। রামেশ্বরের আরতি না দেখলে তীর্থ দেখা সম্পূর্ণ হয় না।

এখানে রাত্রি বাসের জন্য মীনাক্ষী লজ, দেবস্থানমের রেস্টহাউস ও কটেজ এবং বিনে ভাড়ার চৌল্ট্রি বা ধর্মশালা আছে। রেলওয়ে স্টেশনে রিটায়ারিং রুমও আছে।

তিরুচেন্দুর

মন্নার উপসাগরের তীরে তিরুচেন্দুর একটি রমণীয় তীর্থস্থান। মাদুরাই থেকে এর দূরত্ব ১৩৫ মাইলের মতো। তিরুনেলভেলি জংশন হয়ে যেতে হয়। রেলওয়ে স্টেশন আছে, আবার তিরুনেলভেলি থেকে বাসেও যাতায়াত করা যায়। কন্যাকুমারী যাবার পথে এই তীর্থ দর্শনের কোন অসুবিধা নেই। তিরুচেন্দুর থেকেও কন্যাকুমারীর বাস আছে। সমুদ্রের ধারে নূতন পথ তৈরি হয়েছে।

এখানে সমুদ্রের তীরে সুব্রহ্মণ্যের মন্দিরটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অপরূপ। কোন প্রাকার দিয়ে ঘেরা নয় বলে যাত্রীরা সমুদ্রে স্নান করে বেলাভূমির উপর দিয়ে এই মন্দিরে পূজার্চনা করতে আসেন। সমুদ্রের জোয়ার মন্দিরের পাদদেশ ধুয়ে দিয়ে যায়। সুন্দর কারুকার্য মণ্ডিত গোপুরম আছে শহরের দিকে। মন্দিরের পথ আচ্ছাদিত।

সুব্রহ্মণ্য কার্তিকের নাম। এঁর জন্ম সম্বন্ধে এ দিকে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তা কিছু অন্য রকম। সুরপদ্ম নামে এক অসুরের উৎপাতে অস্থির হয়ে দেবতারা কৈলাসে শিবের কাছে এসেছিলেন প্রতিকারের জন্য। তাঁদের অভিযোগ শুনে তাঁর তৃতীয় নেত্র থেকে ছবার তেজ নির্গত হল। অগ্নি সেই তেজ ধারণ করে গঙ্গায় নিক্ষেপ করলেন। গঙ্গা থেকে সেই

তেজ হিমালয়ের শরবনে এসে ছটি শিশুতে পরিণত হল এবং ছজন কৃত্তিকা তাদের লালন করেন। তারপর পার্বতী শিবের নিকট দ্বিতীয় পুত্র চাইলে শিব তাঁকে শরবন দেখিয়ে দেন। পার্বতী সেই শরবনে ছটি শিশু দেখে বিস্ময়ে ও আনন্দে তাদের জড়িয়ে ধরতেই তাদের দেহ এক হয়ে যায়, কিন্তু মাথা রয়ে যায় ছটি। এই জন্যই তাঁর নাম হয় ষন্মুখ ষড়ানন বা অরুমুগ। স্কন্দ, কুমার, মুরুগ বা সুব্রহ্মণ্য নামেও তিনি পরিচিত। উত্তর ভারতে তাঁর নাম কার্তিকেয় বা কার্তিক।

কার্তিক হলেন দেব সেনাপতি। সুরপদ্মকে বধ করবার জন্য কৈলাস থেকে তিনি দক্ষিণে তিরুচেন্দুরে এলেন সসৈন্যে এবং শিব প্রতিষ্ঠা করে পূজা করলেন শিবের। তিরুচেন্দুরের নিকটেই সমুদ্র-দুর্গ মহেন্দ্র গিরিতে বাস করত সুরপদ্ম ও তার ভ্রাতারা। তাদের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ হল কার্তিকের। ভ্রাতারা নিহত হল। পরাজিত সুরপদ্ম ময়ূরের রূপ ধারণ করেছিল। এই যুদ্ধে ইন্দ্র ছিলেন কার্তিকের বাহন। কার্তিক এইবারে ময়ূরকেই নিজের বাহন রূপে গ্রহণ করলেন।

স্কন্দ পুরাণের মতে কার্তিকের ছটি মন্দিরের মধ্যে প্রধান হল পালনি, তারপরেই তিরুচেন্দুরের স্থান। দক্ষিণে কার্তিকের দুই স্ত্রী। দেবসেনা ও বল্লি। বল্লি একজন আদিবাসী রাজার কন্যা। তাঁর সঙ্গে কার্তিকের যুদ্ধ হয়েছিল। একটি গুহা আছে বল্লির নামে, তার মধ্যে মূর্তি আছে। আর একটি কুণ্ডের জলে আছে প্রাকৃতিক বিস্ময়। উপরের একটি গন্ধকের কালো জলের বড় কুণ্ডের নিচে খুবই ছোট আর একটি কুণ্ডে পরিষ্কার পানীয় জল পাওয়া যায়। কার্তিকের সৈন্যরা অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে তৃষ্ণার্ত হলে কার্তিক তাঁর বল্লম দিয়ে খুঁড়ে পানীয় জলের এই ব্যবস্থা করেছিলেন।

এখানে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রেস্টহাউস আছে। মন্দিরের দেবস্থানও যাত্রীদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করেছেন।

শ্রীবৈকুণ্ঠম

তিরুনেলভেলি থেকে তিরুচেন্দুর যাবার মাঝপথে তাম্রপর্ণী নদীর তীরে শ্রীবৈকুণ্ঠম বৈকুণ্ঠনাথের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। সোমুক নামের একজন অসুর বেদ চুরি করেছিল। সেই বেদ উদ্ধারের জন্য ব্রহ্মা এখানে তপস্যা করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের তীর্থদর্শনে বেরিয়ে চৈতন্যদেব এখানে এসেছিলেন।

আলোয়ার তিরুনগরী

শ্রীবৈকুণ্ঠম থেকে ৩ মাইল দূরে আলোয়ার তিরুনগরীও একটি বৈষ্ণব তীর্থ। আদিনাথ স্বামীর বিরাট মন্দিরের জন্য এই স্থান বিখ্যাত। নাম্মালোয়ার ও মনভলা মুনি এখানে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

পাপনাশম

তিরুনেলভেলির সঙ্গে যুক্ত পালমকোট্টা শহর থেকে সড়ক পথে ২৯ মাইল দূরে পাপনাশম একটি রমণীয় তীর্থস্থান। ট্রেনে তিরুনেলভেলি থেকে ত্রিবেন্দ্রামের পথে অম্বা সমুদ্রমে নামতে হয়। তাম্রপর্ণী নদী এখানে পাহাড় থেকে ৮০ ফুট নিচে জলপ্রপাতের মতো নেমেছে। অদূরে অগস্ত্যের মন্দির।

শুচীন্দ্রম

তেরুনেলভেলি থেকে কন্যাকুমারীর পথে ৫০ মাইল দূরে শুচীন্দ্রম একটি মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। তিরুনেলভেলি ও ত্রিবেন্দ্রাম থেকে কন্যা-কুমারীর পথ এসে নাগের কয়েলে মিলেছে। এই শহরের অনতিদূরে এই মন্দিরটি প্রধান রাজপথ থেকে খানিকটা ভিতরে। কন্যাকুমারী এখান থেকে মাইল দশেকের বেশি নয়।

পুরাকালে এই স্থানের নাম ছিল জ্ঞানারণ্য। মহর্ষি অত্রির আশ্রম ছিল এইখানে। তাঁর পতিব্রতা পত্নী অনসূয়ার খ্যাতি তখন চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়েছে। দেবর্ষি নারদ সেই কথা দেবলোকে রাষ্ট্র করলেন, বললেন যে অনসূয়ার চেয়ে বড় সতী ত্রিলোকে আর নেই। এই কথা শুনে

ঈর্ষান্বিত হলেন দেবতার পত্নীরা। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বাধ্য হলেন এর পরীক্ষা নিতে। একদিন তিনজনে ব্রাহ্মণের বেশে অত্রির আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। অত্রি তখন গৃহে নেই, তপস্যার জন্য তিনি হিমালয়ে গেছেন। অতিথি সৎকার করতে এগিয়ে এলেন অনসূয়া। কিন্তু ছদ্মবেশী দেবতারা বললেন, নগ্ন হয়ে খাদ্য পরিবেশন করলেই তাঁরা তা গ্রহণ করতে পারেন। অনসূয়া চমকে উঠলেন এই কথা শুনে। তবে কি অতিথিদের তিনি ফিরিয়ে দেবেন! তখনই তাঁর স্বামীর কথা মনে পড়ল, মনে পড়ল তাঁর পাদোদকের কথা। এই বিপদ থেকে রক্ষা পাবার উপায় তখনই তাঁর মাথায় এল। তিনি সেই পাদোদক এনে অতিথিদের মাথায় ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, বালো ভব, মানে শিশু হয়ে যাও। দেখতে না দেখতেই দেবতারা শিশুতে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। তাঁদের সামনে অনসূয়ার আর কোন লজ্জা রইল না। তিনি তাঁদের সৎকার করলেন, আর দেবতারা ভুলে গেলেন ঘরে ফেরার কথা। দেবর্ষি নারদ আবার ছুটলেন দেবলোকে। বললেন, সর্বনাশ হয়েছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এখন শিশু হয়ে অত্রির আশ্রমে খেলা করছেন। ভয় পেয়ে ছুটে এলেন তাঁদের পত্নীরা, কিন্তু নিজেদের পতিদের আর চিনতে পারলেন না। এমন সময় অত্রি ফিরলেন তপস্যা শেষ করে। সব কথা শুনে তিনি কমণ্ডলুর জল শিশুদের গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। তাতেই দেবতারা নিজ রূপ ফিরে পেলেন। সেই অবধি এই ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বাস করছেন জ্ঞানারণ্যে। শুচীন্দ্রমের মন্দিরে এই তিন দেবতারই পূজা হয়।

জ্ঞানারণ্য থেকে এ জায়গার নাম শুচীন্দ্রম কেন হল, সে সম্বন্ধেও একটি কাহিনী আছে। দেবরাজ ইন্দ্র ব্যভিচার করেছিলেন গৌতম ঋষির পত্নী অহল্যার সঙ্গে। আর গৌতমের শাপে তাঁর সারা দেহে অশুচি চিহ্ন দেখা দিয়েছিল। গৌতমের কাছে ইন্দ্র শাপ মুক্তির উপায় জানতে চাইলে তিনি তাঁকে এই জ্ঞানারণ্যে তপস্যা করতে বলেছিলেন। অত্রি-অনসূয়ার আশ্রমে তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের বাস। ইন্দ্র এখানে তপস্যা করে শুচী হবার পরে জ্ঞানারণ্যের নাম শুচীন্দ্রম হয়েছিল। শুচীন্দ্রমের লোক দাবী

করে যে এখানকার ব্রহ্ম মন্দিরটি দেবরাজ ইন্দ্রের তৈরি। এখনও প্রতি রাত্রে দেবরাজ আসেন ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পূজা করতে। ইন্দ্রের পূজা না পেলে তাঁরা অপূজিত থাকেন।

বিশাল একটি পুষ্করিণীর ধার দিয়ে মন্দিরে যাবার পথ। গোপুরম আছে সামনে, দুধারে দোকান পাট। পুরুষদের এখানে খালি গায়ে মন্দিরে ঢুকতে হয়, প্যান্টের উপরে লুঙ্গির মতো করে ধুতি জড়িয়ে নিলে চলে বলে ধুতি ভাড়া পাওয়া যায়।

রামেশ্বরের মন্দিরের মতো এখানেও একটি সুন্দর বারান্দা আছে, দুধারে কারুকার্য করা স্তম্ভ। এক জায়গায় মাদুরার মীনাক্ষী মন্দিরের মতো চারটি সরু থাম আছে পাশাপাশি। তার উপর করাঘাত করলে চারটি সুর বাজে চার রকম যন্ত্রের মতো। মন্দিরের মধ্যে একাধিক মণ্ডপ ও অনেক দেবতা। হনুমানের বিরাট মূর্তি দেখে বিস্মিত হতে হয়, তিন চার জন মানুষের সমান উঁচু। ডমরু হাতে শিবের দণ্ডায়মান মূর্তি, নৃত্যপর বেনুগোপালের মূর্তি এবং বংশীধারী বিষ্ণুর চতুর্ভুজ মূর্তি। এ ছাড়াও অনেক দেবদেবী আছেন।

কন্যাকুমারী

ভারতের শেষ প্রান্তে কন্যাকুমারী একটি সুন্দর তীর্থ। লোকে বলে, তিন সমুদ্রের মিলন হয়েছে এইখানে—পূর্বের বঙ্গোপসাগর আর পশ্চিমের আরব সাগর এখানে দক্ষিণের ভারত মহাসাগরের সঙ্গে মিলেছে। কন্যাকুমারী একটি বিস্ময়কর স্থান। সবুজ পাহাড়ের পাদদেশে বড় বড় পাথর ও বালির সমাবেশে এবং সারাক্ষণ সমুদ্রের ডাকে তার চিরকালের আকর্ষণ।

কুমারী বা কন্যাকুমারীর মন্দির থেকে এই স্থানের নাম হয়েছে কন্যা-কুমারী। বাণাসুরকে বধ করবার জন্য দুর্গা এখানে কুমারী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দুর্ধর্ষ বাণাসুর কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছে বর পেয়েছিলেন যে দেব দানব যক্ষ নর গন্ধর্ব কিন্নর কেউ তাঁকে বধ করতে

পারবে না। বাণাসুর তারপরে ত্রিভুবন জয় করে দেবরাজ ইন্দ্রকে তাড়ালেন অমরাবতী থেকে। নির্বাসিত ইন্দ্র যজ্ঞ করলেন বিষ্ণুর পরামর্শে। সেই যজ্ঞের আগুন থেকে এক কুমারী কন্যার জন্ম হল। এই কন্যাই বধ করবেন বাণাসুরকে। কিন্তু তার আগেই দেবাদিদেব মহাদেবের সঙ্গে তার বিবাহ স্থির হয়ে গেল। ইন্দ্র প্রমাদ গনলেন। এই কন্যার বিবাহ হয়ে গেলে বাণাসুরকে বধ করবে কে। ইন্দ্র তাই দেবর্ষি নারদের শরণাপন্ন হলেন; বললেন, এই বিবাহ পণ্ড করতেই হবে। নির্দিষ্ট দিনে শিব সেজে গুজে যাত্রা করলেন ষাঁড়ের পিঠে চেপে, লগ্ন উত্তীর্ণ হবার আগে তাঁকে কন্যাকুমারী পৌঁছতে হবে। তা না হলে শর্ত মাফিক এ বিয়ে আর হবে না। কিন্তু জ্ঞানারণ্যে অত্রি মুনির আশ্রমের কাছে এসে তিনি নারদের সাক্ষাৎ পেলেন। নারদ তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা জুড়ে দিলেন। সে আলোচনা শেষ হবার আগেই লগ্ন পার হয়ে গেল। শিব জ্ঞানারণ্যেই রয়ে গেলেন। তাঁর অধিষ্ঠান এখন শুচীন্দ্রমের মন্দিরে। আর কন্যাকুমারীতে আজও অপেক্ষা করছেন সেই কুমারী কন্যা।

এখানে সমুদ্রের ধারে মাতৃতীর্থের স্নানের ঘাট। এই ঘাটে স্নান করে পরশুরামের মাতৃহত্যার পাপ স্খালন হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি মন্দির হয়েছে সমুদ্রের ধারে। আর সমুদ্রের মধ্যে বিবেকানন্দ পাহাড়ে তৈরি হয়েছে বিবেকানন্দর স্মৃতি মন্দির। নৌকায় করে সেখানে যেতে হয়।

কন্যাকুমারীর মন্দিরে প্রবেশ করতে হলে পুরুষদের জামা খুলে ধুতি পরতে হয়। বাজারের মধ্য দিয়ে মন্দিরের পথ। উঁচু গোপুর নেই, আছে নিচু গেট। তারই ধারে কোন দোকানে জামা খুলে রেখে কোমরে কাপড় জড়িয়ে মন্দিরে প্রবেশের রীতি। প্রাঙ্গনের পূর্ব দিকে সমুদ্রের ধারেও একটা দরজা আছে, কিন্তু সেটি বন্ধ থাকে। এই দরজা দিয়ে বেরিয়ে ধাপে ধাপে সমুদ্রের জলে নামা যায়। ঘাটের সামনে যে দুটি ন্যাড়া পাহাড়, তারই নাম বিবেকানন্দ পাহাড়। স্বামী বিবেকানন্দ সমুদ্র সাঁতরে ঐ পাহাড়ে উঠে তপস্যা করেছিলেন। তারই জন্য ঐ পাহাড়ও এখন তীর্থে পরিণত হয়েছে।

মন্দিরের ভিতরে ঢুকে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ ও ফুলের মালায় সাজানো হয় মন্দিরের অভ্যন্তর। ধূপ দীপ বাদ্য ও উদাত্ত মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে কন্যাকুমারীর দর্শন। চন্দনচর্চিত কঙ্কুমরঞ্জিত বালিকা মূর্তি। বসনে ভূষণে মাল্যে ও সৌরভে তাঁর অধিবাস তখন সম্পন্ন হয়েছে। শিবের আগমনের প্রতীক্ষায় দেবীর তখন মোহিনী মূর্তি। কিন্তু নিকটে যাবার উপায় নেই, পিতলের হাতল ধরে দূর থেকেই দেবীকে দেখতে হয়: তাঁর উজ্জ্বল মুখে জ্বলজ্বল করে জ্বলে দুটো হীরে, একটা কপালে ও একটা নাকে। নাকের হীরেটা মনে হয় প্রদীপের শিখার মতো কাঁপছে। এর পর সকালের দর্শন অন্য রকম। বিবাহের লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু শিব আসেন নি। সে কী অপরিসীম ক্ষোভ তাঁর। গলার মালা ছিঁড়ে ফেললেন, খুলে ফেললেন মহার্ঘ বসনভূষণ। প্রেম যাঁর ব্যর্থ হল, কী প্রয়োজন তাঁর বাহিরের আড়ম্বরে! দেবীর সেই অরক্ষণীয়া কুমারী মূর্তি সকালের দর্শনে।

কন্যাকুমারীতে বাসস্থানের কোন অভাব নেই। কেপ হোটেল, কেরালা হাউস ও মীনাক্ষী ভবন ভাল হোটেল। সরকারী রেস্ট হাউস, টুরিস্ট বাংলো, বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল গেস্ট হাউস ও ধর্মশালা আছে। কেরালার প্রধান শহর ত্রিবেন্দ্রাম ও নাগেরকয়েল থেকে বাস যাতায়াত করে। সম্প্রতি ত্রিবেন্দ্রাম থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত রেলপথও বিস্তৃত হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে কাশ্মীর রাজ্যের জম্মু শহর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত দূরপাল্লার ট্রেন চলবে।

শ্রীলঙ্কা

তন্ত্রচূড়ামণি অনুসারে শ্রীলঙ্কা একটি মহা পীঠ। সতীর নূপুর পড়েছিল এইখানে। দেবী ইন্দ্রাক্ষী ও ভৈরব রাক্ষসেশ্বর। কিন্তু শিব চরিত মতে লঙ্কা উপপীঠ এবং ভৈরবের নাম রক্ষেশ্বর। শ্রীলঙ্কা এক সময়ে ভারতের অন্তর্গত ছিল, এখন একটি স্বাধীন দেশ। এই দেশের কোন খানে এই পীঠস্থান অবস্থিত তা আবিষ্কারের অপেক্ষা রাখে।

কেরালা

ত্রিবেন্দ্রাম

কেরালা রাজ্যের প্রধান শহর ত্রিবেন্দ্রাম কন্যাকুমারী থেকে ৫৪ মাইল উত্তরে। ম্যাড্রাস ও এর্ণকুলম থেকে মিটার গেজ ট্রেন আসে। এখান থেকেও কন্যাকুমারীর বাস নিয়মিত যাতায়াত করে। সম্প্রতি ট্রেন চলতেও শুরু করেছে। মহাভারতে এই স্থানের উল্লেখ আছে। বনবাস কালে পঞ্চপাণ্ডব ত্রিবেন্দ্রামের পদ্মনাভ স্বামী দর্শন করেন। চৈতন্যদেব এই তীর্থে এসেছিলেন। রামানুজ ও যমুনাচার্য এখানে দেবতার স্তব গান করেছেন। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মার্তণ্ড বর্মা পদ্মনাভের প্রাচীন মন্দিরটির সংস্কার ও উন্নতি সাধন করেন। বিষ্ণুর অনন্তশয়ণ মূর্তি। রাজা দেবতার নামে নিজের রাজ্য উৎসর্গ করে তাঁর প্রতিনিধি রূপে রাজ্য শাসন করতেন। মুল মন্দিরটি কত দিনের পুরাতন তা জানা যায় না। কিংবদন্তী অনুসারে এটি খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর পূর্বে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরের গোপুর আয়তনে বিশাল হলেও উচ্চতায় মাত্র সাত তলা। আকারে প্যাগোডার মতো। লোকের বিশ্বাস যে চার হাজার রাজমিস্ত্রী ও ছ হাজার মজুর একশো হাতির সাহায্যে ছয় মাসে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিল। কুলশেখর মণ্ডপে তিনশো ছিয়াশিটি কারুকার্য মণ্ডিত স্তম্ভ আছে। সেগুন কাঠের ধ্বজস্তম্ভটি সোনার পাতে মোড়া। তিরিশ মাইল দূর থেকে হাতির পিঠে করে এই কাঠ আনা হয়েছিল। একটি দুর্গের কেন্দ্রস্থলে এই মন্দির অবস্থিত এবং এর সামনেই পদ্মতীর্থম নামে একটি জলাশয় আছে। মন্দিরের প্রাঙ্গণে আরও অনেক ছোট ছোট মন্দির আছে। তাতে আছেন নরসিংহ রাম কৃষ্ণ বেদব্যাস অশ্বত্থমা গণেশ হরিহরপুত্র অঞ্জনেয় ও ক্ষেত্রপাল। হরিহরপুত্র কেরালার নিজস্ব দেবতা। এদিকে প্রবাদ আছে যে সমুদ্র মন্থনের পরে বিষ্ণু যে মোহিনী মূর্তি ধারণ করে অমৃত কুম্ভ হরণ করেছিলেন, সেই মূর্তিতে শিবের সঙ্গে মিলনে এই

পুত্রের জন্ম হয়। ইনি সাস্তা ও আইয়াপ্পান নামেও পূজিত হচ্ছেন নানা স্থানে।

এই মন্দিরে প্রবেশের জন্য নানারকম কড়াকড়ি আছে। নির্দিষ্ট সময় ছাড়া প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। পুরুষদের ঊর্ধাঙ্গ অনাবৃত করতে হবে এবং প্যাণ্ট খুলে ধুতি পরতে হবে। প্যাণ্টের উপরে ধুতি জড়ালে চলবে না। রেলওয়ে স্টেশন থেকে এই মন্দির দূরে নয়। শহরে বাস ট্যাক্সি সাইকেল রিক্সা পাওয়া যায়। বাসস্থানের অভাব নেই। স্টেশনে রিটায়ারিং রুম আছে ও নিকটে একটি বিরাট সত্রম ও রেষ্টহাউসও আছে।

বর্কলা

ত্রিবেন্দ্রাম থেকে এর্ণকুলমের পথে ৩২ মাইল উত্তরে বর্কলা একটি তীর্থ স্থান। সমুদ্রের নিকটে জনার্দন মন্দিরটি একটি উঁচু টিলার উপরে। বর্কলা নামের স্টেশনে নেমে ট্যাক্সিতে বা হেঁটে মাইল খানেক পথ যেতে হয়। পথের ধারে পাথরের সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠে পাশাপাশি দুটি ছোট মন্দির। গোপুরম নেই, মণ্ডপ নেই। সমুদ্রও এখান থেকে দেখা যায় না। প্রথমটি শিবের, তার পরেরটি জনার্দনের। শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ এই মন্দিরের। জনার্দন মন্দিরের দরজার দুপাশে দুটি দ্বারপাল। ভিতরটা নাটমন্দিরের মতো প্রশস্ত। তার পরে গর্ভগৃহে জনার্দনের সুন্দর মূর্তি। কে একজন বলেছিলেন যে দক্ষিণ ভারতের একশো আটটি বিষ্ণুর মন্দিরে প্রভুর এমন সুন্দর মূর্তি আর নেই।

এই মন্দিরে জাহাজের একটা ঘণ্টা আছে। কেমন করে জাহাজের ঘণ্টা মন্দিরে এল, তার একটি অলৌকিক গল্প আছে। শিলালিপি থেকে জানা যায় যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। তার অনেক পরে বিদেশীরা এ দেশে ভাগ্যান্বেষনে আসতে শুরু করে। এই মন্দিরের দেবতা জাগ্রত বলে তখন সকলের বিশ্বাস ছিল। বিদেশীরাও এ কথা বিশ্বাস করত। একবার ওলন্দাজদের একখানা জাহাজ বর্কলার তীরে আটকে গেল। বাতাস নেই, জাহাজ নড়ে না। দিনের পর দিন

কেটে যাচ্ছে, অথচ বাতাসের অভাবে জাহাজ আছে আটকে। জাহাজের কাপ্তেন মন্দিরের জাগ্রত দেবতার কথা জানতেন। পুরোহিতের কাছে এসে চুপি চুপি বললেন, জাহাজের পালে যদি বাতাস লাগে তো জাহাজের ঘণ্টা মন্দিরে দিয়ে যাব। সাড়ম্বরে পুরোহিত দেবতার পূজা করলেন, আর বাতাসে জাহাজ দুলে উঠল। কাপ্তান ফাঁকি দেন নি, ঘণ্টাটা মন্দিরে দিয়ে গিয়েছিলেন।

বর্কলার আর একটি আকর্ষণ হল শিবগিরিতে নারায়ণ গুরুর সমাধি ও আশ্রম। তিনি বলতেন: এক জাতি, এক ধর্ম, এক ঈশ্বর। ত্রিবেন্দ্রাম ও কুইলন থেকে বাস যাতায়াত করে ও শহরে ট্যাক্সি পাওয়া যায়।

সবরি মালাই

কোট্টায়াম রেলওয়ে স্টেশন থেকে পেরিয়ার অভয়ারণ্য যাবার পথে পীরমেডের নিকটে সবরিমালাই কেরালা রাজ্যের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থানের অন্যতম। মাউণ্ট এস্টেট হয়ে এই তীর্থে যেতে হয়। শেষ দশ মাইল গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে পার্বত্য পথ। এখানে হরিহরপুত্র আইয়াপ্পানের মন্দির। খুব জাগ্রত দেবতা বলে পরিচিত।

ভাইকোম

কোট্টায়াম থেকে এর্ণাকুলমের পথে ২৩ মাইল দূরে ভাইকোম একটি শিবের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। সারা বছর এখানে যাত্রীর ভিড় থাকে। এখান থেকে কোচিন ২০ মাইল দূরে।

কালাডি

এর্ণাকুলম থেকে ত্রিচুরের পথে কালাডি শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান বলে একটি তীর্থে পরিণত হয়েছে। অষ্টম শতাব্দীতে এই অদ্বৈতবাদী মহাপুরুষ এখানে জন্মগ্রহণ করে সারা ভারতে তাঁর ধর্মমত প্রচার করে অমর হয়ে আছেন। এখন এখানে তাঁর মন্দির, সারদা দেবী ও কৃষ্ণের মন্দির দর্শনীয়।

ত্রিচুর

এর্ণাকুলম থেকে ৪৬ মাইল দূরে ত্রিচুর শহর ভড়কুনাথ শিবের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। এখানে পার্বতীর মন্দিরও আছে। এখানকার মন্দিরের গোপুরম দক্ষিণ ভারতের রীতিতে তৈরি নয়। এই গোপুরম কেরালার বৈশিষ্ট্য। দেখে এটি একটি তিনতলা বাসগৃহ বলে মনে হবে। মন্দিরের সামনে একটি দীপস্তম্ভ আছে।

গুরুভায়ুর

ত্রিচুর স্টেশন থেকে সড়ক পথে ১৮ মাইল দূরে গুরুভায়ুর কেরালার পবিত্রতম তীর্থ রূপে গণ্য। কৃষ্ণের একটি মন্দিরের জন্য এই স্থান দক্ষিণ ভারতের বহু যাত্রী আকর্ষণ করে। কিংবদন্তী আছে যে পৌরাণিক যুগে বায়ু ও দেবগুরু বৃহস্পতি এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং মন্দিরটি নির্মাণ করেন বিশ্বকর্মা। ১৫৮৮ সালে নারায়ণ ভট্টাত্রির নারায়ণীয়ম গ্রন্থ প্রকাশের পরেই এই মন্দিরের অলৌকিক ক্ষমতার কথা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বর্তমান নন্দিরটি দেড়শো বছরের বেশি পুরাতন নয়। ১৭৪৭ সালে কেরালার নিজস্ব শৈলীতে এর গোপুরম নির্মিত হয়েছে, শ্রীকোভিল ও মণ্ডপের সংস্কার হয়েছে ১৮৫৫ সালে এবং ১৮৯৩ সালে নির্মিত হয়েছে কুতম্বলম নালম্বলম প্রভৃতি মন্দিরের অন্যান্য গৃহ। গর্ভগৃহে শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী কৃষ্ণ। এই মূর্তিতে তিনি তাঁর পিতামাতা বসুদেব ও দেবকীকে দেখা দিয়েছিলেন কংসের কারাগারে এবং কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকেও এই মূর্তি দেখিয়েছিলেন। মন্দির প্রাঙ্গণে সাস্তা গণপতি ও দুর্গার ছোট ছোট মন্দির আছে। অগ্রহায়ণ মাসে গুরুভায়ুর একাদশীতে এখানে সবচেয়ে বড় উৎসব হয়। শহরে একটি টুরিষ্ট বাংলো ও কয়েকটি হোটেল আছে। মন্দির কমিটির ধর্মশালাও আছে। ত্রিচুর থেকে নিয়মিত বাস যাতায়াত করে। ট্যাক্সি পাওয়া যায়।

কর্ণাটক

মাইসোর

কর্ণাটক রাজ্যের প্রধান শহর ব্যাঙ্গালোর থেকে ৮৫ মাইল দূরে মাইসোর একটি অতি সুন্দর শহর। শহর থেকে ৮ মাইল দূরে চামুণ্ডি পাহাড়ের চূড়ায় দু হাজার বছরের প্রাচীন দেবী চামুণ্ডেশ্বরীর মন্দির। চামুণ্ডেশ্বরী দুর্গা রাজাদের কুলদেবতা। মন্দিরের গোপুরম তিনশো বছরের পুরাতন। এই সময়েই পাহাড়ের গায়ে এক হাজার সিঁড়ি তৈরি হয়েছিল। এখন মন্দির পর্যন্ত মোটরের পথ আছে। মধ্য পথে একটি বিরাট নন্দী আছে। তার গলার মালা ও ঘণ্টা একই পাথরে তৈরি।

শ্রীরঙ্গপাটনা

মাইসোর থেকে মাইল দশেক দূরে টিপু সুলতানের রাজধানী শ্রীরঙ্গ-পাটনার দুর্গের মধ্যে শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির। রঙ্গনাথের নামেই এই স্থানের নাম হয়েছে শ্রীরঙ্গপত্তন। ১১৩৩ সালে চোল রাজাদের ভয়ে রামানুজ এই দিকে পালিয়ে এসেছিলেন। হয়শাল বল্লাল বংশের জৈন রাজা বিষ্ণুবর্ধনকে তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। রাজা তাঁকে শ্রীরঙ্গ-পত্তনের সঙ্গে অষ্টগ্রাম দান করেছিলেন। রঙ্গনাথ স্বামীর মন্দিরে বিষ্ণুর বিশাল অনন্তশয়ন মূর্তি। মাইসোর থেকে এখানে বাস যাতায়াত করে। ট্যাক্সি পাওয়া যায়।

শিবসমুদ্রম

ব্যাঙ্গালোর থেকে ৭৬ মাইল দূরে শিবসমুদ্রমে কাবেরী নদী দুটি ধারায় দুশো ফুট নিচে নেমেছে। এই অরণ্যময় পরিবেশে দুটি মন্দির আছে—একটি রঙ্গনাথের ও অন্যটি শিবের। কাবেরীর দুই বাহুর মধ্যে অবস্থিত শিবসমুদ্রম একটি দ্বীপের মতো। এখানে বাসে যাতায়াত করা যায়।

শ্রবণবেলগোলা

ব্যাঙ্গালোর থেকে ৯৮ মাইল দূরে শ্রবণবেলগোলা একটি প্রসিদ্ধ জৈন তীর্থ। হাসান নামের একটি রেলওয়ে জংসন স্টেশন থেকে এ জায়গার দূরত্ব ৩২ মাইল। নিয়মিত বাস যাতায়াত করে। টুরিস্ট বাস আছে। খ্রীষ্টের জন্মের তিন চারশো বছর পূর্বে বর্ধমান মহাবীরের ছয়জন শ্রুতকেবল শিষ্যের অন্যতম ভদ্রবাহু এখানে দেহরক্ষা করেছিলেন। শোনা যায় যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তাঁর সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করবার পর ভদ্রবাহুর শিষ্য হয়ে এই দিকে এসেছিলেন। মুখোমুখি দুটি পাহাড়ের একটির উপরে ৫৭ ফুট উঁচু গোমতেশ্বরের মূর্তি যাত্রীর বিস্ময় উৎপাদন করে। উপরে উঠবার জন্য পাহাড় কেটে ধাপ তৈরি হয়েছে।

বেলুর, হালেবিড ও সোমনাথপুর

হাসান থেকে ২৪ মাইল দূরে বেলুর চেন্নাকেশব বিষ্ণু মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। হয়শাল রাজারা তিনটি প্রধান মন্দির স্থাপন করেছিলেন, তার অন্যতম এই মন্দির। হালেবিডে হয়শালেশ্বর শিবের মন্দির বেলুর থেকে ১০ মাইল দূরে এবং মাইসোর থেকে ২২ মাইল দূরে সোমনাথপুরে বিষ্ণুর মন্দির। এই মন্দির তিনটি স্থাপত্য শিল্পে ভারত বিখ্যাত। কিন্তু তীর্থ রূপে এই স্থানের মাহাত্ম্য নেই।

শ্রীঙ্গেরী

ব্যাঙ্গালোর থেকে ২০৯ মাইল দূরে তুঙ্গ নদীর তীরে শ্রীঙ্গেরী শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত মঠের জন্য বিখ্যাত। তিনি সারদাদেবীর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিদ্যাশঙ্করের আর একটি মন্দির আছে। শহরে রাত্রিবাসের জন্য কয়েকটি ধর্মশালা আছে।

তলাকাবেরী

কুর্গের একটি পাহাড়ের উপরে তলাকাবেরী একটি তীর্থস্থান। কাবেরী নদীর উৎস এইখানে। কুর্গের প্রধান শহর মার্কারা থেকে ২৪ মাইল

দূরে ভাগমণ্ডল পর্যন্ত বাস যাতায়াত করে। সেখান থেকে পাহাড়ে উঠতে হয়। মোটরের পথ আছে। একটি কুণ্ডের ধারে কাবেরীর মন্দির। অক্টোবর মাসের তুলা সংক্রান্তিতে এখানে বহু যাত্রী আসে তীর্থ স্নানের জন্য। নিকটে একটি রেস্টহাউস আছে।

উড়িপি

ব্যাঙ্গালোর থেকে ২৩৭ মাইল পশ্চিমে আরব সাগরের তীরে উডিপি কৃষ্ণের একটি মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। পুরন্দর দাস তার ভজন গানে এই স্থানের মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দ্বৈতবাদী মাধবাচার্য এখানে তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরে কৃষ্ণের বিগ্রহ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। শহরে একটি ট্রার্ভলার্স বাংলো ও হোটেল আছে। ম্যাঙ্গালোর স্টেশন থেকে নিয়মিত বাস যাতায়াত করে।

ধর্মস্থল

ম্যাঙ্গালোর থেকে ৪২ মাইল পূর্বে নেত্রবতী নদী বেষ্টিত ধর্মস্থল অনেকগুলি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য বিখ্যাত। মন্দিরের রেস্ট হাউসে সকল যাত্রী তিন দিন বিনা খরচে থাকতে ও খেতে পান।

গোকর্ণ

কারোয়ার থেকে ৩৫ মাইল দক্ষিণে গোকর্ণ পশ্চিম উপকূলের একটি তীর্থস্থান। এখানকার প্রধান মন্দিরটি মহাবলেশ্বরের। এ অঞ্চলে বারাণসীর বিশ্বনাথের পরেই তাঁর স্থান। শিবরাত্রির সময় একটি রথে দেবতার শোভাযাত্রা বেরোয়। রাত্রিবাসের জন্য একটি ইনস্পেক্সন বাংলো আছে।

বিজয় নগর

গুণ্টাকল হুবলি লাইনের হস্পেট স্টেশন থেকে ৭ মাইল দূরে তুঙ্গভদ্রার তীরে বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ। এখানে কয়েকটি দর্শনীয় মন্দির আছে। তার মধ্যে পম্পাপতি শিবের মন্দির প্রধান। এই মন্দিরের গোপুরম ১৬৫ ফুট উঁচু। ভিতরে দুটি প্রাঙ্গন আছে। এই মন্দিরে এখনও নিত্য পূজা হয়।

কিষ্কিন্ধ্যা

তুঙ্গভদ্রার পরপারে আনেগুন্দি গ্রামের নিকটে পম্পা সরোবর। পুরাকালে তুঙ্গভদ্রার নাম ছিল পম্পা। চারিদিকের পাহাড়গুলির নাম রামায়ণে বর্ণিত ঋষ্যমূক, মাল্যবন্ত ও মতঙ্গ পর্বত। এইখানেই ছিল বালির রাজ্য কিষ্কিন্ধ্যা। কিছু দূরে শবরীর আশ্রম ছিল। হস্পেট ষ্টেশনে নেমে বিজয়নগরের ভিতর দিয়ে আনেগুন্দি গ্রামে যাবার পথ।

গোয়া

গোয়ার প্রধান শহর পানাজি থেকে ১৫ মাইলের মধ্যে পোণ্ডা তালুকের সবুজ পাহাড়ে ঘেরা সুন্দর পরিবেশে শ্রীমঙ্গেশ শিবের মন্দির। তারপর শ্রীমহলসার মন্দিরে বিষ্ণুর মোহিনী মূর্তি ও আরও খানিকটা এগিয়ে শান্তদুর্গার মন্দির। এ ছাড়াও এই অঞ্চলে শ্রীরামনাথ শ্রীমহালক্ষ্মী ও শ্রীনাগেশ প্রভৃতি কয়েকটি মন্দির আছে। রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণে গোমন্তক বা গোয়ার উল্লেখ আছে। পরশুরাম সমুদ্রে তাঁর কুঠার নিক্ষেপ করে তাঁর শিশুদের বাসের জন্য এই ভূমি উদ্ধার করেন। বৃহৎ বঙ্গের ত্রিহুতবাসী সারস্বত ব্রাহ্মণেরা এখানে এই সব দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জনশ্রুতি। পানাজি থেকে টুরিষ্ট বাসে এই সব দেব মন্দির দর্শণ করা যায়।

পশ্চিমাঞ্চল

মহারাষ্ট্র

বম্বে

আরব সাগরের তীরে মহারাষ্ট্রের প্রধান শহর বম্বের নাম মুম্বই দেবী থেকে হয়েছে বলে অনেকের ধারনা। মুম্বই দেবী বা মহাঅম্বা পার্বতী ছিলেন কোলিদের দেবতা। অম্বা মানে মা। জাভেরি বাজারের নিকটে এই মন্দির এখন সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। মালাবার হিলের নিচে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাবুলনাথ শিবের মন্দির এবং মালাবার পয়েন্টে রাজভবনের অদূরে ওয়াল্কেশ্বর শিবের মন্দির। কিংবদন্তী আছে যে সীতা উদ্ধারে যাবার পথে রাম এখানে বালির শিব গড়ে পুজা করেছিলেন। বালুকা থেকে বালুকেশ্বর বা ওয়াল্কেশ্বর। বাণ তীর্থ নামে একটি পুষ্করিণীর ধারে আরও অনেকগুলি মন্দির আছে।

বজ্রেশ্বরী

বেসিন স্টেশন থেকে ২৫মাইল দূরে তমসা নদীর তীরে বজ্রেশ্বরী একটি তীর্থস্থান। বজ্রেশ্বরীতে বজ্রেশ্বরীর মন্দির, অনতি দূরে আকোলিতে শিবের মন্দির এবং গণেশপুরীতে আরও কয়েকটি মন্দির আছে। নিকটে মন্দাগ্নি পাহাড়ে পরশু রামের একটি মন্দির আছে। এই পথে তিনি দক্ষিণে মহেন্দ্রগিরি গিয়েছিলেন।

অম্বরনাথ

বম্বে থেকে ৩৮ মাইল দূরে কল্যাণের নিকটে একটি রমণীয় উপত্যকায় অম্বরনাথের সুন্দর মন্দির। একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে মন্দিরটি ৮৬০ সালে নির্মিত হয়েছিল।

নাসিক

পশ্চিম ভারতে নাসিক বারানসীর মতো বিখ্যাত। বম্বে থেকে ১১৭ মাইল পূর্বে গোদাবরী নদীর তীরে এই প্রাচীন তীর্থ। বম্বে-কলকাতা রেলপথে নাসিক রোড স্টেশন থেকে ৫ মাইল দূরে এই শহর। পাকা পুলের এপারে নাসিক, ওপারে পঞ্চবটি রামের পাদস্পর্শে তীর্থে পরিণত হয়েছে। পুরাকালে বিন্ধ্য পর্বত সংলগ্ন এই এলাকা বোধহয় দণ্ডকারণ্য নামে পরিচিত ছিল। বিধবা ভগিনী সুর্পণখাকে রাবণ এই অঞ্চলের অধিকার দিয়েছিলেন। খর ও দূষণ নামে দুই আত্মীয় রাক্ষস সুর্পনখার সেনাপতি ছিল। লক্ষ্মণ যেখানে সুর্পনখার নাক কেটেছিলেন, সেই স্থানেরই নাম হয়েছে নাসিক। নাসিকা থেকে নাসিক। কিন্তু নাসিকে এখন আর অরণ্য নেই, সঙ্কুচিত হয়ে গেছে সেকালের বিশাল অরণ্য। নাসিক ও পঞ্চবটি এখন শহরে পরিণত হয়েছে। যাত্রীরা রামকুণ্ডে স্নান করে বাণেশ্বর শিব দর্শন করে। গঙ্গার মতোই পবিত্র নদী গোদাবরী, গোদাবরীতে অস্থি বিসর্জন ও পিণ্ডদানের বিধি আছে।

নাসিকের কুশাবর্ত ঘাটে বারো বছর পর পর কুম্ভযোগ হয় চাতুর্মাস্যে। সাধারণ ভাবে বর্ষাকালকে বলে চাতুর্মাস্য, কিন্তু তিথি নিয়মে আষাঢ়ের শুক্লা একাদশী থেকে কার্তিকের শুক্লা একাদশী পর্যন্ত চার মাস হল চাতুর্মাস্য। কুম্ভের স্নান তিন দিন। শ্রাবণ মাসে বৃহস্পতির সঙ্গে মঙ্গলের এবং শুক্রের সঙ্গে সিংহ রাশির মিলনে পূর্ণ কুম্ভের স্নান। ভাদ্রের অমাবস্যায় দ্বিতীয় স্নান এবং শেষ স্নান কার্তিকের শুক্লা একাদশীতে।

শহরে কয়েকটি হোটেল আছে এবং একটি ডিস্ট্রিক্ট বাংলো। যান বাহনের কোন অভাব নেই।

পঞ্চবটী

গোদাবরীর এপারে নাসিক, ওপারে পঞ্চবটী। পঞ্চবটীতে কালা রামের বিরাট মন্দিরই প্রধান দর্শনীয়। কালো পাথরে তৈরি বেশ বড় মন্দির, নাট মন্দির তার সংলগ্ন। ধনুর্বাণ ধারী রামের দণ্ডায়মান মূর্তি

নানা অলঙ্কারে শোভিত। কষ্টিপাথরের বিগ্রহ। অনতিদূরে পাঁচটি প্রাচীন বটগাছের নিকটে সীতা গুহা। একটি পাকা বাড়ির ভিতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে ধাপে ধাপে নিচে নেমে যেতে হয়। ধাপগুলির শেষে একটি গুহার মতো ঘর, হামাগুড়ি দিয়ে তার ভিতরে ঢুকে রাম লক্ষ্মণ ও সীতার মূর্তি দেখতে হয়। পূজারীরা পয়সা নিয়ে প্রবাদ শোনান সীতা গুহার। খর দূষণের সঙ্গে রাম লক্ষ্মণের ভীষণ যুদ্ধের সময়ে সীতাকে এই গুহার মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

পশ্চিমে নদীর দিকে এগিয়ে গেলে কপালীশ্বর শিবের মন্দির। ছশো বছরের পুরনো এই মন্দিরে পঞ্চাশটি পাথরের ধাপ ভেঙে উপরে উঠতে হয়। সামনে গোদাবরীর পাথুরে বুকে নদীর তীব্র স্রোত। রাম স্নান করতেন রাম কুণ্ডে। সামনের দিকে এগিয়ে গেলে অহল্যা বাঈ-এর তৈরি তিনটি মন্দির আছে। আরও খানিকটা এগিয়ে নাড়ু শঙ্করের মন্দিরে পঞ্চবটীর শেষ।

ত্রিম্বক

নাসিক থেকে ১৯ মাইল দূরে ত্রিম্বক নামের একটি ছোট শহর ত্রিনেত্র শিব ত্র্যম্বকেশ্বরের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। বালাজী বাজীরাও এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। পিছনের দিকে ১৯০টি সিঁড়ি ভেঙে পাহাড়ের উপরে উঠলে গোদাবরীর উৎস দেখা যায়। পাথরের ছাদের নিচে একটি মূর্তির মুখ থেকে বিন্দু বিন্দু জল নিচের একটি কুণ্ডে পড়ছে। এই পবিত্র কুণ্ডে যাত্রীরা স্নান করেন এবং পূজা করেন একটি শিবের মন্দিরে।

রামটেক

নাগপুর থেকে ২৫ মাইল উত্তর-পূর্বে একটি অরণ্যময় পাহাড়ের নিচে রামটেক একটি তীর্থস্থান। পাহাড়ের উপরে একটি দুর্গের ভিতরে কয়েকটি মন্দির আছে, তার মধ্যে প্রধান হল রাম সীতা ও লক্ষ্মণের মন্দির। ছয়শো বছরের পুরাতন বলে কথিত। কিংবদন্তী আছে যে শম্বুক নামে এক

শূদ্রকে রাম এইখানে বধ করেন। শম্বুকের দেহ একটি লিঙ্গে পরিণত হয় এবং তারই উপরে নির্মিত হয় ধূম্রেশ্বরের মন্দির। অন্য কিংবদন্তী অনুসারে বিষ্ণু নৃসিংহ অবতারে হিরণ্যকশিপুকে এইখানে বধ করেন। এই জন্যই এই পাহাড়ের পাথর ভাঙলে লাল রঙ দেখতে পাওয়া যায়। অনেক তীর্থযাত্রী এই শহরে যাতায়াত করেন।

পান্ধারপুর

পুনা থেকে ১৪৭ মাইল দূরে পান্ধারপুর একটি বিখ্যাত তীর্থ। ম্যাড্রাসের পথে কুর্ডোয়াডি জংসন থেকে ন্যারো গেজ লাইনে ৩২ মাইল যেতে হয়। পুনা থেকে বাসে যাতায়াত করা যায়। ভীমা বা চন্দ্রভাগা নদীর দক্ষিণ তীরে এই শহর। নদীতে এগারোটি ঘাট ও অনেক মন্দির আছে। এই নদীও গঙ্গার মতো পবিত্র মনে করা হয় বলে মৃতের অস্থি বিসর্জন দেওয়া হয়। নদীর জলে এবং তীরে বসে যাত্রীরা পিণ্ডদান করেন। নদীর মাঝখানেও ছুটি মন্দির আছে। নৌকায় যাতায়াত করতে হয়।

বিঠ্ঠলজীর মন্দির শহরের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। বিঠ্ঠলাথ বিঠোবা পাণ্ডুরঙ্গ বা পান্ধারী কৃষ্ণের নাম। মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় যে চতুর্দশ শতাব্দে এই মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল। কষ্টিপাথরের মন্দিরের মধ্যে কষ্টিপাথরেরই বিগ্রহ। নাট মন্দির ও স্তম্ভগুলিও কষ্টি পাথরের। এটি পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বের বলে অনুমান করা হয়। যদিও এই মন্দির বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত ও ভৌগলিক সংজ্ঞায় দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত তথাপি এই মন্দিরটি উত্তর ভারতীয় স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত এবং পূজার পদ্ধতিও উত্তর ভারতের মতো। যাত্রীরা মন্দিরের গর্ভ গৃহে প্রবেশ করে দেবতাকে স্পর্শ করে প্রণাম করতে পারেন।

এই মন্দির প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। পুণ্ডলিক নামে পান্ধারপুরের এক অধিবাসী তার পিতামাতার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত। একবার তীর্থ যাত্রায় বেরিয়ে পুণ্ডলিক রোহিদাস নামে এক মুচিকে তার পিতামাতার সেবায় নিযুক্ত দেখল। তারপর রাত্রে কয়েকজন দিব্য কন্যাকে

দেখে পুণ্ডলিক তাঁদের একজনের পায়ে ধরে তাঁর পরিচয় জানতে চাইল। তিনি বললেন যে তাঁরা সবাই পবিত্র নদী, কিন্তু যাত্রীদের পাপে তাঁরা নিত্য অপবিত্র হচ্ছেন বলে রোহিদাসকে দেখে পাপ মুক্ত হতে এসেছেন। পিতামাতার সেবায় যে কত পুণ্য হয় তা বুঝতে পেরে পুণ্ডলিক দেশে ফিরে পিতামাতার সেবা করতে শুরু করল। একদিন কৃষ্ণ এলেন রুক্মিণীকে নিয়ে। কিন্তু পুণ্ডলিক তার পিতামাতার সেবা শেষ করে তাঁদের কাছে এলেন। খুশী হয়ে কৃষ্ণ এখানে চিরকাল বাস করতে রাজী হলেন। একটি ইঁটের উপরে কৃষ্ণকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল বলে তাঁর নাম হল বিঠ্‌ঠল। মূল মন্দিরের পিছনে রুক্মিণীর মন্দির। পুণ্ডলিকের মন্দিরও আছে।

অনেক বৈষ্ণব মহাপুরুষের নাম এই মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত আছে। মন্দিরের ছটি দ্বারের মধ্যে পূর্ব দিকের প্রধান দ্বারের নাম নামদেব গেট। ত্রয়োদশ শতাব্দীর এই মহাপুরুষের পিতলের একটি আবক্ষ মূর্তি এখানে আছে। জ্ঞানেশ্বর, জ্ঞানরাজ, একনাথ, তুকারাম—এঁরা সবাই এখানে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

ঘুস্মেশ্বর বা গৃষ্ণেশ্বর

জ্যোতির্লিঙ্গের এই মন্দিরটি ইলোরা গুহার নিকটে। অনেকে এঁকে বিশ্বেশ্বরও বলেন।

ভীমশঙ্কর

সহ্যাদ্রি পাহাড়ে ৩,৪০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত ভীমশঙ্কর মহারাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ তীর্থের অন্যতম। পুনা জেলার খেড থেকে ৩০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে যেতে হয়। ভীমশঙ্করে শিবের জ্যোতির্লিঙ্গ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম একটি। ভীমা নদীর উৎসের কাছে দুটি মন্দির আছে। পুরনো মন্দিরটি কালো পাথরের এবং মন্দিরে পঞ্চমুখ শিব। একটি বড় নদীও আছে। অষ্টাদশ শতাব্দে নানা ফাড়নবিশ একটি নূতন মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এটিও কালো পাথরের। শিবরাত্রির সময়ে এখানে বড় মেলা হয়।

এখানে কিংবদন্তী আছে যে ত্রিপুরাসুরকে বধ করবার পরে শিব এখানে বিশ্রামের জন্য এসেছিলেন। তাঁর দেহে ছিল বিন্দু বিন্দু ঘাম। এই সময়ে ভীমকা নামে অযোধ্যার এক রাজা তাঁর আরাধনা করতে এসেছিলেন। মৃগয়ার সময় রাজা দুজন ঋষিকে আহত করেছিলেন বলে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। শিব তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন এবং রাজার অনুরোধে তাঁর দেহের ঘাম ভীমা নদী নামে প্রবাহিত হয়েছে।

এই জ্যোতির্লিঙ্গ সম্বন্ধে শিব পুরাণের মত অন্য। ভীমশঙ্কর নামে জ্যোতির্লিঙ্গের অবস্থান কামরূপে গোহাটির নিকটে। ভীম নামে এক অসুরকে বধ করে শিব হয়েছিলেন ভীমশঙ্কর।

কোল্হাপুর

মিরাজ জংসন থেকে ৩০ মাইল পশ্চিমে পঞ্চগঙ্গা নদীর তীরে কোল্হাপুর কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। তার মধ্যে মহালক্ষ্মীর মন্দিরই সব চেয়ে প্রাচীন। এই মন্দিরের জন্য অনেকে এই শহরকে দক্ষিণ কাশী বলেন।

মধ্যপ্রদেশ

উজ্জয়িনী

ভারতের সপ্ততীর্থের অন্যতম উজ্জয়িনী মধ্যপ্রদেশের প্রধান শহর ভোপাল থেকে ১১৪ মাইল দূরে শিপ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এই প্রাচীন শহরটি অবন্তী অবন্তিকা বিশালা কুশস্থলী প্রভৃতি নানা নামে পরিচিত। স্থানীয় নাম উজ্জয়িন। এখানেও বারো বছর পর পর কুম্ভযোগ হয়। সমুদ্র মন্থনের পর অমৃত কুম্ভ যে চার জায়গায় রাখা হয়েছিল, কিংবা অমৃতের ফোঁটা পড়েছিল, তার মধ্যে হরিদ্বার প্রয়াগ ও নাসিকের সঙ্গে উজ্জয়িনীরও নাম আছে। ১৯৭২ সালে উজ্জয়িনীতে কুম্ভযোগ হয়েছিল,

আবার কুম্ভযোগ আসবে ১৯৮৪ সালে। শহর থেকে মাইল দুই দূরে সন্দীপণি মুনির আশ্রম। কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁর কাছে অস্ত্রশিক্ষা নিয়েছিলেন। পুরাকালে এই শহর জ্যোতির্বিদ্যারও কেন্দ্র ছিল। সান্দীপণি মুনির আশ্রম থেকে ২ মাইল দূরে মঙ্গলনাথের মন্দিরে হিন্দুর প্রথম দ্রাঘিমা ধরা হত। মঙ্গল ও চন্দ্রের জন্ম হয়েছিল এইখানে। বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনীতে।

উজ্জয়িনীর প্রধান আকর্ষণ এখন মহাকাল মন্দির। এই মন্দিরে শিবের জ্যোতির্লিঙ্গ। কয়েক শতাব্দীর পুরনো মন্দিরটি ইল্‌তুত্‌মিশ ধ্বংস করার পরে নূতন পাঁচতলা মন্দিরটি নির্মাণ করেছেন ইন্দোরের সিন্ধিয়া রাজা। মোটর বাস ও যানবাহন এসে যেখানে দাঁড়ায়, সে স্থানটি উঁচু। রাজপথ থেকে অনেকগুলো ধাপ নিচে নেমে মন্দিরের প্রাঙ্গন। সেখানে একটি সুন্দর তোরণ দ্বার নির্মিত হয়েছে। মন্দিরের উপর তলায় যে শিবলিঙ্গ আছেন, তিনি ওঙ্কারেশ্বর, মহাকালেশ্বরের জ্যোতির্লিঙ্গ আছেন নিচের তলায়। শ্বেতপাথরের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলেই তাঁর গর্ভগৃহ। প্রশান্ত গম্ভীর পরিবেশ। পীঠস্থানের ভৈরব ইনি। অদূরে দেবী হরসিদ্ধির মন্দির।

প্রাঙ্গনে অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির আছে। তার ভিতরে আছেন সাক্ষীগোপাল হনুমানজী স্বপ্নেশ্বর বৃদ্ধকালেশ্বর অনাদি কল্পেশ্বর প্রভৃতি আরও অনেক দেবতা। মন্দিরের পিছনে একটি চতুষ্কোন জলাশয় আছে। তার চারি ধারেও ছোট ছোট মন্দির। সেই দিকের দ্বার দিয়ে বেরোলে রুদ্র সাগর ও বড়া গনেশ। পথের ধারেই বড়া গনেশের মন্দির। ভিতরে বিশাল আকারের গনেশ বিচিত্র রঙে রঞ্জিত। দেবী ও হনুমানজীর মূর্তিও আছে।

খানিকটা এগিয়ে মহাদেবী হরসিদ্ধীর মন্দির। ইনি ছিলেন বিক্রমাদিত্যের ইষ্টদেবী। মন্দির খুব বড় নয়, গর্ভগৃহের উপরে উঁচু শিখর আছে। আর সামনে খানিকটা দূরে দুটি অদ্ভুত আকারের দীপস্তম্ভ। তন্ত্রচূড়মণির মতে উজ্জয়িনী পীঠস্থান। কিন্তু দেবীর নাম হরসিদ্ধী নয়, দেবী

মঙ্গলচণ্ডিকা। আর ভৈরবও মহাকাল নয়, তাঁর নাম কপিলাম্বর। সতীর হাতের কনুই পড়েছিল এইখানে। অনতিদূরে সন্তোষীমাতা ও হরসিদ্ধী মাতার মন্দির আছে। গোপাল মন্দির উজ্জয়িনীর চক এলাকায়।

শিপ্রা নদীতে অনেকগুলি বাঁধানো ঘাট আছে। শহরের পথ থেকে অনেক নিচে দিয়ে বয়ে গেছে নদী, সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে জলের কাছে পৌঁছতে হয়। রামঘাট খুবই প্রশস্ত। শেষ সিঁড়িটি নদীর জলে। বোধহয় কুম্ভ স্নানের জন্য এই ব্যবস্থা। নিচের একটি প্রশস্ত ধাপে দাঁড়িয়ে এক সঙ্গে বহু যাত্রী কুম্ভ স্নান করতে পারে।

উজ্জয়িনীতে অনেক হোটেল লজ ও ধর্মশালা আছে। রেলওয়ে স্টেশনে রিটায়ারিং রুমও আছে। মন্দিরে যাতায়াতের জন্য বাস ট্যাক্সি টাঙ্গা ও সাইকেল রিক্সা পাওয়া যায়।

মহেশ্বর

উজ্জয়িনী থেকে ৩৭ মাইল দূরে ইন্দোর এবং ইন্দোর থেকে ৫৪ মাইল দূরে মহেশ্বর নর্মদার তীরে একটি মন্দিরময় শহর। পুরাকালে এই স্থান কার্তবীর্যার্জুনের রাজধানী মাহিষ্মতী নামে বিখ্যাত ছিল। ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাঈ এখানে নর্মদায় অনেকগুলি ঘাট ও মন্দির নির্মাণ করেছেন। শহর থেকে মাইল দুই দূরে নর্মদা সহস্র ধারায় বিভক্ত হয়েছে। রাত্রি-বাসের জন্য এখানে একটি ইনস্পেক্সন বাংলো ও ধর্মশালা আছে। ইন্দোর থেকে বাস যাতায়াত করে।

ওঙ্কারজী

ইন্দোর-খাণ্ডোয়া লাইনের ওঙ্কারেশ্বর রোড স্টেশন থেকে ৫ মাইল দূরে নর্মদা নদীর মধ্যে একটি দ্বীপের উপরে ওঙ্কারজী নামের বিখ্যাত তীর্থ। রাজা মান্ধাতা এখানে শিবের যজ্ঞ করেছিলেন বলে এই তীর্থ মান্ধাতা নামেও পরিচিত। খরস্রোতা নর্মদা এখানে উত্তর-দক্ষিণে বইছে, দ্বীপটি মাইল দেড়েক লম্বা। তার পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্তে উঁচু পাহাড় আছে। নদী

পাহাড় গাছপালা ও মন্দিরে মান্ধাতা একটি সৌন্দর্যের আকর। ওঙ্কারজীর বিশাল মন্দির দ্বীপের পূর্ব দিকে এবং অমরেশ্বর বা মণিলেশ্বরের মূল মন্দিরটি দ্বীপের দক্ষিণে। এই মন্দিরেই শিবের জ্যোতির্লিঙ্গ। মন্দিরটি এক সময়ে অরণ্যে এমন আবৃত হয়েছিল যে তা খুঁজে না পেয়ে পুনার পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও একটি নূতন মন্দির নির্মাণ করেন। পরে জ্যোতির্লিঙ্গের এই পুরাতন মন্দিরটি আবিষ্কৃত হয়েছে। দ্বীপের পূর্ব দিকে গৌরী সোমনাথ মন্দিরের সামনে সবুজ পাথরের একটি বিশাল নন্দী আছে। কিছুকাল পূর্বে এই পাহাড় থেকে নদীতে লাফিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করা পুণ্য কাজ বলে গণ্য হত। ১৮২৪ সালে এই প্রথা বন্ধ করা হয়েছে।

ওঙ্কারজী থেকে অল্প দূরে নর্মদার উত্তর তীরে বিষ্ণুর কয়েকটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও কয়েকটি জৈন মন্দির আছে। একটি মন্দিরে বিষ্ণুর বরাহ অবতারের মূর্তি এবং সবুজ পাথরে নির্মিত বিষ্ণুর চব্বিশটি মূর্তি আছে। আরও খানিকটা দূরে চামুণ্ডি দেবীর একটি বারো হাত মূর্তি আছে।

ইন্দোর থেকে ওঙ্কারজীতে নিয়মিত বাস যাতায়াত করে।

অমরকণ্টক

কাটনি-বিলাসপুর লাইনের পেণ্ড্রা রোড স্টেশন থেকে ২৮ মাইল দূরে অমরকণ্টক মাইকাল পাহাড়ের উপরে একটি তীর্থ স্থান। ৩,৪৬৯ ফুট উঁচু এই উপত্যকার অমরকণ্টক গ্রামের নর্মদা কুণ্ডে নর্মদার উৎস। পুরাণে এর নাম তীর্থরত্ন। নর্মদা মায়ের মন্দিরটি দশম শতাব্দীর বলে লোকের বিশ্বাস। অদূরে মাঈ কি হাতি নামের একটি সুন্দর স্থানে অনেকগুলি মন্দির আছে। পুরাকালে এই স্থান অতি দুর্গম ছিল বলেই বোধহয় অমরকণ্টক নাম হয়েছে। পঞ্চপাণ্ডব এখানে এসেছিলেন এবং কালিদাসের মেঘদূতে এই স্থানের চমৎকার বর্ণনা আছে। নর্মদা কুণ্ড থেকে ৪ মাইল দূরে কপিলধারা ও দুগ্ধধারা নামে নর্মদার দুটি সুন্দর জলপ্রপাত আছে।

অনতিদূরে শোনমুড়া নামে আর একটি স্থানে শোন নদীর উৎস।

খানিকটা প্রবাহিত হয়েই এই নদী অমরকণ্টক পাহাড় থেকে জলপ্রপাতের রূপে নিচে নেমেছে। তারপর অদৃশ্য পথে অগ্রসর হয়ে পেণ্ড্রার নিকটে প্রকাশিত হয়েছে। শোন নদীও এখানে পবিত্র বলে মনে করা হয়।

অমরকণ্টকে সার্কিট হাউস, দুটি ডাকবাংলো ও কয়েকটি ধর্মশালা আছে। পেণ্ড্রারোড রেল স্টেশন থেকে অমরকণ্টকে বাস যাতায়াত করে। কাট্‌নি-বিলাসপুর লাইনে অনুপপুর জংসন থেকেও অমরকণ্টকে যাতায়াত করা যায়।

চিত্রকূট

ঝাঁসি-মানিকপুর রেল লাইনে চিত্রকূট স্টেশন থেকে সাড়ে তিন মাইল দূরে চিত্রকূট পাহাড় একটি পবিত্র তীর্থ। পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসে বেরিয়ে রাম লক্ষ্মণ ও সীতা এখানে অনেক দিন বাস করেছিলেন। কবি তুলসীদাস এখানে রামের দর্শন লাভ করেছিলেন। এই পাহাড়ের নিকটে পয়স্বিনী বা মন্দাকিনী নদীর তীরে সীতাপুর শহর। রামঘাটে রাম-লক্ষ্মণের মন্দিব এবং এই অঞ্চলে তিরিশটি মন্দির আছে। প্রধান দর্শনীয় স্থানের মধ্যে কোটি তীর্থ, দেবাঙ্গনা, হনুমানধারা, স্ফটিকশিলা, অনসূয়া, গুপ্তগোদাবরী ও ভরতকূপ। রাম নবমীতে বহু যাত্রী সমাগম হয়। অনেকে চিত্রকূট পাহাড় প্রদক্ষিণ করেন।

রাজস্থান

পুষ্কর

হিন্দুর আদিতীর্থ পুষ্কর আজমীর থেকে ৭ মাইল পশ্চিমে। বাস ট্যাক্সি টাঙ্গা সারাক্ষণ যাতায়াত করে। এই প্রসঙ্গে মহাভারতে আছে যে বনবাসী পাণ্ডবরা তীর্থ যাত্রায় বেরোবেন জেনে দেবর্ষি নারদ এসে বললেন, মহর্ষি পুলস্ত্য ভীষ্মকে বলেছিলেন যে পৃথিবীতে যে দশ কোটি হাজার তীর্থ আছে তার সবগুলির ফল পুষ্করে তিন সন্ধ্যাতেই পাওয়া যায়।

বিষ্ণু যেমন সমস্ত বেদের আদি, তেমনি পুষ্করও সমস্ত তীর্থের আদি। কেমন করে পুষ্কর তীর্থে পরিণত হল, সে সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে একটি কাহিনী আছে। পিতামহ ব্রহ্মা একদিন হাতে একটি পদ্ম নিয়ে যজ্ঞের জন্য স্থান নির্বাচনে বেরিয়েছিলেন। এই সুন্দর পার্বত্য প্রদেশে তাঁর হাতের পদ্মটি যেখানে পড়ল, যজ্ঞের জন্য ব্রহ্মা সেই স্থানটি নির্বাচন করলেন। পুষ্কর মানে পদ্ম। ব্রহ্মার হাতের পদ্ম এইখানে পড়েছিল বলে এই স্থানটি পুষ্কব নামে পরিচিত হল। পদ্মটি মাটিতে পড়বার সময় মহাশব্দ উত্থিত হয়েছিল। সেই শব্দে দেবতারা কেঁপে উঠেছিলেন। ভীত দেবতাদের ব্রহ্মা বলেছিলেন, তোমাদের ভয় নেই, বজ্রনাভ নামে রসাতলবাসী এক অসুরকে বধ করবার জন্য আমি এই পদ্ম নিক্ষেপ করেছি। সে তোমাদের বিনাশের চেষ্টা করেছিল। তার মৃত্যু হয়েছে। এখন থেকে এই তীর্থ পুষ্কর মহাতীর্থে পরিণত হবে।

পাহাড়ের উপরে একটি মালভূমির উপরে পুষ্কর অবস্থিত। তিন দিক পাহাড়ে ঘেরা একটি বিরাট জলাশয়। এর পূব দিকে আরাবল্লী পাহাড়ের অংশ নাগপাহাড় থেকে এই জলাশয়ে জল নেমে আসে। পুষ্করে সাবিত্রী ও গায়ত্রী নামে আরও দুটি পাহাড় আছে। পুষ্করের দক্ষিণে গায়ত্রী পাহাড়, তার উপরে দেবী পুরুহোতার মন্দির। শাস্ত্রীয় নাম দেবী গায়ত্রী, ভৈরব সর্বানন্দ। অনেকে এটিকে পীঠস্থান বলেন, সতীর মণিবন্ধ পড়েছিল এইখানে। তন্ত্রচূড়ামণির মতে সতীর মণিবন্ধ পড়েছিল মণিবন্ধ নামে এক স্থানে। সেখানেও দেবী গায়ত্রী ও ভৈরব সবানন্দ। দেবী ভাগবতের মতে পুষ্কর পীঠস্থান, কিন্তু দেবীর নাম পুরুহূতা। গায়ত্রী পাহাড়ের উপরে এখন একটি ভাঙ্গা মন্দির আছে, কিন্তু পূজারী নেই। পাথরেব উপরে এক সময়ে হরগৌরীর মূর্তি খোদিত ছিল, এখন তা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কেউ চামুণ্ডার মন্দির বলে, কেউ বলে পুরুতা দেবীর মন্দির। পুরুতাই পুরুহূতা বা পুরুহোতা। দেবীর হাজার আট নামের এও একটি নাম।

সাবিত্রী পাহাড়ে সাবিত্রীর মন্দির। এই নিয়ে এখানে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। ব্রহ্মার সস্ত্রীক যজ্ঞ সম্পূর্ণ করবার কথা ছিল। কিন্তু

শুভমুহূর্তে ব্রহ্মাণী সাবিত্রী এসে পৌঁছলেন না। সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে দেখে ব্রহ্মা উদ্বিগ্ন হয়েছেন, দেবতা ও ঋষিরা অপেক্ষা করছেন। উপায়ান্তর না দেখে ব্রহ্মা পুনরায় বিবাহ করে যজ্ঞ সম্পূর্ণ করবেন বলে স্থির করলেন। একটি গোপকন্যা আসছিল, তাকে গরুকে দিয়ে ভক্ষণ করিয়ে পুনর্জন্ম দেওয়া হল। সেই কন্যারই নাম হল গায়ত্রী। গায়ত্রীকে বিবাহ করে ব্রহ্মা যজ্ঞ সম্পূর্ণ করলেন। তারপর সাবিত্রী এসে যখন এই ঘটনা শুনলেন, তখন ব্রহ্মাকে তিনি অভিশাপ দিলেন যে কোনখানে তাঁর পূজা হবে না এবং নিজে গিয়ে সাবিত্রী পাহাড়ে অধিষ্ঠান করলেন।

ব্রহ্মার পূজা নিষিদ্ধ হবার অন্য কাহিনী আছে শিব পুরাণে। কে বড় আর কে ছোট, এই নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছিল ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে। ঠিক এই সময়ে একটি আলোর স্তম্ভ দুজনের মাঝখানে উঠে এল। ঠিক হল যে দুজনের মধ্যে যিনি আগে এর আদি বা অন্ত দেখে আসতে পারবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবেন। বিষ্ণু বরাহ রূপ ধারণ করে ভূগর্ভে প্রবেশ করলেন, কিন্তু আদি অন্ত নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়ে উপরে উঠে এলেন। ব্রহ্মা হংসরূপে আকাশে উড়েছিলেন। তিনি দেখলেন যে উপর থেকে একটি কেতকী ফুল পড়ছে। সেই ফুলটি নিয়ে তিনি ফিরে এসে বললেন, আমি আলোর স্তম্ভের উপর থেকে এই ফুলটি আনলাম। এই কথা বলা মাত্র স্তম্ভ অন্তর্হিত হল, আর সেই জায়গায় দেখা দিলেন শিব। তিনি ব্রহ্মাকে ধিক্কার দিয়ে বললেন, এই মিথ্যা ভাষণের জন্য তোমার পূজা বিশ্বে রহিত হবে। ব্রহ্মা অনুতপ্ত হয়ে তপস্যা করলেন দীর্ঘকাল। তারপরে স্থির হল যে শুধু এই পুষ্করেই তাঁর পূজা হবে। এখন তাই পুষ্করে ব্রহ্মার মন্দিরই সবচেয়ে বড় মন্দির। এক সময়ে নাকি ভারতের নানা স্থানে ব্রহ্মার একশো আটটি মন্দির ছিল। সে সব মন্দির কোথায় তা এখন জানা যায় না।

পদ্মপুরাণের আর এক জায়গায় পুষ্করের উল্লেখ আছে। এখানকার নাগ পাহাড় বা যজ্ঞ পর্বতের উপরে বিষ্ণু বামন অবতার রূপে অসুর বাজ

বলির পরীক্ষা করেছিলেন। রামায়ণেও আছে পুষ্করের উল্লেখ। বিশ্বামিত্র এখানে তপস্যা করেছিলেন। স্বর্গের অপ্সরা মেনকার সঙ্গে এখানেই তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। সদ্য স্নাতা সিক্ত বসনা মেনকাকে দেখে ঋষির তপোভঙ্গ হয়েছিল। দশ বৎসর তিনি এই অপ্সরার সঙ্গে সংসার করেছিলেন। তারপর শকুন্তলার জন্মের পর ফিরে গিয়েছিলেন ইন্দ্রের সভায়। কণ্ব মুনির আশ্রম ছিল নিকটে, তাই তিনি পরিত্যক্তা কন্যা শকুন্তলাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।

বিশ্বামিত্রর সম্বন্ধে আরও একটি কাহিনী আছে। বলিদানের জন্য ক্রীত শুনঃশেফ এইখানে তাঁর আশ্রয় নিয়েছিল এবং তিনি তার প্রাণ রক্ষার জন্য এইখানেই তাকে গাথা শিখিয়েছিলেন। বনবাসী রাম পুষ্করে এসে স্বর্গত পিতাকে পিণ্ডদান করেছিলেন। দশরথ নাকি সশরীরে সামনে এসে রামের হাত থেকে পিণ্ড গ্রহণ করেছিলেন। মহাভারতের যুগে যুধিষ্ঠিরও এসেছিলেন এই তীর্থ দর্শনে। পুষ্করে অগস্ত্যেরও আশ্রম ছিল।

পুরাকালে এখানে একটি সমৃদ্ধ শহর ছিল। হিন্দুদের পর বৌদ্ধ ও তারপরে জৈন অধিকার ছিল এখানে। রাজা পদ্ম সেনের সময়ে এখানে এক লক্ষ বাড়ি ছিল। শহরে কোন দরিদ্র এলে প্রত্যেক গৃহস্বামী তাকে এক টাকা দান করত। সেই টাকায় তারা ব্যবসা করত। একবার এক হিন্দু যোগী তাঁর শিষ্যকে নিয়ে এই শহরে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু হিন্দু বলে তাঁর শিষ্য কোন গৃহস্থের কাছে ভিক্ষা পেত না। বেচারা বন থেকে কাঠ কেটে শহরে বিক্রি করে কোন রকমে দিন পাত করত। একদিন সে আহত হবার পরে গুরু জানতে পারলেন যে গত বারো বছর তাঁর শিষ্য কারও কাছে ভিক্ষা পায় নি। যোগীর অভিশাপে সেই দিনই ঝড় ও বন্যায় অমন সুন্দর শহর ধ্বংস হয়ে গেল। এই ঘটনা খ্রীষ্টের জন্মেরও অনেক আগের। এর অনেক দিন পরে নবম শতাব্দে মারবাড়ের রাজা নরহরি রাও অলৌকিক ভাবে পুষ্করের সন্ধান পান। এই পার্বত্য প্রদেশে মৃগয়ায় এসে তিনি অঞ্জলি ভরে পুষ্করের জল পান করেছিলেন। তারপর আশ্চর্য হয়ে দেখেছিলেন যে তাঁর হাতের শ্বেত কুষ্ঠের দাগ মিলিয়ে গেছে।

খোঁজ খবর নিয়ে রাজা আবিষ্কার করলেন আদিতীর্থ পুষ্কর। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এই জলাশয়ের আমূল সংস্কার করে দিলেন।

এখানে কিংবদন্তী আছে যে ব্রহ্মার হাত থেকে যে পদ্মটি পড়েছিল তা মাটি স্পর্শ করেছিল তিন জায়গায়, আর তিন জায়গাতেই মাটি থেকে জল উঠে জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে। এই জলাশয়গুলির নাম জ্যেষ্ঠ মধ্য ও কনিষ্ঠ পুষ্কর। এদের ব্যবধান মাত্র তিন ক্রোশ। সরস্বতী নদীর পাঁচটি শাখা এইসব পুষ্করের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হত। ব্রহ্মা যজ্ঞ করেছিলেন জ্যেষ্ঠ পুষ্করের তীরে। দিগন্ত বিস্তৃত না হলেও নির্মল জলের বিরাট জলাশয়। চারিদিকে ঘাট ও অট্টালিকা। ঘাটে ভিজে কাপড়ে বসে যাত্রীরা পিণ্ডদান করেন। দূরে সাবিত্রী পাহাড়ের উপর সাদা মন্দিরটিও দেখা যায়। পুষ্করে ঘাটের সংখ্যা বাহান্ন, তার মধ্যে গৌঘাটই সবচেয়ে বড়। ব্রহ্মা ঘাট ও বরাহ ঘাটও ছোট নয়। পাহাড়ের উপর দিয়ে পুষ্কর পরিক্রমার পথ পাঁচ ক্রোশ। এই পথের ধারেই পঞ্চ মুনির আশ্রম—মরীচি অঙ্গিরা অত্রি পুলহ ও পুলস্ত্য। কুণ্ডের সংখ্যাও অনেক—নাগকুণ্ড গৌমুখ কুণ্ড পদ কুণ্ড পরশুরাম কুণ্ড বামদেব কুণ্ড ভৃগু কুণ্ড অগস্ত্য কুণ্ড ও কপিল কুণ্ড। এখানে চারশো মন্দিরের মধ্যে প্রধান চারটি হল ব্রহ্মার মন্দির, বরাহ মন্দির, অটমটেশ্বর শিবের মন্দির ও রঙ্গনাথ বিষ্ণুর মন্দির। অটমটেশ্বর আত্মেশ্বরের অপভ্রংশ কিনা জানা যায় না।

ব্রহ্মাঘাটের অনতিদূরে ব্রহ্মার মন্দির। রাস্তা থেকে অসংখ্য ধাপ উঠেছে। একটি ছোট দ্বারের উপরে নহবৎখানার মতো তিনটে গম্বুজ পাশাপাশি। মন্দিরে চতুর্মুখ ব্রহ্মার মূর্তি, স্থূলকায় ও রক্তবর্ণ, হংসবাহন, বামে গায়ত্রী দেবী। মন্দির প্রাঙ্গনে আরও অনেক দেবদেবী ও ঋষির মূর্তি আছে। দ্বারে ইন্দ্র ও কুবের, বাহন হস্তী, পঞ্চমুখ মহাদেব, নারদ গৌরীশঙ্কর; লক্ষ্মীনারায়ণ ও সূর্য নারায়ণ। সনন্দাদি ঋষি ও দত্তাত্রেয়। সাবিত্রী ও সরস্বতী। রঙ্গনাথের মন্দির দ্রাবিড় শিল্পকলায় নূতন তৈরি হয়েছে।

আজমের

দরগা খাজা সাহেবের জন্য আজমের একটি তীর্থ স্থানে পরিণত হয়েছে। খাজা মৈন উদ-দীন চিস্তির সমাধি স্থলে এই দরগা নির্মাণ শুরু করেন ইল্‌তুত্‌মিশ, শেষ করেন হুমায়ুন। গেটের পাশের লাল মসজিদটি আকবর নির্মাণ করেছিলেন। বুলন্দ্‌ দরওয়াজা নামে এক বিশাল গেটের নিচে দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। প্রাঙ্গণে সমাধি ছুটি মসজিদ ও মহফিলখানা আছে।

জয়পুর থেকে ৮৩ মাইল দূরে তারাগড় পাহাড়ের কোলে আজমের একটি সুন্দর শহর। এখানকার অন্য দর্শনীয় স্থান হল আড়াই দিনকা ঝোঁপড়া নামের একটি মসজিদ, আনাসাগর লেক, দৌলতবাগ, জাতুঘব ও তারাগড় তুর্গ।

আজমেরে অনেক হোটেল টুরিষ্ট-বাংলো ডাক-বাংলো প্রভৃতি আছে। স্টেশনে রিটায়ারিং রুম ও শহরে ধর্মশালা আছে। পুষ্করেও টুরিস্ট বাংলো আছে। যানবাহনের কোন অভাব নেই।

একলিঙ্গজী

একলিঙ্গজীর মন্দির উদয়পুর থেকে ১৪ মাইল দূরে কৈলাসপুরীতে। অষ্টম শতাব্দে বাপ্পা রাওল এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে বিশ্বাস। মন্দিরে কালো পাথরের চতুর্মুখ শিব, বাহিরে নন্দী।

নাথদ্বার

উদয়পুর থেকে ৩০ মাইল উত্তরে নাথদ্বারে শ্রীনাথজীর বিখ্যাত মন্দির। নাথদ্বার রেল স্টেশন থেকে এর দূরত্ব ৬ মাইল। মন্দিরে কালো পাথরের কৃষ্ণের মূর্তি। ঔরঙ্গজেব বাদশাহের অত্যাচারের সময়ে মহারাজা রাজসিংহ মথুরা থেকে এই মূর্তি এনেছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে রথে এই মূর্তি আনবার সময় এইখানে রথের চাকাগুলি হঠাৎ মাটিতে বসে যায় বলে

এইখানে শ্রীনাথজীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই মন্দিরে প্রতিদিন অসংখ্য যাত্রীর ভিড় হয়।

কাঁকরোলি

নাথদ্বার থেকে আরও ১০ মাইল দূরে কাঁকরোলিতে দ্বারকাধীশের মন্দির রাজসমন্দের তীরে একটি ছোট পাহাড়ে অবস্থিত।

চারভুজা

কাঁকরোলি থেকে ২০ মাইল পশ্চিমে চারভুজাজীর মন্দির। ইনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে যাত্রীদের বিশ্বাস।

রণকপুর

উদয়পুর থেকে ৯৫ মাইল দূরে এবং মারবাড়-আমেদাবাদ লাইনে ফল্‌না স্টেশন থেকে ২০ মাইল দূরে রণকপুর জৈন মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। চৌমুখ মন্দিরটি আদিনাথের। এ ছাড়া আরও দুটি মন্দির ও সূর্য মন্দির আছে। এই মন্দিরগুলি স্থাপত্য শিল্পে আবু পাহাড়ের দিলবাড়া মন্দিরের সঙ্গে তুলনীয়।

আবু

আবু রোড রেলওয়ে স্টেশন থেকে ১৮ মাইল দূরে ৪,০০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের উপরে আবু জৈন মন্দির দিলবাড়ার জন্য ভারত বিখ্যাত। একটি সুন্দর উপত্যকায় পাঁচটি মন্দিরের মধ্যে বিমল বসাই ও তেজপালের মন্দির দুটিই সবচেয়ে সুন্দর। শ্বেত পাথরের উপর কারুকার্য অপরূপ। বিমল বসাই মন্দিরে প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথের মূর্তি। অন্যান্য তীর্থঙ্করদের ছোট ছোট মূর্তি আছে।

শহরে বাসস্থানের কোন অভাব নেই। ট্যাক্সি ও ঘোড়া পাওয়া যায়। আবু রোড স্টেশন থেকে নিয়মিত বাস ও ট্যাক্সি যাতায়াত করে।

দেশনোক

বিকানের থেকে ১৬ মাইল দূরে দেশনোকে কর্ণিজীর মন্দিরে দেবতা জাগ্রত বলে যাত্রীদের ধারণা।

গুজরাত

অম্বাজী

আবু রোড রেলওয়ে স্টেশন থেকে ১২ মাইল দূরে অম্বাজী একটি হিন্দু তীর্থ। অরাসুর পাহাড়ে অবস্থিত এই মন্দিরে দেবীর কোন মূর্তি নেই। বস্ত্রালঙ্কারে আবৃত দেওয়ালের এক স্থানে দেবীর পূজা হয়। এই মন্দিরের অনতিদূরে কুম্ভারিয়ায় কয়েকটি জৈন মন্দির আছে। তারই নিকটে সরস্বতী নদীর উৎসের ধারে কোটেশ্বর মহাদেবের মন্দির।

ডাকোর

আনন্দ্-গোধ্রা লাইনে আনন্দ্ থেকে ১৯ মাইল দূরে ডাকোর রণছোড়জীর মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। আমেদাবাদ থেকে তিন চার ঘণ্টায় পৌঁছনো যায়। এই তীর্থে যাত্রী সমাগম দেখে বিস্মিত হতে হয়। নবরাত্রির সময় সেখানে সমারোহের অন্ত নেই। প্রশস্ত অঙ্গনের মধ্যে কারুকার্য মণ্ডিত বেশ বড় মন্দির। অঙ্গনে প্রবেশের জন্য উত্তর ও পশ্চিমে দুটি দ্বার আছে। নিকটে গোমতী সরোবর। তার অনেকগুলো ঘাট বাঁধানো। ত্রিকমজী বিষ্ণুর মন্দির আছে, আর আছে ডঙ্কনাথ শিবের মন্দির। ভক্ত বোদানোরও একটি ছোট মন্দির আছে।

এই বোদানো রণছোড়জীকে দ্বারকা থেকে ডাকোরে এনেছিলেন বলে কিংবদন্তী আছে। সে অনেক দিনের পুরনো কথা। বোদানো ছিলেন ডাকোরের এক বিষ্ণুভক্ত, প্রতি বছর দ্বারকায় যেতেন রণছোড়জীর দর্শনে। কিন্তু সাধারণ যাত্রীর মতো খালি হাতে যেতেন না। তাঁর হাতের তেলোয়

তুলসীর গাছ গজাতো, সেই তুলসীর পাতা তিনি রণছোড়জীকে নিবেদন করতেন। বছরের পর বছর পায়ে হেঁটে তিনি দ্বারকায় যেতেন, আর বুক ভরা সুখ নিয়ে ফিরে আসতেন। একদিন তিনি বুড়ো হলেন, তাঁর পা আর চলে না। তবু কোন রকমে দ্বারকায় এসে তিনি রণছোড়জীকে বললেন, এ কী হল আমার! আর কি তোমার দর্শন পাব না! গভীর রাতে স্বপ্ন দেখলেন বোদানো। রণছোড়জী তাঁকে বলছেন, ভয় কি, এবারে আমি তোমার সঙ্গেই যাব, আর এখন থেকে ডাকোরেই থাকব। বোদানোর আনন্দ আর ধরে না। ঘুম থেকে উঠে তিনি ডাকোর যাত্রা করলেন, আর রণছোড়জী চললেন তাঁর সঙ্গে। সকালবেলায় রণছোড়জীর পূজারীরা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে মন্দিরে বিগ্রহ নেই। কোথায় গেল বিগ্রহ! বোদানো চুরি করেছেন ভেবে তাঁরা তার পিছু নিলেন, সঙ্গে এক দল ব্যাধ। খুব সাংঘাতিক তাদের লক্ষ্য, একবার দেখলে আর রক্ষা নেই। দেবতা তাই স্বপ্নে আবার বললেন, গোমতী সরোবরে আমাকে লুকিয়ে রাখ। কিন্তু সরোবরের জলে বর্শার খোঁচা দিয়ে তাঁরা বিগ্রহ পেয়ে গেলেন। কিন্তু দেবতা এবারে স্বপ্নে বোদানোকে দেখা দিয়ে বললেন, ব্রাহ্মণদের বল যে তারা বিগ্রহের ওজনের সমান সোনা নিয়ে ফিরে যাবে। রাজী হলেন ব্রাহ্মণেরা, কিন্তু বোদানোর অত সোনা কোথায়! থাকবার মধ্যে ছিল তাঁর স্ত্রীর কানে এক জোড়া সোনার দুল। দেবতাকে স্মরণ করে সে তাই দিল ব্রাহ্মণদের হাতে। কষ্টি পাথরের বিরাট বিগ্রহ রণছোড়জীর। সোনার দিকে চেয়ে পূজারীরা হাসলেন। কিন্তু দাঁড়িপাল্লায় ওজন করতে গিয়ে হতবুদ্ধি হলেন তাঁরা। বিগ্রহের ওজন হল এক জোড়া দুলের সমান। তাই নিয়েই তাঁদের ফিরতে হল। আর রণছোড়জীর প্রতিষ্ঠা হল ডাকোরে।

এই রণছোড়জী নাকি পরে দ্বারকার পূজারীদেরও স্বপ্ন দিয়েছিলেন। দ্বারকার সাবিত্রী কূপে আর একটি বিগ্রহ মূর্তি পাওয়া যাবে, সেই মূর্তির প্রতিষ্ঠা হবে দ্বারকার মন্দিরে। সত্যিই একটি বিগ্রহ পাওয়া গিয়েছিল কূপের মধ্যে, আর তাই প্রতিষ্ঠা হয়েছে দ্বারকায়।

ব্রোচ বা ভৃগু কচ্ছ

বরোদা থেকে ৪৪ মাইল দক্ষিণে ব্রোচ পৌরাণিক যুগে ভৃগু কচ্ছ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মহর্ষি ভৃগুর আশ্রম ছিল এইখানে। এখন এখানে নর্মদার তীরে ভৃগুর মন্দিরই প্রধান দর্শনীয় স্থান।

শুক্লতীর্থ

ব্রোচ থেকে ১০ মাইল পূর্বে নর্মদার তীরে শুক্লতীর্থ আর একটি তীর্থ-স্থানের নাম। এখানে একটি বিষ্ণুর মন্দির আছে। উজ্জয়িনীর এক পৌরাণিক রাজা, চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য এবং অনহিলওয়াড়ার রাজা চামুণ্ডকে নিয়ে কয়েকটি কিংবদন্তী এখানে প্রচলিত আছে।

উডভাডা

বম্বে থেকে ১১১ মাইল উত্তরে উডভাডা পার্সিদের একটি তীর্থস্থান। পার্সিরা পারস্য থেকে যে অগ্নি ভারতে এনেছিলেন, সেই অগ্নিই উডভাডার মন্দিরে আজও সযত্নে রক্ষিত হচ্ছে। মন্দিরটি নূতন।

পলিতানা

সৌরাষ্ট্রে জৈনদের একটি তীর্থস্থান পলিতানা সিহোর স্টেশন থেকে একটি ব্রাঞ্চ লাইনে ১৮ মাইল দূরে। শত্রুঞ্জয় পাহাড়ের উপরে একটি মন্দিরের শহর। ২০০০ ফুট উঁচু এই পাহাড় জৈনদের পাঁচটি পাহাড়ের মধ্যে প্রধান। অন্য চারটি হল গুজরাতের গির্ণার ও তরঙ্গা, রাজস্থানের আবু ও বিহারের সমেত শিখর বা পরেশনাথ।

দ্বারকা

ভারতের একেবারে পশ্চিমের ভূখণ্ড সৌরাষ্ট্রে হিন্দুদের এই বিখ্যাত তীর্থ। কৃষ্ণের প্রথম জীবন যেমন মথুরা ও বৃন্দাবনে কেটেছে, তেমনি

শেষ জীবন কেটেছে দ্বারকায়। প্রভাসে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মহাভারতের যুগে মগধ রাজ জরাসন্ধের বারংবার আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে কৃষ্ণ মথুরা থেকে সমস্ত যাদবদের নিয়ে সৌরাষ্ট্রের এই দ্বারকায় এসে তাঁদের রাজধানী স্থাপন করেন। ভারতের সপ্ততীর্থের অন্যতম হল এই তীর্থ। কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রনাভ অলৌকিকভাবে এক রাত্রে এখানকার মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। রেলওয়ে স্টেশন থেকে এক মাইলের কিছু বেশি দূরে গোমতীর তীরে এই রণছোড়জীর মন্দির। নদীর তীর থেকে মন্দিরের চূড়া দেখা যায়। ছাপান্নটা সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠলে মন্দিরের স্বর্গদ্বার। শহরের দিকে রাজপথের উপরে যে দ্বার, তার নাম মোক্ষদ্বার। এই বিশাল মন্দিরের প্রাঙ্গনে আরও অনেক দেবদেবী আছেন, তার মধ্যে প্রদ্যুম্নের মন্দিরই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণের সমস্ত আত্মীয় পরিজনই আছেন—বলরাম অনিরুদ্ধ সত্যভামা জাম্ববতী রাধিকা ও দেবকী মাতা। আছেন রাধাকৃষ্ণ গোপালকৃষ্ণ লক্ষ্মীনারায়ণ কেশব কুলেশ্বর ও পুরুষোত্তম। মহাদেব বেণীমাধব কাশীর বিশ্বনাথ ও অম্বিকা দেবীও আছেন। আরও আছেন নবগ্রহ দুর্বাশা ও দত্তাত্রেয়। শঙ্করাচার্যের সারদা মঠ মন্দিরের সংলগ্ন।

মূল মন্দিরটি পাথরে তৈরি, পাঁচতলার সমান উঁচু। তার সূক্ষ্মাগ্র চূড়া। উপরে উঠবার জন্য সিঁড়ি আছে, কিন্তু তার জন্য অনুমতির প্রয়োজন আছে। নিচে অনেকগুলি স্তম্ভের উপরে প্রশস্ত ভোগমণ্ডপ। গর্ভগৃহে রণছোড়জীর মূর্তি দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। কষ্টিপাথরের চতুর্ভুজ মূর্তি অপরূপ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। দ্বারকাপতি রণছোড়জী বুঝি কৃষ্ণ নন, এ দ্বিভুজ মানুষ মূর্তি নয়, এ যেন দেবতা বিষ্ণুর মূর্তি। ইনি মর্ত্যের মানুষ নন, বৈকুণ্ঠের নারায়ণ।

অন্যান্য তীর্থস্থানের মতো দ্বারকায় আরও কয়েকটি মন্দির আছে। শহর থেকে মাইল খানেক দূরে রুক্মিনী দেবীর মন্দির। পাশাপাশি দুটি জীর্ণ মন্দির। সিদ্ধেশ্বর শিব আছেন শহরে, কিন্তু যেখানে আছেন তা মন্দির বলা চলে না। ভদ্রকালী ও সত্যনারায়ণও আছেন। কিন্তু এ সবের চেয়ে অনেক সুন্দর গোমতী গঙ্গার সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গমের দৃশ্য।

এখানে রাত্রিবাসের জন্য লজ ও ধর্মশালা আছে। তোতাদ্রি মঠেও থাকা যায়। স্টেশনে রিটায়ারিং রুম আছে। যানবাহন বাস টাঙ্গা ও সাইকেল রিক্সা।

নাগেশ্বর

দ্বারকা থেকে বেট দ্বারকার পথে নাগেশ্বর শিবের জ্যোতির্লিঙ্গের জন্য বিখ্যাত। কিংবদন্তী আছে যে সুপ্রিয় নামে একজন বৈশ্য নৌকায় যেতে যেতে দারুক নামে এক দৈত্যর কবলে পড়ে বন্দী হয়। বন্দী দশাতেও সে শিবের আরাধনায় রত থাকে। দারুক তাকে হত্যা করতে এলে শিব স্বয়ং তাকে পাশুপতাস্ত্রে বধ করে সুপ্রিয়কে মুক্ত করেন।

বেট দ্বারকা

দ্বারকা থেকে ২০ মাইল দূরে ওখা বন্দর হয়ে বেট দ্বারকায় যেতে হয়। ট্রেন আছে ওখা পর্যন্ত। বাসও যাতায়াত করে। স্টেশনের কাছেই সমুদ্র। এই সমুদ্রের মধ্যে ৩ মাইল গিয়ে বেট দ্বারকার তীর্থ একটি দ্বীপে। নৌকায় যেতে হয়। এই দ্বীপই ছিল কৃষ্ণের দ্বারকাপুরী। সমুদ্রের ধার থেকে মন্দিরের পথ বাজারের মধ্য দিয়ে। কিন্তু দ্বারকানাথের মন্দির কোন মন্দির বলে মনে হয় না। মনে হয় কোন বসত বাড়ি কিংবা ধর্ম-শালা। দোতলার উপরেও একটা তলা আছে, তার ঢেউ তোলা টিনের ছাদ ঢাকা পড়েছে একটা বটগাছের পিছনে। সামনে গোল খিলানের খোলা দরজা। কিন্তু ভিতরে অন্য জগৎ। চারিদিকে ঐশ্বর্য। পায়ের তলায় শ্বেত পাথরের মেঝে। আর বড় বড় দরজাগুলো সব রুপার। মূল মন্দিরে দ্বারকানাথ। তাঁকে ঘিরে আছেন তাঁর পাটরাণীরা—রাধিকা রুক্মিণী সত্যভামা ও জাম্ববতী। প্রত্যেকের আলাদা মন্দির। জাঁকজমকে কেউ কারও ছোট নন। এমন ভারি ভারি রুপার দরজা দ্বারকায় শুধু রণছোড়জীর সামনেই আছে।

এখানেও রাত্রিবাসের জন্য লজ ও ধর্মশালা আছে।

গির্ণার

জুনাগড় শহরের উপকণ্ঠে গির্ণার জৈনদের একটি তীর্থস্থান। প্রায় দু হাজার সিঁড়ি ভেঙে ২০০০ ফুট উঁচু পাহাড়ে উঠতে হয়। পর্বতের শিখর থেকে শ-খানেক ফুট নিচে একটি জৈন মন্দিরের শহর। সবচেয়ে বড় মন্দির নেমিনাথের। মল্লিনাথের মন্দিরও আছে।

পোরবন্দর

আরব সাগরের তীরে পোরবন্দর পর্যন্ত ট্রেন যায়। মহাভারতের যুগে এই স্থানের নাম ছিল সুদামাপুরী। এখনও এখানে সুদামার মন্দির আছে। এ ছাড়াও আছে শ্রীনাথ গোপীনাথ সোমনাথ কেদারনাথ, দ্বারকানাথ ও মদনমোহনের মন্দির। মহাত্মা গান্ধীর জন্মস্থান বলে এখন সমাদৃত। তাঁর কীর্তিমন্দির এখন দর্শনীয় স্থান।

সোমনাথ

সোমনাথ বা প্রভাসপত্তন বা দেবপত্তন ভেরাবল রেল স্টেশন থেকে ৩ মাইল দূরে একটি প্রাচীন তীর্থস্থান। প্রভাস শুধু শিবেরই স্থান নয়, এ স্থান বৈষ্ণবদেরও পরম তীর্থ। দ্বারকার যাদবরা এখানে খুনোখুনি করে মরবার পরে কৃষ্ণ ও বলরাম দেহত্যাগের জন্য বেছে নিয়েছিলেন এই প্রভাস তীর্থ। জীবনের শেষ কয়েক দিন কৃষ্ণ এইখানেই অতিবাহিত করেছিলেন। ভাল্কাতীর্থ ভেরাবল থেকে প্রভাসে যাবার পথে। সেখানে একটি ছোট মন্দিরের মধ্যে কৃষ্ণের মূর্তি আছে। মাটির কৃষ্ণ একটি অশ্বত্থ গাছে হেলান দিয়ে আছেন। তাঁর একটি পায়ের নিচে রক্তের দাগ। হরিণ ভেবে জরা ব্যাধ একটি বাণ মেরেছিল, সাধারণ মানুষের মতো মৃত্যু হয়েছিল তাঁর। প্রভাসে দেহোৎসর্গ নামে একটি জায়গা আছে। সেখানে তাঁর দেহোৎসর্গের স্থান নির্দেশ করা হয়। ত্রিবেণীর তীরে তাঁর সৎকার হয়েছিল। সেখানে বলদেবজীর গুহাও আছে। যোগাবলম্বন করে সেখানে বলরাম দেহত্যাগ করেন।

এ সব তো দ্বাপরের কথা। এর অনেক আগেই প্রভাস একটি পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়েছিল। দক্ষ প্রজাপতি তাঁর সাতাশটি কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন সোম বা চন্দ্রের সঙ্গে। এই কন্যাদেরই একজনের নাম রোহিণী। সবচেয়ে সুন্দরী বলে সোম তাঁকেই বেশি ভালবাসতেন। অন্য কন্যারা নালিশ করলেন পিতার নিকট। দক্ষ বললেন, এ সব চলবে না, সবার সঙ্গে সমান ভাবে বাস করতে হবে। সোম রাজি হয়েছিলেন, কিন্তু কথা রাখতে পারছিলেন না। দক্ষ ভয় দেখালেন, সাবধান, শাপ দেব। কিন্তু তাতেও কিছু হল না দেখে দক্ষ সত্যিই চন্দ্রকে ক্ষয় হবার শাপ দিলেন। চন্দ্র দক্ষের শাপ মাথা পেতে নিয়ে দিন দিন ক্ষয় হতে লাগলেন। তাঁর ক্ষয় দেখে ভয় পেলেন দেবতারা। তাঁরা গিয়ে দক্ষকে বললেন শাপ ফিরিয়ে নিতে। দক্ষ বললেন, এক শর্তে তা পারি। সব স্ত্রীকে যদি সে সমান চোখে দেখতে পারে তো সরস্বতী যেখানে সমুদ্রে মিলেছে সেই প্রভাস তীর্থে স্নান করে চন্দ্র শিবের পূজা করুক। ক্ষয় তাকে হতেই হবে। মাসের পনের দিন ক্ষয় হয়ে বাকি পনের দিনে বেড়ে সম্পূর্ণ হবে। সোম আর বিলম্ব না করে রোহিণীকে নিয়ে প্রভাসে নামলেন। তপস্যা করলেন বারো হাজার বছর। শিব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বাড়বার ক্ষমতা দিলেন, আর দিলেন প্রভা। সেই থেকেই এই স্থানের নাম প্রভাস হল। ব্রহ্মা বললেন, তোমরা শিবের মন্দির গড়। বলে মাটি ফাঁক করে দিলেন। অদ্ভুত ব্যাপার। মাটির নিচে শিবের স্বয়ম্ভু স্পর্শ লিঙ্গ। অণ্ডের মতো ছোট, কিন্তু সূর্যের মতো জ্যোতিষ্মান। নাগবলয় বেষ্টনে মধু ও দর্ভে আবৃত ছিল। তারই উপরে সোমনাথের বিরাট লিঙ্গ স্থাপন করলেন ব্রহ্মা নিজে। বৈদিক মন্ত্রে তাঁর প্রাণ পূজা হল। সোম তাঁর দুর্বলতার প্রায়শ্চিত্ত করলেন, আর পৃথিবীর মানুষ পেল এক মহাতীর্থ।

মহাভারতের নানা স্থানে প্রভাসের উল্লেখ আছে। পাণ্ডবরা তীর্থ করতে এসেছিলেন, যাদবরা এসেছিলেন ক্ষয় হতে। কৃষ্ণ বলরাম দেহত্যাগ করেছিলেন, অর্জুন এসেছিলেন সৎকারের জন্য। পরীক্ষিৎ ও জনমেজয়ও এসেছিলেন। সোমনাথের প্রথম মন্দির তৈরি হয়েছিল যীশুখ্রীষ্টের সময়ে।

তারপরে একে একে গোটা সাতেক মন্দির ধ্বংস হয়েছে। সম্প্রতি নতুন মন্দির তৈরি হয়েছে। দুশো বছর আগে রানী অহল্যা বাঈও একটি মন্দির তৈরি করে দিয়েছিলেন। পুরনো মন্দিরটি যেখানে ছিল, সেইখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নতুন মন্দির। অপরূপ সুন্দর কারুকার্য, ঠিক যেমনটি আগে ছিল তেমনি। প্রশস্ত গর্ভগৃহে বিরাট লিঙ্গ মূর্তি। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের মতো নিকটে যাবার অনুমতি নেই। দূর থেকে প্রণাম করতে হয়। অহল্যা বাঈ-এর মন্দিরে এ রকম বিধিনিষেধ নেই।

এখানে অনেকগুলি দর্শনীয় স্থান আছে। শশীভূষণ মহাদেবের মন্দিরে সোম যজ্ঞ করেছিলেন। আর জরা ব্যাধ সেখান থেকেই কৃষ্ণকে বাণ মেরেছিল। শিবের মন্দির আরও আছে—রুদ্রেশ্বর ও বাণেশ্বর। বিষ্ণু আছেন দৈত্যসূদন। কালীও আছেন—অহল্যা বাঈ-এর মন্দিরের কাছে মহাকালী আর ত্রিবেণী সঙ্গমের শ্মশান ঘাটের কাছে মহাকালিকা। সূর্যের মন্দিরটি পরিত্যক্ত। সোমনাথের মন্দিরের পিছনেই দিগন্ত প্রসারী সমুদ্র।

ভেরাবলে বাসস্থানের অভাব নেই। স্টেশনে রিটায়ারিং রুম আছে। সোমনাথে গেস্টহাউস আছে। আর ধর্মশালা আছে দু-জায়গাতেই। ভেরাবল ও সোমনাথের মধ্যে বাস যাতায়াত করে। ট্যাক্সি, অটো রিক্সা টাঙ্গাও পাওয়া যায়।

পাকিস্তান

হিংলাজ

তন্ত্রচূড়ামণির মতে একান্ন পীঠের প্রথম পীঠ হল হিংলাজ। সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র সেখানে পড়েছিল। শক্তি কোট্টরী এবং ভৈরব ভীম লোচন। মক্রান প্রদেশের মরুভূমির মধ্যে এটি একটি প্রাচীন তীর্থ। সিন্ধুর মোহনা থেকে ৮০ মাইল পশ্চিমে ও আরব সাগর থেকে ১২ মাইল উত্তরে। মক্রান ও লুথের মাঝখানে যে পাহাড়, তারই প্রান্তে হিঙ্গল নদীর পশ্চিম তীরে এই পীঠস্থান। পাহাড়ের উপরে একটি কালী মন্দির, স্থানীয় লোকে তাকে মহামায়ী বা নানী বলে।

শিবনারায়ণ স্বামী জাহাজে চেপে করাচী গিয়েছিলেন, সেখান থেকে নগর ঠাট্টা। তারপর মরুভূমি। 'সেথোর' সঙ্গে উটের পিঠে চড়ে হিংলাজে পৌঁছেছিলেন। যাতায়াতের সময় লেগেছিল বারো চৌদ্দ দিন। কিন্তু তাঁর তীর্থের বর্ণনা কিছু অন্য রকম। কালী মন্দিরের উল্লেখ নেই, আছে একটি কুণ্ডের কথা। এক মুসলমান বৃদ্ধা প্রদীপ জ্বেলে অপেক্ষা করে। যাত্রীরা স্নান সেরে বিভূতি মাখে, পরে জ্যোতি দর্শন ও দান পুণ্য করে ফিরে আসে।

এ অঞ্চল এখন আর ভারতে নেই। ভারত বিভাগের পর পাকিস্তান স্বাধীন দেশ হয়েছে। ভারতীয় যাত্রী আর কখনও বোধহয় সহজে এ তীর্থে যেতে পারবেন না।

উত্তরাঞ্চল

দিল্লী

দিল্লী ভারতবর্ষের রাজধানী। এখানে বাঙালীদের প্রতিষ্ঠিত কালী-বাড়ি ও বিড়লাদের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির আছে বটে, কিন্তু দিল্লীকে তীর্থস্থান বলা হয় না।

পাঞ্জাব

অমৃতসর

দিল্লী থেকে ২৭০ মাইল দূরে অমৃতসর শিখদের একটি পবিত্র তীর্থ। চতুর্থ গুরু রামদাস ১৫৭৭ সালে এই শহর পত্তন করেন। আকবর বাদশাহের কাছে জমি পেয়ে তিনি একটি পুষ্করিণী ও মন্দির নির্মাণ শুরু করেছিলেন। তাঁর পুত্র গুরু অর্জন দেবের আমলে এই কাজ সম্পূর্ণ হয়। পুষ্করিণীর নাম হয় অমৃত সরোবর বা অমৃতসর ও মন্দিরে স্থাপন করা হয় ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থসাহেব। এরই চারিধার ঘিরে গড়ে ওঠে অমৃতসর শহর। পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ এই মন্দিরের শিখর সোনার পাতে মুড়ে দিয়েছিলেন।

সুন্দর একটি প্রবেশ পথ দিয়ে স্বর্ণ মন্দিরের প্রাঙ্গনে পৌছতে হয়। মন্দিরটি জলাশয়ের মাঝখানে, মার্বল পাথরের সেতু দিয়ে প্রাঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত। তিন তলা মন্দির, তার উপরে সোনার গম্বুজ। এই সরোবরের ধারেই শিখ ধর্মের পীঠস্থান অকল তখ্‌ৎ—একটি মার্বল পাথরের বেদীর উপরে স্মৃতি সিংহাসন। বাবা অটলের স্তম্ভ তিনশো গজ দূরে। সুন্দর একটি বাগানের মধ্যে এই ন'তলার সমান আটকোনা স্তম্ভটি ১৫০ ফুট উঁচু। বাবা অটল রায় ছিলেন ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের পুত্র। কোন অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য গুরু তাঁকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। সেই দুঃখে অটল রায় এইখানে প্রাণত্যাগ করেন। এই স্তম্ভের সামনে কৌলসর নামের

একটি পবিত্র সরোবর আছে। নিকটেই গুরু রামদাসের সরাই। দরিদ্র ভোজনের ব্যবস্থা আছে সেখানে।

লোহাগড় গেটের বাহিরে একটি সুন্দর হিন্দু মন্দির আছে। দুর্গার মন্দির বলে তা দুর্গিয়ানা মন্দির নামে পরিচিত। শিখদের স্বর্ণ মন্দিরের অনুকরণেই এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে শ্বেত পাথরে। সমস্ত ধর্মের ভারতীয়র কাছে জালিয়ানওয়ালাবাগও একটি তীর্থস্থান। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় দেড় হাজার নিরীহ মানুষ এখানে প্রাণ হারিয়েছিল।

শহরে বাসস্থানের অভাব নেই। হোটেল ধর্মশালা আছে, স্টেশনে রিটায়ারিং রুমও আছে। যানবাহন আছে অপর্যাপ্ত—বাস টাঙ্গা ট্যাক্সি ও সাইকেল রিক্সা।

তরন তরন

অমৃতসর থেকে ১৫ মাইল দক্ষিণে শিখদের একটি তীর্থস্থান তরন তরন। গুরু অর্জন এখানে বাস করতেন। একটি গুরুদ্বারের জন্য এই শহর এখন বিখ্যাত। রণজিৎ সিংহ গুরু রামদাসের সম্মানে এখানে একটি সরোবর ও মন্দির নির্মাণ করেন।

গৈণ্ডোয়াল

অমৃতসর থেকে অনতিদূরে গৈণ্ডোয়াল গ্রামে বাস করতেন গুরু অমরদাস। সেখানে তিনি একটি গুরুদ্বার স্থাপন করেছিলেন।

খাতুর সাহেব

অমৃতসর থেকে ২০ মাইল দক্ষিণ পূর্বে খাতুর সাহেবে রণজিৎ সিংহ দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদের সমাধি নির্মাণ করেছেন।

ডেরা বাবা নানক

অমৃতসর থেকে ৩৪ মাইল উত্তরে ডেরা বাবা নানকে বাস করতেন গুরু নানক। গুরু নানক মক্কায় যে চোলা বা পোষাকটি পেয়েছিলেন,

সেটি এখানে বেদীদের তৈরি মন্দিরে রক্ষিত আছে। রাণী চাঁদ কাউর মন্দিরের একাংশ সোনার পাতে মুড়ে দিয়েছেন। নিকটে আর একটি মন্দির আছে, তার নাম তাহ্‌লি সাহেব।

ফতেগড় সাহেব

সিরহিন্দের ৪ মাইল দূরে ফতেগড় সাহেব একটি শিখতীর্থ। এখানে গুরু গোবিন্দ সিংহের মা ও দুটি নাবালক পুত্রের স্মৃতিতে একটি মন্দির নির্মিত হয়েছে। সির্‌হিন্দের মুসলমান শাসনকর্তা বালক দুটিকে জীবন্ত অবস্থায় দেওয়ালে গেঁথে হত্যা করে। আর এই মর্মান্তিক ঘটনায় প্রাণ-ত্যাগ করেন গুরুর মা। এই ঘটনার স্মরণে প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে একটি মেলা হয়। মাইল খানেক দূরে যেখানে তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়েছিল সেখানে একটি গুরুদ্বার প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

কর্তারপুর

জলন্ধর থেকে ৯ মাইল দূরে কর্তারপুরে গুরু অর্জনের নামে একটি সুন্দর গুরুদ্বার আছে। কিংবদন্তী আছে যে এখানকার একটি গাছের গুঁড়ির ভিতরে বাস করত একটি দৈত্য। তার জন্য গুরু অর্জন পঞ্চাশ ফুট উঁচু লম্বা চন্দন কাঠের একটি স্তম্ভ পুঁতেছিলেন। সেটি এখন থামজী নামে পরিচিত।

সুলতানপুর লোধি

কপুরতলা থেকে ১৬ মাইল দূরে সুলতানপুর লোধি শিখদের একটি তীর্থস্থান। অনেকগুলি গুরুদ্বারের মধ্যে বের সাহেব একটি প্রধান গুরুদ্বার। গুরু নানক এখানে তাঁর প্রথম জীবন কাটিয়েছিলেন।

আনন্দপুর সাহেব

চণ্ডীগড় থেকে ভাক্‌রা ড্যাম যাবার পথে ৫০ মাইল দূরে আনন্দপুর সাহেব শিখদের একটি প্রধান তীর্থ। শতদ্রু নদীর তীরে এই শহর,

পিছনে নয়না দেবী গিরিশ্রেণী। গুরু তেগবাহাদুর এই শহর পত্তন করেন এবং গুরু গোবিন্দ সিং এখানে খাল্‌সা ধর্ম প্রবর্তন করেন পাঁচজন শিখকে নিয়ে। তিনি যে চারটি তখ্‌ৎ স্থাপন করেন, তার একটি এখানে। গুরু তেগবাহাদুরের বাসভবনের নাম গুরু কা মহল। গুরু তেগবাহাদুরের ছিন্নমুণ্ড যেখানে সমাধিস্থ হয়, সেখানে এখন গুরুদ্বার তেগবাহাদুর। যে পাহাড়ের উপরে খাল্‌সা ধর্ম প্রবর্তন হয়েছিল, সেখানে স্থাপিত হয়েছে গুরুদ্বার কেশগড়। এই শহরে আরও অনেক গুরুদ্বার আছে। হোলির সময় আনন্দপুর দেখবার প্রশস্ত সময়। হোলা মহল্লা নামে কৃত্রিম যুদ্ধ দেখবার মতো উৎসব। এখানে হোটেল, রেস্টহাউস ও সরাই আছে। চণ্ডীগড় থেকে বাসে বা ট্রেনে আসা যায়।

কিরাতপুর

আনন্দপুর সাহেব থেকে ২ মাইল দূরে কিরাতপুরে ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

নয়না দেবী

নয়না দেবী গিরিশ্রেণীর একটি শিখরে নয়না দেবীর হিন্দু মন্দির। সাত মাইল পথে সাত হাজার ফুট উঠতে হয়। এই দেবীর কাছে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায় বলে সকলের ধারণা। দশেরা ও চৈত্রের মেলায় বহু যাত্রী এখানে আসে। আনন্দপুর সাহেব থেকেই নয়না দেবী যেতে হয়।

হরিয়ানা

কুরুক্ষেত্র

দিল্লী থেকে ১০০ মাইল দূরে অমৃতসরের পথে কুরুক্ষেত্র হিন্দুদের একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থের অন্যতম বলে গণ্য হত। পৌরাণিক রাজা কুরু এখানে তপস্যা করেছিলেন বলে এ জায়গার নাম হয়েছে কুরুক্ষেত্র। গীতার জন্ম এই কুরুক্ষেত্রে এবং গীতায় এই স্থানকে ধর্মক্ষেত্র বলা হয়েছে। প্রাচীন

বিশ্বের বৃহত্তম যুদ্ধ হয়েছিল এইখানে। সত্যযুগে যেমন পুষ্কর, দ্বাপরে তেমনি কুরুক্ষেত্র। এখন এই স্থান একটি তীর্থ। কয়েকটি বৃহৎ সরোবর আছে। তিন মাইল দূরে বাণগঙ্গা একটি জলাশয়। কিংবদন্তী আছে যে শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীষ্মের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য অর্জুন বাণ নিক্ষেপ করে পাতাল থেকে যে জল তুলেছিলেন, সেই জলই বাণগঙ্গা। অনেকগুলি মন্দির আছে। আট মাইল পরিধির ভিতরে তীর্থের সংখ্যা নশো পঁয়ষট্টি। সূর্য গ্রহণের সময়ে এখানে মেলা হয়। স্টেশনের নিকটে ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও কয়েকটি ধর্মশালা আছে। টাঙ্গা ও সাইকেল রিক্সা পাওয়া যায়।

গোপাল মোচন

আম্বালা জেলায় জগাধরি থেকে ১২ মাইল উত্তরে গোপালমোচন একটি তীর্থ স্থান। একটি সরোবর আছে। তার নিকটে মাটির নিচে ধ্বংসাবশেষ ও দেবতার কয়েকটি সুন্দর মূর্তি পাওয়া গেছে। গোপাল-মোচনের নিকটে ঋণমোচন নামে আর একটি সরোবর আছে। কার্তিক মাসে এই গ্রামে বড় মেলা বসে।

মনসা দেবী

আম্বালা জেলার মনিমজরা থেকে কয়েক মাইল দূরে মনসা দেবীর মন্দির। এই মন্দির সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। চৈত্র মাসের উৎসবে অগনিত যাত্রী এখানে আসে।

কোট্‌লা নিহাঙ্গ ও চমকৌর

আম্বালা জেলার রূপার শহরের কাছে কোটলা নিহাঙ্গ ও চমকৌর শিখদের তীর্থস্থান। আনন্দপুর থেকে গুরু গোবিন্দ সিং যখন মোগলদের ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন কোট্‌লা নিহাঙ্গের পাঠানদের কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন। তারা রহস্য করে একটা চুনের জলন্ত ভাঁটা দেখিয়ে

দিয়েছিল। গুরু সোজা গিয়ে সেখানে ঢুকে পড়তেই আগুন তৎক্ষণাৎ নিবে যায়। এখান থেকেই গুরু চমকৌর গিয়েছিলেন বলে দু জায়গাতেই এখন অনেক গুরুদ্বার হয়েছে।

হিমাচল প্রদেশ

কাংড়া

পাঠানকোট থেকে ৫১ মাইল দূরে কাংড়া উপত্যকায় কাংড়া একটি প্রাচীন শহর। এর নাম ছিল নগরকোট বা ভবন। বাণগঙ্গা নদীর তীরে প্রাচীন দুর্গটির এখন ভগ্ন দশা। কিন্তু পাহাড়ের উপরে বজ্রেশ্বরী বা মাতা দেবীর মন্দিরের জন্য কাংড়া এখনও বিখ্যাত। মন্দিরের প্রাঙ্গণে কয়েকটি ছোট মন্দির আছে, আর পিছনে দূর দিগন্তে ধ্যান গম্ভীর ধবলাধার পর্বত। গজনির সুলতান মামুদ চতুর্থবার এসে এই মন্দির লুণ্ঠন করে পেয়েছিলেন সাত লাখ সোনার দিনার, কয়েক শো মন সোনা ও রূপা, আর অপর্যাপ্ত হীরা মুক্তা প্রবাল ও অন্যান্য রত্ন। বর্তমান মন্দিরটি নতুন। এপ্রিল ও অক্টোবর মাসে এখানে নবরাত্রির মেলা বসে। শহরে ডাকবাংলো ও রেষ্টহাউস আছে। এখান থেকে কাংড়া ও কুলু উপত্যকার সর্বত্র বাস যাতায়াত করে।

জ্বালামুখী

কাংড়া থেকে ২১ মাইল দক্ষিণ পূর্বে জ্বালামুখী একটি পীঠস্থান। সতীর জিহ্বা পড়েছিল এইখানে, আর এখনও তা জ্বলছে। একটি ছোট পাহাড়ের উপরে মন্দির, পায়ে হেঁটে উপরে উঠতে হয়। মন্দিরে সোনার গম্বুজ ও শিখর এবং রূপার দরজা পাঞ্জাবের শিখ রাজাদের দান। গর্ভগৃহে কোন মূর্তি নেই। একটি কুণ্ডের জলে ও দেওয়ালের গায়ে আগুনের শিখা। ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিলেও আবার জ্বলে ওঠে। এরই নাম জিহ্বা পীঠ। দেবী অম্বিকা ও ভৈরব বটকেশ্বর বা উন্মত্ত। অবিশ্বাসীরা বলে, পাহাড়ের কোন গ্যাস এই ভাবে জ্বলছে। শান্ত ও গম্ভীর এই মন্দিরের পরিবেশ। মেলা বসে এপ্রিল ও অক্টোবর মাসে।

যাত্রীদের জন্য পাহাড়ের নিচে বিরাট ধর্মশালা আছে। বাসে যাতায়াত করতে হয়।

বৈজনাথ

কাংড়া উপত্যকায় ৪,১৫০ ফুট উঁচুতে বৈজনাথ শহরটি বৈজনাথ শিবের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। মন্দিরের প্রবেশ পথে গঙ্গা যমুনা ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি। কম করেও ষোলটি মন্দির আছে এই ছোট শহরটিতে। রাত্রিবাসের জন্য একটি রেস্টহাউস আছে। বাসে যাতায়াত করতে হয়।

জম্মু ও কাশ্মীর

জম্মু

পাঠানকোট থেকে ৬৫ মাইল দূরে জম্মু পর্যন্ত: এখন ট্রেন আসে। শহরের কেন্দ্রস্থলে রঘুনাথ রামের মন্দির ঘিরে আরও অনেক দেবদেবীর মন্দির আছে। এখানকার মন্দির-স্থাপত্য একটু স্বতন্ত্র ধরনের।

শ্রীবৈষ্ণো দেবী

জম্মু থেকে ৩৬ মাইল দূরে শ্রীবৈষ্ণোদেবী তীর্থ। এই স্থানের উচ্চতা ৫,৩০০ ফুট। প্রায় একশো ফুট দীর্ঘ একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে দেবীর গুহায় প্রবেশ করতে হয়। দেবী মূর্তির নিচে থেকে চরণগঙ্গা নদীর উৎপত্তি হয়েছে। প্রথম নবরাত্রির পর থেকে আড়াই মাস কাল যাত্রীরা এই তীর্থে আসেন। তাঁদের জন্য সরাই আছে এখানে।

ক্ষীর ভবানী

শ্রীনগর থেকে ১৫ মাইল দূরে ক্ষীর ভবানী হিন্দুদের একটি তীর্থস্থান। পার্বতীর নাম এখানে ক্ষীর ভবানী। মন্দির প্রাঙ্গনে যে কুণ্ড আছে, তার জলের রঙ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়—গোলাপী থেকে লাল সবুজ হলদে সাদা। বৈশাখ মাসে মেলা বসে এই তীর্থে।

অমরনাথ

কাশ্মীর রাজ্যে অমরনাথ হিন্দুর শ্রেষ্ঠ তীর্থগুলির অন্যতম। শ্রীনগর থেকে ৬০ মাইল দূরে পহলগাম শহর থেকে এই তীর্থের দূরত্ব ২৮ মাইল। ১২,৭২৯ ফুট উচ্চে একটি বিরাট গুহার ভিতরে তুষারের শিবলিঙ্গ, চন্দ্রকলার সঙ্গে তার ক্ষয় বৃদ্ধি, শ্রাবণী পূর্ণিমায় পূর্ণাবয়ব।

সত্য যুগে হিমালয়ে ভ্রমণরত মহর্ষি ভৃগু স্বয়ম্ভু তুষার লিঙ্গের প্রথম দর্শন পেয়েছিলেন। কাশ্মীর তখন তক্ষক নাগের রাজত্ব। মহর্ষি কশ্যপ তার আগে জলদৈত্য ধ্বংস করে এই উপত্যকা বাসোপযোগী করে গিয়েছিলেন। ভৃগু একটি দণ্ড তক্ষকের হাতে দিয়ে বলেছিলেন, অমরনাথের দুর্গম তীর্থযাত্রার জন্য এই অভয় দণ্ড রাখো। এই দণ্ড নিয়ে যাত্রা করলে পথে কোন বিপদ হবে না।

আজও কাশ্মীরের ধর্মার্থ সংঘের মোহান্ত একটি রৌপ্য দণ্ডের অধিকারী। তার প্রচলিত নাম ছড়ি। প্রতি বছর শ্রাবণের শুক্ল পঞ্চমীতে এই ছড়ি সামনে নিয়ে অমরনাথ যাত্রা আরম্ভ হয়। সারদা পীঠের শঙ্করাচার্য থাকেন সকলের আগে। দেশ দেশান্তর থেকে যাত্রীরা এসে শ্রীনগরে আমিরা কদলের নিকটে দশনামী আখড়ায় সমবেত হয়। কাশ্মীর রাজ্য সরকার পথ ঘাট ও পুল মেরামত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করেন। ধর্মার্থ বিভাগের কর্মীরা দশ হাজার যাত্রীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যথাসাধ্য আয়োজন করেন।

শ্রীনগর থেকে শুধু সাধু সন্তরাই ছড়ি নিয়ে যাত্রা করেন, আর সামান্য কিছু যাত্রী। আর সবাই মোটর বাসে পহলগামে চলে যান। পহলগাম থেকে দ্বাদশীর দিনে যাত্রা। এই যাত্রার একটা উদ্যোগ পর্ব আছে। তাঁবু চাই, রান্নার সরঞ্জাম খাদ্যদ্রব্য গরম কাপড় বিছানা ওষুধপত্র, সব চাই। সবই ভাড়া পাওয়া যায়। আর তা বহন করবার জন্য আছে কুলি ও ঘোড়া। পয়সা থাকলে নিজেও ঘোড়ায় চেপে কিংবা মানুষের কাঁধে বা ডাণ্ডিতে চেপে যাওয়া যায়।

পহলগামের উচ্চতা ৭,২০০ ফুট। সেখান থেকে ৮ মাইল দূরে প্রথম পড়াও চন্দনবাড়ি সাড়ে ৯ হাজার ফুট উঁচু। এই পর্যন্ত জীপ গাড়ি চলে। একটি রেস্টহাউস ও পাঁচটি শেড আছে। কাশ্মীরের শৌখিন যাত্রীরাও পহলগামে এসে চন্দনবাড়ির আইস ব্রীজ দেখে যান। তারপর লোকালয় শেষ হয়ে গেলে উপত্যকাও সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। এক দিকে নীল গঙ্গা ও অন্য দিকে পাহাড়। পায়ে চলার পথ সরু ও অসমতল। একজনের পিছনে আর এক জনকে চলতে হয় সতর্ক ভাবে। প্রথমে ঘোড়া চলে, তার পিছনে তাদের রক্ষী, সবার পিছনে যাত্রী। চন্দনবাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিকটা এগোলেই পাহাড়ের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। দেড় হাজার ফুটের একটা চড়াই। পিছল পথ, পা হড়কালেই গড়িয়ে একেবারে নিচে পড়তে হবে। ঘোড়া নয়, ডাণ্ডি নয়, নিজের পা দুখানাই সব চেয়ে নিরাপদ। এই চড়াইএর নাম পিসু ঘাঁটির চড়াই। এই নাম কেন হল, তা নিয়ে একটা কাহিনী আছে। দেবতাদের সঙ্গে দানবদের যুদ্ধ হয়েছিল এইখানে। পাহাড়ের উপরে দেবতারা অমরনাথের ঘাঁটি আগলাচ্ছেন, আর নিচে থেকে দানবরাও বলছে যে তারাও অমরনাথ দর্শনে যাবে। দু দলে তুমুল যুদ্ধ বাধল। কিন্তু দেবতারা উপরে, দানবদের তাঁরা পিষে ফেললেন। সেই থেকে এই জায়গার নাম হল পিসু ঘাঁটি। প্রায় বারো হাজার ফুট উঁচু।

তারপরে কুট্টি ঘাঁটির চড়াই পার হয়ে ১১,৭৩০ ফুট উঁচুতে শেষ নাগ হ্রদ। চন্দনবাড়ি থেকে দূরত্ব ৭ মাইল। চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা এই সুন্দর জলাশয়টি জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি পর্যন্ত বরফে আবৃত থাকে। এখান থেকেই বেরিয়েছে শেষনাগ নদী। দেড় মাইল দূরে ওয়াবযানে আছে একটি টুরিস্ট হাট ও পাঁচটি শেড। কেউ বলে বায়ুজান, কেউ বলে ভাও-জান। একটা খোলা মাঠ, তার চারিদিকের পাহাড় কিছু দূরে। তাই সারাক্ষণ প্রবল বাতাস বয়। লোকে বলে, এ জায়গাটা আরও অশান্ত ছিল। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এক শিবভক্ত দৈত্য এখানে বাস করত। দেবতারা তার অত্যাচারে ছিল কাতর। তাই বিষ্ণু শেষনাগকে পাঠিয়েছিলেন তার বধের জন্য। সেই দৈত্যের মৃত্যুর পরেই জায়গাটা কিছু শান্ত হয়েছে।

ওয়াবযান থেকে পঞ্চতরণী সাড়ে সাত মাইল দূরে। উঁচু নিচু পথ তুষারপাতের জন্য পিছল হয়ে থাকে। দু হাজার ফুটের চড়াই পার হতে হয়। চোদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে মহাগুনস এই পথের সব চেয়ে উঁচু জায়গা। নিঃশ্বাসে টান ধরে, অনেকে বমি করে, ফিরেও যায় অনেকে। শুধু মনের জোরেই পৌঁছতে হয় মহাগুনসের শীর্ষে। সেখানে বসে আছেন নগরপাল, বাবা অমরনাথের দ্বারপাল। তাঁর কাছে অনুমতি নিয়ে যাত্রীদের এগোতে হয়। নগরপাল মন্দিরের কোন দেবতা নন, বিরাট এক শিলাখণ্ড। লোকে বলে, এক ঋষি এই পাহাড়ের মাথায় চারিদিকের শোভা দেখতে বসেছিলেন। তুষারে আবৃত শিলা হয়ে এখনও বসে আছেন। নানা রঙের ফুল ফোটে তাঁর চারিধারে। তার পরে আর চড়াই নেই। একে একে পাঁচটি নদীর বালি আর জল পেরিয়ে পঞ্চতরণীর প্রশস্ত মাঠ। চারটি শেড আছে এইখানে। পহলগাম থেকে এ জায়গার দূরত্ব ২৩ মাইল। বিদেশীরা ঘোড়ায় চেপে এক দিনেই আসেন, আর তীর্থযাত্রীরা আসেন তিন দিনে। যাঁরা দুবেলা হাঁটতে পারেন, তাঁরা আসেন দুদিনে।

লাদাখের সীমান্ত এখান থেকে ৯ মাইল দূরে। সোনমার্গ থেকে লাদাখের পথে অমরাবতী নদীর তীরে তীরে এখানে পৌঁছবার একটি দ্বিতীয় পথের অন্বেষণ চলছে। সে পথটি বর্তমান পথের মতো দুর্গম হবে না বলে অনেকের বিশ্বাস।

পঞ্চতরণী হল অমরনাথের পথে শেষ পড়াও। ১২,৭২৯ ফুট উঁচুতে অমরনাথে তো মানুষ থাকে না, তাই সকাল বেলায় যাত্রা করে ফিরে আসতে হয় অমরনাথ দর্শনের পর। যাতায়াতে দশ মাইল পথ। প্রথমে ভৈরব ঘাট পাহাড়, তারপর অমরনাথ পাহাড়, মাঝখানে অমরাবতী নদী। বরফের পুলের উপর দিয়ে এই নদী পেরোতে হয়, নিচে নদীর স্রোত। কেউ জুতোর নিচে কাঁটা লাগায়, কেউ ঘাসের চাপালি বাঁধে জুতোয়। তারপর হাতের লাঠি ঠুকে সন্তর্পণে নদী পেরোয়। এই অমরাবতী মিলেছে অমর গঙ্গার সঙ্গে। তার সাদা জল দেখে অনেকে দুধ গঙ্গা বলে। তারপর খানিকটা চড়াই ভেঙে অমরনাথের বিরাট গুহা দেখতে পাওয়া যায়।

এত বড় গুহা সচরাচর দেখা যায় না। চওড়া প্রায় ৫০ ফুট, আর ২৫ ফুট উঁচু। গুহার মুখ থেকে কুড়ি-পঁচিশ ফুট তফাতে অমরনাথের তুষার লিঙ্গ প্রায় তিন ফুট উঁচু। তাঁর দুদিকে আরও দুটি বরফের স্তূপ আছে, পার্বতী ও গণেশ রূপে তা পূজিত। আর দুটি পায়রা আছে। শিবের অনুচর নন্দী ও ভৃঙ্গী এখানে পায়রার রূপে অমর হয়ে আছেন। এরও একটি কাহিনী আছে। শিবের সঙ্গে পার্বতীর বিবাদ বাধাবার জন্য দেবর্ষি নারদ পার্বতীকে বলেছিলেন শিবের গলার মুণ্ড মালাটির কথা জানতে। পার্বতীর প্রশ্ন শুনে শিব বললেন, এ তোমার জন্মের হিসেব। পার্বতী বললেন, তবে আমাকে অমর কর না কেন? শিব বললেন, এক শর্তে পারি। আমি সারা রাত গল্প বলব, তুমি 'হুঁ' বলবে জেগে। কিন্তু গভীর রাতে পার্বতী ঘুমিয়ে পড়লে দরজার বাইরে থেকে নন্দী ও ভৃঙ্গী 'হুঁ' দিতে লাগলেন। দিনের আলোয় শিব দেখলেন পার্বতী ঘুমিয়ে পড়েছেন, আর সারা রাত 'হুঁ' দিয়েছেন নন্দী ও ভৃঙ্গী। পার্বতীর বদলে তাঁরাই হলেন অমর, আর এই কাহিনী যাতে প্রকাশ হয়ে না যায় তার জন্যে তাঁদের পায়রা করে দিলেন।

অমর গঙ্গায় স্নান করে যাত্রীরা অঞ্জলি ভরে বনফুল তোলেন, পূজা করেন অমরনাথের। কেউ হাসেন, কেউ কাঁদেন, কেউ বা দাঁড়িয়ে থাকেন স্তম্ভিত হয়ে। প্রাণান্তকর পরিশ্রমের ফল পেয়েছেন তাঁরা। জীবন তাঁদের সার্থক হয়েছে। এক অভূতপূর্ব আনন্দ নিয়ে তাঁরা ফিরে আসেন।

উত্তর প্রদেশ

মথুরা

দিল্লী থেকে আগ্রার পথে মথুরা ৯৮ মাইল দূরে অবস্থিত। পুরাণের মতে মধুরাপুর বা মধুপুর স্থাপন করেন মধু দৈত্য। রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন মধুর অত্যাচারীর পুত্র লবনাসুরকে বধ করে মথুরা জয় করেন। পুরাকালের মধুরা নাম মথুরায় পরিণত হয়েছে। কৃষ্ণের জন্মের পর থেকে এই নগর সপ্ততীর্থের অন্যতম বলে গণ্য হচ্ছে। এইখানে কংসের কারাগারে জন্ম হয়েছিল কৃষ্ণের। চারি দিক তাঁর বাল্য লীলার স্মৃতি বিজড়িত। গজনির সুলতান মামুদ এখানকার মন্দির লুণ্ঠন করে পেয়েছিলেন পঁচিশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের পাঁচটি সোনার বিগ্রহ মূর্তি। ষষ্ঠ মূর্তিটি ছিল ১১২০ পাউণ্ড ওজন সোনার, এতে একটি নীলা ছিল সাড়ে তিন পাউণ্ড ওজনের। রূপার বিগ্রহ মূর্তি ছিল একশোটি, তার এক একটির ওজন চার শো পাউণ্ড। এই সমস্ত বিগ্রহের মূল্য তিরিশ লক্ষ পাউণ্ডের কম ছিল না।

এখন এই শহরের কেন্দ্রস্থলে দ্বারকাধীশ মন্দির। গোয়ালিয়রের এক বনিক ১৮১৪ সালে এটি নির্মাণ করেন। অদূরে যমুনার নিকটে সতী বুর্জ। অম্বরের রাজা বাহরমলের মৃত্যুর পর তাঁর রাণী স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন দেবার পর তাঁদের পুত্র ভগবানদাস ৫৫ ফুট উঁচু এই বুর্জ নির্মাণ করে-ছিলেন ১৫৭৪ সালে। কয়েক পা উত্তরে এগোলেই যমুনার ঘাট। একটি বাঁধানো পথের ধারে পাশাপাশি অনেকগুলি ঘাট ও চবুতরা। এর মধ্যে প্রধান হল বিশ্রাম ঘাট। কংসবধের পর কৃষ্ণ এই ঘাটে বিশ্রাম নিয়ে-ছিলেন। সন্ধ্যার সময়ে যমুনার আরতি হয় এই ঘাটে।

কিংবদন্তী অনুসারে কংসের কারাগার ছিল কাটরায়। খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে শকরাজা সুদাম এখানে কৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার পর চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য যে মন্দির নির্মাণ করেন, সেটি ধ্বংস করেন গজনির মামুদ। ১১৫০ সালে মহারাজা বিজয় পালের নির্মিত মন্দিরটি

ধ্বংস হয় সিকান্দার লোদির আক্রমণে। তারপর ১৬১৩ সালে রাজা বীর সিংহ যে মন্দির নির্মাণ করেন, ঔরঙ্গজেব তা ধ্বংস করে একটি ইদ্‌গা প্রতিষ্ঠা করেন। এখন এই স্থান কৃষ্ণ জন্মস্থান নামে পরিচিত। এর একাংশে সেই ইদ্‌গা এখনও আছে, অন্য অংশে নির্মিত হয়েছে কেশব দেবের একটি ছোট মন্দির ও কৃষ্ণ চবুতরা। ভাগবত ভবন নামে একটি চমৎকার গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে এসেছে।

বৃন্দাবন

মথুরা থেকে বৃন্দাবন ৬ মাইল দূরে। এই পথের ধারেই গীতা মন্দির। মথুরা থেকে ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেন আছে। বাস ট্যাক্সি টেম্পো টাঙ্গা সাইকেল রিক্সাতেই যাতায়াত করা যায়। সবাই বলেন, বৃন্দার বন থেকে বৃন্দাবন। কিন্তু বৃন্দার অনেক মানে। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত হল রাধা, যাঁর অনেক বৃন্দা বা সখী ছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এই মানে। কিন্তু অনেকে বলেন যে কেদার রাজের কন্যা বৃন্দা এইখানে তপস্যা করে কৃষ্ণকে পেয়েছিলেন। আবার অনেকে রাজা কুশধ্বজের কন্যা তুলসী ওরফে বৃন্দার নামও করেন। তুলসীও তপস্যা করে হরিকে পেয়েছিলেন এই ক্ষেত্রে।

বসুদেবের পরামর্শে নন্দ মথুরা ত্যাগ করে বৃন্দাবনে এসেছিলেন। গোপ গোপীদের নিয়ে গাছের নিচে রাত কাটাবার পর রাতারাতি বৃন্দাবনের পত্তন হয়। বিশ্বকর্মা এক রাতে এই নগর নির্মাণ করেন। মুসলমান আমলে বৃন্দাবনের সব কিছু লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বাঙলার শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণের লীলাস্থল দেখতে এসে কেঁদে আকুল হয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন রূপ ও সনাতন গোস্বামী। দীর্ঘ দিন ব্রজ মণ্ডলে বাস করে সমস্ত তীর্থস্থানগুলি তাঁরা উদ্ধার করেছিলেন।

মথুরা থেকে মাইল দশেক দূরে মধুবন। এই রকম দ্বাদশ বন উপবন প্রভৃতি আছে। পরিক্রমায় বেরোলে সব দেখতে পাওয়া যায়। বহুলা গাভীর নামেও বন আছে। বহুলা ছিল ধার্মিক মানুষের মতো। প্রবাদ

ঘাটের মধ্যে চীর ঘাট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ঘাটে কৃষ্ণ গোপীদের বস্ত্র হরণ করেন। আজও তার নিশানা আছে গাছের ডালে ডালে। যাত্রীরা পয়সা দিয়ে নানা রঙের কাপড়ের টুকরো কিনে গাছে বেঁধে দিয়ে যায়।

ঘাটের মতো বট আছে। অক্ষয় বটের জন্মের হিসেব নেই, আর বংশী বটের নিচে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ বাঁশি বাজাতেন। তারপরে কুঞ্জ আর বন। নিকুঞ্জবনে বাঁদরের অত্যাচার, দু পয়সার ছোলা না নিয়ে গেলে নিস্তার নেই। কুঞ্জবন রাধাকৃষ্ণের লীলা ক্ষেত্র। সেখানকার গাছপালা যেন মাটির সঙ্গে লুটিয়ে আছে। ছোট একটি মন্দিরও আছে, তার মধ্যে ললিতা ও বিশাখা সখীর সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ। সবাই বলেন, এ বড় জাগ্রত মন্দির। আজও প্রতি রাত্রে কৃষ্ণ এখানে রাধারাণীর সেবা নিতে আসেন। সন্ধ্যাবেলার আরতির পর এক ঘটি জল আর দাঁতন সাজিয়ে রেখে পূজারীরা চলে যান। রাতে মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ। সকালে এলে দেখা যায় যে শুধু শয্যারই ব্যবহার হয় নি, দাঁতনে দাঁত মেজে ঘটির জলে কেউ মুখ ধুয়ে গেছে। পূজারীর কাছে দর্শনী দিয়ে যাত্রীরা এর প্রমাণ দেখে যায়। শোনা যায়, এ কথা বিশ্বাস হয় নি আকবর বাদশাহের। তাই তিনি নিজের চোখে দেখতে এসেছিলেন। কী দেখেছিলেন তিনিই জানেন, কিন্তু তাঁরই আমলে বৃন্দাবন গড়ে উঠেছিল। তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামীও ছিলেন এইখানে। সর্বত্যাগী পুরুষ, যমুনার জলে ফেলে দিয়েছিলেন স্পর্শমনি। তানসেনের সঙ্গে আকবর বাদশাহ যখন এসেছিলেন, তিনি বাদশাহকে সম্মান না করে শিষ্যকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। আকবর অসামান্য পুরুষ ছিলেন, তাই একটুও ক্ষুন্ন না হয়ে প্রচুর ভূসম্পত্তি দিয়েছিলেন স্বামীজীকে।

মথুরা ও বৃন্দাবনে বাসস্থানের অভাব নেই। মথুরা স্টেশনে রিটায়ারিং রুম আছে, শহরে হোটেল ও রেস্টহাউস প্রভৃতি আছে। ধর্মশালা আছে মথুরা ও বৃন্দাবন দুজায়গাতেই। দিল্লী আগ্রা প্রভৃতি শহর থেকে বাস যাতায়াত করে। সব রকম যানবাহন পাওয়া যায়।

প্রয়াগ এলাহাবাদ শহরের উপকণ্ঠে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে অবস্থিত। কলকাতা থেকে দূরত্ব ৫০৫ মাইল এবং দিল্লী থেকে ৩৯১ মাইল। পুরাকালে এলাহাবাদ শহরটাই প্রয়াগ নামে পরিচিত ছিল। খুব প্রাচীন শহর। এখানে গঙ্গা ও যমুনা মিলেছে সরস্বতীর অদৃশ্য ধারার সঙ্গে। তাই এখানে ত্রিবেণী সঙ্গম। ১৫৮০ সালে আকবর এ জায়গার নাম রাখেন ইলাহাবাদ।

মহাভারতে ঋষি পুলস্ত্য বলেছেন যে ব্রহ্মা এখানে পুষ্করের মতো বিরাট যজ্ঞ করেছিলেন। যাগ শব্দ থেকে প্রয়াগ। প্রয়াগের নিকটে ছিল কুমার বন। বৈবস্বত মনুর পুত্র সুদ্যুম্ন সেই বনের নিষিদ্ধ স্থানে গিয়ে নারী হয়ে যায়। তার নাম হয় ইলা। চন্দ্রের পুত্র বুধের সংস্পর্শে এসে ইলার যে পুত্র হয়, তারই নাম পুরূরবা। শিবের বরে ইলা এক মাস পুরুষ ও এক মাস নারীর জীবন যাপন করতেন। রামায়ণের যুগে এ স্থান অরণ্যময় ছিল। ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম ছিল এইখানে। রাম এই পথে বনবাসে গিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর আত্মীয় পরিজনের মৃত্যুতে যুধিষ্ঠির বড় বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। মার্কণ্ডেয় ঋষি তখন বারাণসীতে। তিনি তাড়াতাড়ি হস্তিনাপুরে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে প্রয়াগে আসবার উপদেশ দিয়েছিলেন। শুধু পাপ স্খালন হবে না, মানসিক শান্তিও ফিরে পাওয়া যাবে। প্রয়াগ মহাপীঠ, সতীর হস্তাঙ্গুলি পড়েছিল এখানে। দেবী কমলা ও বেণীমাধব ভৈরব।

প্রয়াগে তীর্থযাত্রার যে নিয়ম আছে তার মধ্যে প্রধান হল পদব্রজে যাত্রা, আর দ্বিতীয় হল মাথা মুড়োবার নিয়ম। পাপ চুলের গোড়া আশ্রয় করে বলেই মাথা মুড়োবার নিয়ম হয়েছে। কিন্তু যাত্রীদের অনেকে এখানে মাথা মুড়োলেও পদব্রজে আর কেউই আসেন না। এলাহাবাদে এখন ছোট ও বড় লাইনের দুটো রেল স্টেশন। প্রয়াগ নামেও একটি ছোট স্টেশন আছে। সেখান থেকে এক্কা টাঙ্গা সাইকেল রিক্সায় চেপেই

সবাই ত্রিবেণী সঙ্গমে যায়। একখানা নৌকা ভাড়া করে দুই নদীর সঙ্গমের দিকে এগোতে হয়। আকবর বাদশাহের তৈরি দুর্গের ধার দিয়ে যমুনা বয়ে যাচ্ছে, আর গঙ্গা নেমে আসছে অন্য ধার থেকে। যমুনার জল নীল, আর গঙ্গার জল রূপোর মতো সাদা। দুই রঙের ধারা মিলেও যেন রঙ বদলায় না। যত দূর দেখা যায়, সাদা আর নীল জল যেন পাশাপাশি বয়ে যায়। যাত্রীরা অক্ষয় বট দেখেন, দেখেন পাতালপুরী মন্দির। ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম আর নেই, লোকে বলে যে সেই আশ্রমের উপরেই এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

সম্রাট হর্ষবর্ধন প্রয়াগে পঞ্চবার্ষিক মহোৎসব করতেন। গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলের পশ্চিম দিকের ময়দানকে বলা হত দান ক্ষেত্র বা সন্তোষ ক্ষেত্র। সম্রাট তাঁর রাজকোষের ঐশ্বর্য এনে এইখানে স্তূপীকৃত করতেন। নানা দেশ থেকে আসত হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ও দরিদ্র নারায়ণ। অকৃপণ হাতে সম্রাট দান করতেন। এখন কেউ দান করতে বা দান নিতে আসে না, এখন আসে কুম্ভ স্নান করতে। সমুদ্র মন্থনের পর অমৃত কুম্ভ এখানেও রাখা হয়েছিল কিংবা দেবাসুরের কাড়াকাড়ির সময়ে এক বিন্দু অমৃত পড়েছিল এখানেও। তাই বারো বছর পর পর এখানে পূর্ণ কুম্ভ হয়। আর ছ বছর পর অর্ধ কুম্ভ। যাত্রীদের জন্য তখন বিশেষ ব্যবস্থা হয়। ১৯৭৮ সালের মকর সংক্রান্তিতে এখানে পূর্ণ কুম্ভ যোগ হয়েছিল, আবার হবে ১৯৯০ সালে। অর্ধকুম্ভ হবে ১৯৮৪ সালে।

বিন্ধ্যাচল

এলাহাবাদ থেকে কলকাতার দিকে ৮০ কিমি দূরে বিন্ধ্যাচল। সতীর বাম পদাঙ্গুলি পড়েছিল বিন্ধ্যশেখরে, দেবী বিন্ধ্যাবাসিনী ও ভৈরব পুণ্য-ভাজন। মন্দির একটি ছোট পাহাড়ের উপরে। সঙ্কীর্ণ পথ এঁকে বেঁকে উপরে উঠেছে। ঘর বাড়ির ভিতর দিয়ে পথ। এই পথ মিলেছে মন্দিরের সদর রাস্তার সঙ্গে। তার দুধারে দোকান পাট, যাত্রীর ভিড়, পূজার উপকরণ ও মিষ্টান্নের দোকান, পাথরের বাসন ও বাঁশের লাঠি।

মন্দিরের অন্য ধারে খানিকটা দূরে গঙ্গার ধারা অনেক নিচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। বাঁধানো সিঁড়ি আছে গঙ্গার ধার পর্যন্ত। যাত্রীরা গঙ্গায় স্নান করে মন্দিরে পূজা দিতে উঠে আসেন।

মন্দিরটি বড়ো নয়। তার প্রাঙ্গনও ছোট। সামনের দরজাটি প্রবেশের পথ নয়, যাত্রীরা দেবীর দর্শন করে এই পথে বেরিয়ে আসেন। অন্য ধারে একটি সঙ্কীর্ণ দরজা দিয়ে গর্ভগৃহে ঢুকতে হয়, তার জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হয় যাত্রীদের। কোন বিশেষ তিথিতে দেবীর দর্শন একটা কঠিন কাজ।

বামন পুরাণে আছে যে সহস্রাক্ষ ইন্দ্র দুর্গাকে বিন্ধ্য পর্বতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আর দেবতাদের পূজা পেয়ে তিনি বিন্ধ্যবাসিনী নামে বিখ্যাত হয়েছেন। যে চণ্ডী আমাদের ঘরে ঘরে পাঠ হয়, তার কাহিনী আমাদের সবারই জানা। দুর্গা-মূর্তিতে দেবী মহিষাসুর বধ করেছিলেন, বধ করেছিলেন চণ্ড মুণ্ড রক্তবীজ শুম্ভ নিশুম্ভকে। দেবী পুরাণের মতে এই যুদ্ধ হিমালয়ে হয়েছিল, কিন্তু অন্য পুরাণের মতে এই যুদ্ধ হয়েছিল বিন্ধ্যাচলে।

বিন্ধ্যাচলে আর একটি মন্দির আছে লোকালয় থেকে দু আড়াই মাইল দূরে একটি জনহীন পাহাড়ের উপরে। দেবীর নাম অষ্টভুজা। অনেক অলৌকিক কাহিনী শোনা যায় স্থানীয় লোকের মুখে। টাঙ্গায় এসে পাহাড়ের পাদদেশে নামতে হয়, তারপর ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভেঙে উপরে ওঠা। ছোট একটি প্রাঙ্গনের প্রান্তে দেবালয়, মন্দির নয়। ছোট একটি গুহার মধ্যে আছেন অষ্টভুজা দেবী। প্রবেশের পথ সঙ্কীর্ণ। মাথা নিচু করে ঢুকতে হয়, দাঁড়াবার স্থানও সঙ্কীর্ণ। দেওয়ালের গায়ে দেবীর মূর্তি। বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গাই বোধহয় এখানে অষ্টভুজা নামে পরিচিত।

পাশে আর একটি গুহা মন্দির আছে। তাতে প্রবেশের পথ আরও সঙ্কীর্ণ। অত্যন্ত সন্তর্পণে শরীর ও মাথা বাঁচিয়ে দেবীর দর্শন করতে হয়। দেবীর নাম মহাকালী। মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী আছেন অন্যত্র। পাহাড়ের উপরে কয়েকটি কুণ্ড আছে—সীতা কুণ্ড ব্রহ্ম কুণ্ড ও অগস্ত্য কুণ্ড।

বিন্ধ্যাচলের এই গুহার ভিতরে নাকি অনেক দূর যাওয়া যায়। কিংবদন্তী আছে যে বহু দিন আগে তিনজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন এই গুহায় প্রবেশের জন্য। দেবীর পূজারী তাঁদের বাধা দিয়ে বলেন যে গুহার ভিতরে প্রবেশ করতে হলে মির্জাপুর থেকে সরকারী অনুমতি পত্র চাই। সন্ন্যাসীরা নিজের দায়ীত্বে এই কাজ করছেন, এই মর্মে একটি দলিলে সই করে সরকারী অনুমতি আনেন। তারপর তাঁরা ঢুকলেন গুহার মধ্যে। কিছু দূর অগ্রসর হতে না হতেই একজন সন্ন্যাসীর মৃত্যু হল। তবু সাহস করে অন্য দুজন এগিয়ে গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত গিয়ে এক অপরূপা কন্যার সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি দোলনায় দুলছিলেন, আর তাঁর সখীরা তাঁকে ব্যজন করছিল। সন্ন্যাসীদের দেখতে পেয়ে কন্যা বললেন, কী চাও তোমরা? তাঁরা বললেন, আপনাকে দর্শনের জন্যই এসেছি। দেবী বললেন, তাহলে ফিরে যাও। আর সাবধান, এ সব ক '। কাউকে বোলো না। সন্ন্যাসীরা বাইরে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু সহসা একজনের বাক্ রোধ হয়ে গেল। তাঁর বোধহয় বাসনা হয়েছিল এই কথা প্রচার করবার। আর একজনের বাক্ রোধ হল পরে, তৃতীয় ব্যক্তির কাছে এই কাহিনী প্রকাশ করবার পাপে।

আর একটি অলৌকিক কাহিনী এখানে প্রচলিত আছে। এক বালক মায়ের সামনে নিত্য চণ্ডীপাঠ করত। কিন্তু তার পাঠ কিছু অশুদ্ধ হত। তাই দেখে এক পণ্ডিত তাকে মূর্খ বলে গাল দিলেন। রাতে সেই পণ্ডিত স্বপ্ন দেখলেন যে দেবী তাঁকেই মূর্খ বলছেন, আর পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হলে দেবী তাঁর কুষ্ঠ হবে বলে শাপ দিলেন। প্রভাতে উঠে পণ্ডিত দেখলেন যে তাঁর সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ হয়েছে, আর যন্ত্রণার যেন শেষ নেই। নিকটে এক ব্রহ্মচারী বাস করতেন। পণ্ডিত তাঁর কাছে গিয়ে সব কথা জানালেন। ব্রহ্মচারী বললেন, এক কাজ কর, গরম ঘৃতে তুলসী পাতা ভিজিয়ে সেই ঘৃত মায়ের দেহে লাগাও। পণ্ডিত এই কাজ করে অনেক আরাম পেলেন। তারপরে ব্রহ্মচারী বললেন, এইবার চন্দনে তুলসীপাতা ভিজিয়ে সেই চন্দন মাখাও মায়ের গায়ে। পণ্ডিত ভাবলেন, মায়ের

পাথরের দেহে চন্দন না মাখিয়ে নিজের দেহে মাখলেই তো আরও আরাম হবে। পণ্ডিত এবারে তাই করলেন। ব্রহ্মচারী এ কথা জেনে বললেন, সর্বনাশ! মায়ের দেহ পাথরের, এই তোমার বিশ্বাস হলে তুমি কি আর বাঁচবে! সত্যি সত্যিই পর দিন পণ্ডিতের মৃত্যু হল।

কাশী/বারাণসী

কাশী হিন্দুর শ্রেষ্ঠ তীর্থ। উত্তর প্রদেশের পূর্ব প্রান্তে কলকাতা ও দিল্লীর প্রায় মধ্য পথে গঙ্গার তীরে এই তীর্থ সপ্ততীর্থের অন্যতম। কাশীকে পৃথিবীর প্রাচীনতম শহর ব্যাবিলন প্রভৃতির সমসাময়িক বলে মনে করা হয়। রামায়ণ ও মহাভারতে এর উল্লেখ আছে। পুরাণের মতে খ্রীস্টের জন্মের বারো শো বছর আগে সুহোত্র পুত্র কাশ্য এই নগর পত্তন করেছিলেন। রাজ্যের নামও ছিল কাশী। খ্রীস্টের জন্মের ছ-সাত শো বছর আগে এটি কোশল রাজ্যের অধীন হয়।

গঙ্গা কলি যুগের প্রধান তীর্থ, কাশীর প্রধান আকর্ষণের অন্যতম। গঙ্গা এখানে অর্ধচন্দ্রের আকারে উত্তর বাহিনী এবং তার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বাঁধানো ঘাট ও মন্দিরে পূর্ণ। প্রত্যেকটি ঘাটের একটা নাম আছে, আর তার সঙ্গে কোন ঘটনার স্মৃতি আছে জড়িয়ে। নৌকায় চেপে একটু দূরে গেলে শহরের দুই প্রান্ত এক সঙ্গে দেখা যায়। পশ্চিম বাহিনী অসি নদী যেখানে গঙ্গায় পড়েছে, সেই খানেই অসি ঘাট জন বিরল। কোন বাঁধানো ঘাট নেই, নেই কোন সমারোহ। এই ঘাট থেকে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া যায়। আর সেখানকার নতুন বিশ্বনাথের মন্দিরের সাদা চূড়া দেখতে পাওয়া যায়। উত্তর বাহিনী গঙ্গা পূর্ব দিকে হেলেছে। শহর যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখানে গঙ্গার উপরে মালব্য সেতু। একই পুলের উপর দিয়ে ট্রেন ও মোটর প্রভৃতি যানবাহন মোগলসরাই জংসন থেকে যাতায়াত করে। পুলের নিচেই রাজঘাট কাশী স্টেশনের সংলগ্ন। মাটির ঘাট। শহর এখানে শেষ হয়েছে বলে মন হয়, কিন্তু পঞ্চ ক্রোশী কাশী পরিক্রমার শেষ এখানে নয়। আরও কিছু দূর গিয়ে বরুণা সঙ্গম

ঘাট। দক্ষিণমুখী বরুণা এঁকে বেঁকে এসে গঙ্গায় যেখানে মিশেছে, সেইখানেই পঞ্চতীর্থের শেষ। অসি ও বরুণার সঙ্গমের মধ্যে অবস্থিত বলেই কাশীর অন্য নাম বারাণসী। কাশীর প্রধান রেল স্টেশনের নামও বারাণসী।

সমগ্র বারাণসী এই গঙ্গার ঘাটে স্পন্দিত হচ্ছে। অবিচ্ছিন্ন শহর ঘাটে ঘাটে সংলগ্ন হয়ে এক আশ্চর্য দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেকটি ঘাটের সঙ্গেই নানা রকমের কিংবদন্তি জড়িত আছে। শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের পরে অসি ঘাটে পড়েছিল দুর্গার অসি। শিবালা ঘাটের উপরে এক দুর্গে বাস করতেন রামনগরের রাজা চৈৎ সিং। পৌরাণিক রাজা হরিশ্চন্দ্রের নামে কাশীর শ্মশান ঘাট। কেদার ঘাটে কেদারনাথের প্রতিষ্ঠা। রাজা মানসিংহ নির্মাণ করেছিলেন মান সরোবর ঘাট। উদয়পুরের রাণার রাণা ঘাট, অহল্যা বাঈএর ঘাট। আর সবচেয়ে পবিত্র দশাশ্বমেধ ঘাট। ব্রহ্মা এখানে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। মুসলমানদের মীর ঘাটের পর ধরম স্তুপ। ললিতা ঘাট থেকে নেপালী মন্দির দেখতে হয়। জলশায়ী বিষ্ণুর নামে জলশাই একটি শ্মশান ঘাট। তার পাশেই মণিকর্ণিকা। পার্বতীর মণি কুণ্ডল পড়েছিল এইখানে। দশাশ্বমেধের পরেই এর স্থান। দত্তাত্রেয় ঋষির নামে দত্তাত্রেয় ঘাট, সিন্ধিয়া ঘাট, ভোঁসলা ঘাট, মানসিংহের তৈরি পঞ্চগঙ্গা ঘাট। এই ঘাটের উপরেই বিন্দু মাধব বা বেণীমাধবের মন্দিরের উপরে ঔরঙ্গজেব একটি মসজিদ নির্মাণ করেছেন। গায় ঘাট ত্রিলোচন ঘাট প্রহ্লাদ ঘাট পেরিয়ে রাজঘাট। নৌকোয় চেপে এইসব ঘাট দেখতেই একটা দিন সময় লাগে। দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকটেই বিশ্বনাথের মন্দির।

বিশ্বনাথ গলির মতো পথ এ দেশে বোধহয় নেই। সঙ্কীর্ণ গলি, দুধারে নানা পণ্যের দোকান ক্রেতা ও বিক্রেতার কলরবে সারাক্ষণ মুখর। এই পথের ধারেই ঢুণ্ডি গণেশ সাক্ষী বিনায়ক শুক্রেশ্বর ও শনৈশ্চরের মন্দির। পথের ধারে জুতো খুলে অন্নপূর্ণার মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকতে হয়। প্রাঙ্গণের চারিধারে দোতলা গৃহ, মাঝখানে অন্নপূর্ণার ছোট মন্দির। সুন্দর

কারুকার্য করা কয়েকটি স্তম্ভের উপরে গম্বুজাকৃতি ছাদ দেখতে নাট মন্দিরের মতো, তারই সঙ্গে সংলগ্ন গর্ভগৃহে অন্নপূর্ণার মূর্তি। বিশ্বেশ্বরের আদেশে মা অন্নপূর্ণা সমস্ত কাশীবাসীকে অন্নদান করছেন। অন্নাভাবে কাশীতে কারও মৃত্যু হয় না। অন্নকূট মায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব। এই মন্দির প্রাঙ্গণে আরও চারটি ছোট মন্দির আছে সূর্য গণেশ গৌরীশঙ্কর ও হনুমানের।

খানিকটা এগিয়ে বিশ্বনাথের মন্দির। পথ এমন সঙ্কীর্ণ যে বাহির থেকে প্রাচীর ও দরজা ছাড়া মন্দিরের আর কিছু দেখা যায় না। মন্দিরের চূড়া দেখতে হলে সামনের কোন গৃহের দোতলায় উঠতে হয়। পাশাপাশি দুটি শিখরের মাঝখানে একটি গম্বুজ। সবচেয়ে বাঁ ধারের শিখর মহাদেবের মন্দিরের উপরে, পাশের গম্বুজটি সোনার পাতে মোড়া, বিশ্বনাথের মন্দিরের শিখরও সোনার। দুশো বছর আগে এই মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছেন ইন্দোরের রাণী অহল্যা বাঈ। পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ মন্দিরের চূড়া তামার পাতের উপরে সোনায় মুড়ে দিয়েছেন। মন্দিরের ভিতরে একটি সুন্দর ঘণ্টা দিয়েছেন নেপালের মহারাজা।

মূল মন্দিরে বিশ্বনাথের লিঙ্গমূর্তি। আরও অনেক দেবদেবী আছেন। মহাদেবের মন্দিরের সামনে অনেকগুলি লিঙ্গ ও মূর্তি আছে দেওয়ালের গায়ে। এগুলি পুরনো বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ছিল বলে সকলের বিশ্বাস। বর্তমান মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে ছিল আদি বিশ্বেশ্বরের মন্দির। ঔরঙ্গজেব এরই উপরে মসজিদ নির্মাণ করেছেন। জ্ঞানবাপী নামে যে কূপ আছে মন্দিরের পিছনে, সেখান থেকে মসজিদটি দেখতে পাওয়া যায়। আট-চল্লিশটি পাথরের থামের উপরে একটি মণ্ডপ, তারই নিচে পাথরের উঁচু জালি দিয়ে ঘেরা এই জ্ঞানবাপীর জল পবিত্র বলে পরিচিত। কাশীখণ্ডে আছে যে রুদ্ররূপী ঈশান তাঁর ত্রিশূল দিয়ে এই কুণ্ড খনন করেছিলেন। কুণ্ডের জলে পৃথিবী আবৃত হলে ঈশান সহস্র কলস জলে বিশ্বেশ্বরের স্নান করালেন। প্রসন্ন হয়ে বিশ্বেশ্বর বর দিলেন যে শিব অর্থাৎ জ্ঞান জলরূপে এই বাপীতে বিদ্যমান থাকবেন। শোনা যায় যে কালাপাহাড় যখন

কাশীতে এসেছিলেন মন্দির ধ্বংসের অভিযানে, বিশ্বেশ্বর তখন এই জ্ঞান বাপীর মধ্যে আত্মগোপন করেছিলেন। যাত্রীরা আজও এই কূপের জল পান করবার জন্য আগ্রহান্বিত। তাঁদের ধারণা যে এই জলপানে আত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। উঁচু একটি নন্দী আছে এই মণ্ডপে, আর ছোট ছোট কয়েকটি মন্দিরও আছে।

মন্দিরের শেষ নেই বারাণসীতে। নতুন মন্দিরও তৈরি হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নতুন বিশ্বনাথের মন্দির নির্মিত হয়েছে। ফুলের বাগানের মাঝখান দিয়ে পরিচ্ছন্ন সুন্দর পথ মন্দিরের সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। শ্বেত পাথরের মতো সাদা মন্দিরের চূড়া যেন আকাশ ছুঁয়ে আছে। প্রবেশ পথের দুপাশে দুটি দ্বারপালের মূর্তি দণ্ড হাতে, ভিতরে মার্বল পাথরের প্রশস্ত নাট মণ্ডপ। দোতলা মন্দির, উপরের তালাতেও বিশ্বনাথ আছেন। আরও আছেন অনেক দেব দেবী—গণেশ পার্বতী দুর্গা, লক্ষ্মীনারায়ণও আছেন। তাঁদের পৃথক ঘর। মন্দিরের দেওয়ালে অনেক সুন্দর চিত্র ও শাস্ত্র কথা, সাধু মহাপুরুষদের বাণীও চিত্রিত আছে।

আরও একটি নতুন মন্দির তৈরি হয়েছে, তার নাম তুলসী মানস মন্দির। বহু অর্থ ব্যয়ে এক ধনী ব্যবসায়ী এই সুন্দর মন্দিরটি নির্মাণ করেছেন। মন্দিরের কোন শিখর নেই বলে এটি একটি দোতলা বাসগৃহ বলে মনে হয়। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। সমস্ত মন্দিরটি মার্বল পাথরে তৈরি। সত্যিই যেন তুলসীদাসের মানস মন্দির। কবির প্রাণবন্ত মর্মর মূর্তি আছে, আর আছে রাম সীতার মূর্তি, লক্ষ্মীনারায়ণ বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার মূর্তি। আর যা আছে, তা এ দেশের কোনখানে নেই। তুলসীদাসের সমগ্র রামচরিতমানস দেওয়ালের পাথরে লিপিবদ্ধ আছে।

এই মন্দিরের নিকটেই সঙ্কট মোচন। কবি তুলসীদাসের পদধূলিতে এই স্থানটি পবিত্র হয়ে আছে। শান্ত সমাহিত পরিবেশে হনুমানের মন্দির। তুলসীদাস নিজে এই মন্দির নির্মাণ করেছেন বলে জনশ্রুতি।

প্রাঙ্গণের অন্য ধারে আর একটি মন্দিরে আছেন রাম। এখান থেকে গঙ্গার অসিঘাট বেশি দূরে নয়। কবি সেখানে সাধন ভজন করতেন, থাকতেন একটি ছোট ঘরে। আর সেখানে বসেই তাঁর অমর কাব্য রচনা করেন। তাঁর স্মৃতিচিহ্ন এখনও আছে।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে এই সব দেখতে হয়। প্রথমেই দুর্গা-বাড়ি। উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটি চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের মধ্যে দুর্গার মন্দির। লাল রঙের এই মন্দির অপরূপ শিল্প সৌন্দর্যে মণ্ডিত। অন্নপূর্ণার মন্দির বলে মনে হয়। দেবী এখানে দুর্গা, দণ্ডায়মান প্রসন্ন মূর্তি। ধূপ ধুনা চন্দন ও ফুলের গন্ধে এমন গম্ভীর পরিবেশ যে বেরিয়ে আসতে ইচ্ছা করে না। প্রাচীরের বাহিরে যে বিরাট পুষ্করিণী, তার নাম দুর্গাকুণ্ড। দুর্গার মন্দির ও দুর্গাকুণ্ড বাঙলার রাণী ভবানীর কীর্তি। ভারতের ধর্মজীবনে রাণী অহল্যা বাঈএর পরেই রাণী ভবানীর নাম।

শহরের অন্য প্রান্তে আছে কাল ভৈরবের মন্দির। নানা অলঙ্কারে কণ্টাকিত এই মন্দিরের চূড়া। দরজার পাশে দ্বারপাল ও দশাবতারের চিত্র। ভিতরে কাল ভৈরবের ভয়ঙ্কর মূর্তি। পাথরের দেহ নীল। জলজল করে রূপার চোখ, পাশে একটি কুকুর। ব্রহ্মার উপরে রাগ করে শিব কাল ভৈরব সৃষ্টি করেছিলেন। আর কাল ভৈরব তখনই ব্রহ্মার একটি মুণ্ড কেটে ফেলেছিলেন। কিন্তু সেই কপাল তাঁর হাত থেকে খসল না। সমগ্র পৃথিবী ঘুরেও তাঁর পাপ স্খালন হল না। শেষে এই কাশীতে এসে পৌঁছতেই কপাল খসে পড়ল। কপাল যেখানে পড়েছিল, সেই তীর্থের নাম হল কপাল মোচন। এই রকম পিশাচ মোচন বৃদ্ধ কালেশ্বর তিল ভাণ্ডেশ্বর। কত তীর্থ! কাশীতে তীর্থের সংখ্যা হাজার দেড়েকের কম নয়। এক দশাশ্বমেধ ঘাটেই আছে দুশো বিরানব্বুইটি মন্দির।

কলকাতা থেকে বারাণসীতে সরাসরি ট্রেন আসে। দিল্লীর ট্রেনে উঠে মোগলসরাই জংসনে নেমেও ট্রেনে বা বাসে এখানে আসা যায়। ট্যাক্সিও আছে। পথ মাত্র ১০ মাইল। মালব্য সেতুর উপর দিয়ে আসতে ঘণ্টা খানেক সময় লাগে। গোধুলিয়ায় শহরের বাস স্ট্যাণ্ড এবং অনতিদূরেই

বিশ্বনাথ গলি ও দশাশ্বমেধ ঘাট। শহরে বাসস্থান ও যানবাহনের কোন অভাব নেই। বারাণসী স্টেশনের উপরে রিটায়ারিং রুম আছে। হোটেল ধর্মশালা আছে। রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রম সংঘ আছে। শহরে বাস ট্যাক্সি টাঙ্গা ও সাইকেল রিক্সা অপর্যাপ্ত, গঙ্গায় নৌকাও অসংখ্য।

লোকে বলে বার্ধক্যে বারাণসী, এখানে মৃত্যু হলে পুনর্জন্ম নেই। তাই বৃদ্ধেরা কাশীবাস করেন। মন্দিরে মন্দিরে যাত্রীদের অবাধ গতি। কোন বিধি নিষেধ নেই দক্ষিণ ভারতের মতো। দেবতা এখানে সকলের জন্ম দ্বার অবারিত রেখেছেন।

ব্যাসকাশী

কাশীর গঙ্গার অপর পারে রামনগরে ব্যাসকাশী। মূল ব্যাসকাশীতে এখন আর কেউ যায় না। রাজ প্রাসাদের মধ্যে যে ব্যাসকাশী, সব যাত্রী সেখানেই যায়। বাসে এলে রাজবাড়ির সিংহদ্বার দিয়ে ঢুকতে হয়। আর নৌকায় এসে ঘাটের সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে হয়। প্রাসাদের পিছনে বিচ্ছিন্ন এক অংশে এই দেবালয়। মন্দিরের গর্ভ গৃহে বড় বড় তিনটি লিঙ্গ, মূর্তি ঝকঝক করে। অষ্ট ধাতুর মূর্তি। মাঝখানে বড় লিঙ্গটি ব্যাসদেবের, দুপাশে বিশ্বনাথ ও ব্যাসপুত্র শুকদেব। মন্দিরের দেওয়ালে আড়াই শো বছরের পুরাতন একটি তৈলচিত্র আছে ব্যাসদেবের। তাঁর দুই পাশে দুই রাজার ছবি, রামনগরের রাজার। এরই নাম ব্যাসকাশী।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বশিষ্ঠের প্রপৌত্র ও পরাশরের পুত্র, মৎসগন্ধা সত্যবতী তাঁর মাতা এবং শুকদেব তাঁর পুত্র। ব্যাসকাশীর মন্দিরে পিতাপুত্র পূজা পাচ্ছেন বিশ্বনাথের সঙ্গে। কাশীবাসী ব্যাসদেব কাশী থেকে নির্বাসিত হবার পরে এইখানেই বাস করতেন। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডে একটি উপাখ্যান আছে। ব্যাস প্রতিদিন তাঁর শিষ্যদের কাশীর মহিমা কীর্তন করে শোনাতেন। একদিন শিবের ইচ্ছা হল ব্যাসকে পরীক্ষার। তিনি অন্নপূর্ণাকে বললেন, আজ যেন ব্যাসকে কেউ ভিক্ষা না দেয়। অন্নপূর্ণার ইচ্ছায় তাই হল। সেদিন সারা দিন ঘুরে ব্যাস এক

মুঠো ভিক্ষাও পেলেন না। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তিনি শাপ দিলেন, মুক্তির গর্বেই তো কাশীবাসী ভিক্ষা দেয় নি, ত্রৈপুরুষী মুক্তি তাদের হবে না। রাগে দুঃখে ভিক্ষার পাত্র ছুঁড়ে ফেলে তিনি আশ্রমের দিকে অগ্রসর হলেন। এমন সময়ে ছদ্মবেশে অন্নপূর্ণা এসে বললেন, অতিথি সৎকার না করে আমার স্বামী খান না। আজ আপনি আমাদের অতিথি হন। ব্যাস সশিষ্যে তাঁর অতিথি হলেন। সৎকারের পর অন্নপূর্ণা বললেন, স্বার্থ সিদ্ধি না হবার জন্য যে শাপ দেয়, সে শাপ কাকে লাগে? ব্যাস বললেন, তা শাপদাতারই প্রাপ্য। তখন বিশ্বেশ্বর বললেন, অকারণে তুমি কাশীবাসীকে শাপ দিয়েছ, তুমি এ স্থানে থাকবার যোগ্য নও। কাশী তোমাকে ত্যাগ করতে হবে।

এই ঘটনার পরেই ব্যাস কাশী ত্যাগ করে পরপারে রাম নগরে এলেন। তিনি অভিমান করে স্থির করলেন যে এখানে তিনি এমন কাশীর প্রতিষ্ঠা করবেন যে যারা পাপ করে এসে এখানে মরবে তাদের তো মুক্তি হবেই, যারা এখানে এসেও পাপ করবে তাদেরও মুক্তি হবে। ব্যাসের এই সংকল্পের কথা জেনে শিবের দুর্ভাবনা হয়েছিল, কিন্তু অন্নপূর্ণা তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বৃদ্ধার বেশে বেরিয়ে পড়লেন। লাঠি ঠক ঠক করে ব্যাসের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখানে কী করছ বাবা? ব্যাস তাঁকে নতুন কাশীর কথা বুঝিয়ে বললেন। সব শুনে বুড়ি বললেন, তা বেশ। খানিকটা এগিয়ে ফিরে এসে বললেন, এখানে মরলে কী হয় বললে? ব্যাস বললেন, মুক্তি হয়। কিন্তু আবার ফিরে এসে বললেন, কানে কম শুনি বাবা, ঠিক বুঝতে পারলাম না। এখানে মরলে কী হয় বললে? ব্যাস এবারে রেগে চেঁচিয়ে বললেন, গাধা হয়। তথাস্তু বলে বুড়ি অন্তর্হিত হলেন, আর ব্যাস তখনই বুঝতে পারলেন যে শিবের সোনার কাশী রক্ষা করবার জন্যেই অন্নপূর্ণা নিজে এসেছিলেন তাঁকে ছলনা করতে। এই জন্যেই বলে, কাশীতে মরলে যেমন মুক্তি হয়, তেমনি ব্যাস কাশীতে মরলে পরজন্মে গাধা হয়ে জন্মাতে হয়।

সারনাথ

বারাণসী থেকে ৫ মাইল উত্তরে সারনাথ বৌদ্ধ তীর্থ। এই স্থানের প্রাচীন নাম ঋষিপত্তন, মানে ঋষিদের শহর। নেপাল সীমান্তে লুম্বিনীতে বুদ্ধের জন্ম, বিহারের বুদ্ধ গয়ায় তাঁর বুদ্ধত্ব লাভ, সারনাথে তিনি ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। আর তাঁর পরিনির্বাণ কুশীনগরে।

এখন এখানে পাঁচটি দর্শনীয় বস্তু আছে, তার মধ্যে প্রধান হল দেড় হাজার বছরের পুরনো ধর্ম স্তূপ। দ্বিতীয়টি অশোকের স্থাপিত ধর্মরাজিকা স্তূপ। এরই মধ্যে বুদ্ধের দেহাবশেষ ছিল। তারপরে সেই মূলঃমন্দির, বুদ্ধ যেখানে সাধনা করতেন। সামনে অশোক স্তম্ভ ও বুদ্ধের পায়চারি করবার পথ। এখন স্থাপিত হয়েছে মূলগন্ধকুটি বিহার।

ট্রেনে সারনাথে আসা যায়, বাস যাতায়াত করে। ট্যাক্সি টাঙ্গা ও সাইকেল রিক্সাতেও যাতায়াত সম্ভব। রাত্রি বাসের ব্যবস্থাও আছে। এখানে একটি জৈন মন্দির ধর্মশালা ও জাদুঘরও আছে।

কুশীনগর

কুশীনগর বা কুসিনারা গোরখপুর থেকে ৩৩ মাইল দূরে একটি প্রধান বৌদ্ধ তীর্থ। আশি বছর বয়সে বুদ্ধ এখানে নির্বাণ লাভ করেছিলেন। পুরাকালে এটি তীর্থস্থান ছিল, কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে পরিত্যক্ত হয়েছিল। বর্তমান কাসিয়া কুশীনগর বলে চিহ্নিত হয়েছে। এখানকার মাটি খুঁড়ে সামান্য কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। মাতা কুমারকা কোটে বুদ্ধের একটি নির্বাণ মূর্তি আছে। এখানে রাত্রিবাসের স্থান আছে। গোরখপুর থেকে বাস যাতায়াত করে।

অযোধ্যা

লক্ষ্ণৌ থেকে ৮০ মাইল দূরে ফৈজাবাদের পাশেই অযোধ্যা সূর্যবংশের রাজত্বকালে কোশল রাজ্যের রাজধানী ছিল। রামায়ণে

রামের জন্মস্থান বলে বর্ণিত এই শহর ভারতের সপ্ত তীর্থের অন্যতম। সেকালে এই শহরের পরিধি ছিল ৯৬ মাইল। রামায়ণের আদিকাণ্ডে অযোধ্যার বর্ণনা আছে। প্রশস্ত রাজপথে এক কণা ধুলো থাকত না, ভিজে পথের দুধারে ফুটে থাকত নানা রঙের ফুল। কত সৌধ, কত উদ্যান, কত আম্রকানন, অস্ত্রাগারও কত! নগরের চারিদিকে শাল গাছের মেখলা, বাহিরে জল দুর্গম ·পরিখা। নানা দেশ থেকে বণিক আসত বাণিজ্য করতে। রাজারাও আসতেন। তাঁদের জন্য স্থানে স্থানে সীমন্তিনীদের নাট্যশালা ছিল।

সেই রাম নেই, সেই অযোধ্যাও নেই। অতীতের অযোধ্যা অরণ্যে পরিণত হয়েছিল। এখন এই শহর রামের স্মৃতি বুকে নিয়ে বেঁচে আছে। পাণ্ডারা বলেন যে এখানে এখন ছিয়ানব্বইটি মন্দির আছে, তার মধ্যে বিষ্ণুর মন্দিরের সংখ্যা তেষট্টি আর শিবের মন্দির তেত্রিশ। শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে মসজিদও আছে ছত্রিশটি। বৌদ্ধ জৈন ও খ্রীস্টানদেরও তীর্থস্থান এই অযোধ্যা।

শহরে প্রবেশ করে বাঁ হাতেই চোখে পড়বে হনুমান গড়ি মন্দির। দুর্গ বা গড়ের মতো উঁচু এই মন্দিরের প্রাচীর দেখে মনে হবে যে সত্যিই এটি হনুমানের গড়। মন্দিরের মধ্যে সীতা ও হনুমানের মূর্তি আছে। উত্তর পশ্চিমে সোনে কা গড় বা কনক ভবন মন্দির। এই কনক ভবন কৈকেয়ীর বাস ভবন ছিল বলে সকলের বিশ্বাস। কিন্তু এখন এই মন্দিরে রাম ও সীতার সোনার মূর্তি। যেখানে রামের জন্ম হয়েছিল সেই জন্মস্থান হনুমান গড়ি থেকে আধ মাইলেরও কম দূরে। একটি মন্দিরের বাহিরে বাঁধানো চবুতরা। পুরনো মন্দিরটি ধ্বংস হবার পরে যে নতুন মন্দির নির্মিত হয়েছিল, তা মসজিদে পরিণত হয়েছে। ভিতরে রামের রসুই বা রান্নাঘর। সরযূ নদীর তীরে স্বর্গদ্বার বা রাম ঘাটে রামের শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়েছিল। তার দক্ষিণ-পশ্চিমে লক্ষ্মণ ঘাটে লক্ষ্মণ স্নান করতেন। এই শহরে কয়েকটি প্রাচীন ঢিবি আছে। তাদের নাম মণি পর্বত কুবের পর্বত ও সুগ্রীব পর্বত।

অযোধ্যায় অনেক ধর্মশালা আছে।

নৈমিষারণ্য

সত্য যুগে যেমন পুষ্কর, ত্রেতায় তেমনি নৈমিষারণ্য ছিল শ্রেষ্ঠ তীর্থ। লক্ষ্ণৌ থেকে বালামাউ হয়ে সীতাপুর শাখা লাইনে ১৬ মাইল দূরে গোমতীর তীরে নিমসরই প্রাচীন নৈমিষারণ্য। রামায়ণে এই তীর্থের খ্যাতি আছে। মহাভারতের মতে নৈমিশ ক্ষেত্রই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ। এই তীর্থের উৎপত্তি বিষয়ে দুটি পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে। দেবী ভাগবতে আছে যে ঋষিরা কলির আগমনের ভয়ে অস্থির হয়ে ব্রহ্মার নিকটে গিয়েছিলেন আশ্রয়ের জন্য। ব্রহ্মা তাঁদের এক মনোময় চক্র দিয়ে বলেছিলেন যে তোমরা এই চক্রের অনুগমন কর। যেখানে এই চক্রের নেমি বিশীর্ণ হয়ে পড়বে, সেই স্থানকেই তোমরা পবিত্র তীর্থ বলে মনে করবে। সত্য যুগ আবার না আসা পর্যন্ত নির্ভয়ে সেখানে তোমরা বাস কোরো, কলি সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না। ব্রহ্মার আদেশে ঋষিরা তাই করলেন। সেই পবিত্র তীর্থের নামই হল নৈমিষারণ্য। কলি এখানে প্রবেশ করতে পারবে না বলে আজও এই স্থান তীর্থ রূপে স্বীকৃত।

দ্বিতীয় কাহিনীটি বরাহ পুরাণের। গৌরমুখ মুনি এখানে এক নিমেষে দানব নিহত করেছিলেন বলে এই স্থানের নাম নৈমিষারণ্য হয়েছে। একদা ষাট হাজার ঋষির বাস ছিল। যে ঋষিরা কলির ভয়ে ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন, তাঁরা সবাই এখানে বসবাস করতেন। কুলপতি শৌনক এখানে এক বিরাট যজ্ঞ করেছিলেন। যজ্ঞ শেষে পুরাণের আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন রোমহর্ষণ। দশখানি পুরাণ পাঠ শেষ করে :রোমহর্ষণ যখন একাদশ পুরাণ শুরু করছেন, তখন বলরাম এসে সভায় উপস্থিত হলেন। ব্রাহ্মণেরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন, কিন্তু রোম হর্ষণ তাঁর আসন ত্যাগ করলেন না। রোমহর্ষণের ক্ষত্রিয় পিতা ও মা ব্রাহ্মণ কন্যা। এই সূতপুত্রের ধৃষ্টতায় ক্রুদ্ধ হয়ে বলরাম তাঁকে হত্যা করলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাকি সাড়ে সাতখানি পুরাণ পাঠ করলেন পিতার উপযুক্ত পুত্র উগ্রশ্রবা। ঋষিরা প্রতিবাদ করেন নি, শুধু নিজেদের

মধ্যে বলাবলি করেছিলেন যে কলির পদধ্বনি শোনা গেছে বলরামের ব্যবহারে।

নিমসরে এখন ছোট বড় অনেক মন্দির আছে। তার মধ্যে ললিতা দেবীর মন্দিরই প্রধান। আর একটি প্রধান স্থান হল চক্রতীর্থ, ছ কোনের একটি সরোবর। আরও তীর্থ আছে। তাদের নাম পঞ্চপ্রয়াগ কাশী গোদাবরী গঙ্গোত্রী ও গোমতী। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে এখানে পরিক্রমা মেলা বসে। নিকটে আর একটি তীর্থ স্থান আছে, তার নাম মিশ্রিক। মিশ্রিকে আছে দধীচি তীর্থ ও হত্যাহরণ তীর্থ। যে কুণ্ডের জলে স্নান করে দধীচি মুনি তাঁর দেহ দেবতাদের দান করেছিলেন, তারই নাম দধীচি কুণ্ড। আর হত্যাহরণ তীর্থে স্নান করে রামের ব্রহ্ম হত্যার পাপ স্খালন হয়েছিল।

যাত্রীর জন্য নিমসরে ধর্মশালা আছে।

হরিদ্বার

কলকাতা বা দিল্লী থেকে দেরাদুন যাবার পথে হরিদ্বার একটি বিখ্যাত তীর্থ। মোক্ষদায়িকা সপ্ত পুরীর তালিকায় যে মায়া নাম আছে তারই বর্তমান নাম হরিদ্বার। গঙ্গাদ্বার এর অন্য নাম। দক্ষ প্রজাপতি এখানেই যজ্ঞ করেছিলেন, আর সেই যজ্ঞস্থলে স্বামীর নিন্দায় প্রাণত্যাগ করেছিলেন সতী। শিবের ক্রোধ থেকে উৎপন্ন বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করেছিলেন। পুরাণে এর বিস্তারিত কাহিনী আছে। মহাভারতে আছে যে ভীষ্মের পিতামহ রাজা প্রতীপ এই গঙ্গাদ্বারে যখন তপস্যারত ছিলেন, তখন গঙ্গা মোহিনী কন্যা রূপে তাঁর দক্ষিণ উরুতে এসে বসেছিলেন। অভিশপ্ত অষ্টবসুকে উদ্ধারের জন্য তাঁকে মা হতে হবে। তাই তিনি রাজার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন। গঙ্গার বিবাহ হয়েছিল প্রতীপের পুত্র শান্তনুর সঙ্গে। ঋষি ভরদ্বাজের সঙ্গে অপ্সরা ঘৃতাচীর সাক্ষাৎ হয়েছিল এই গঙ্গাদ্বারে। সিক্ত বসনা অপ্সরাকে দেখে ঋষির চিত্ত বিভ্রম ঘটেছিল। জন্ম হয়েছিল দ্রোণাচার্যের। অর্জুনও এই গঙ্গাদ্বারে তীর্থ করতে এসে নাগরাজ কন্যা উলুপীর কাছে বাঁধা পড়েছিলেন।

আশ্চর্যের কথা এই যে এখানে কোন দেবতাকে নিয়ে উৎসব হয় না। গঙ্গা এখানে প্রধান দেবতা। গঙ্গার আরতি হয় প্রতি দিন। কুম্ভ যোগে গঙ্গা স্নান এখানকার সবচেয়ে বড় উৎসব। শিবালিক গিরিশ্রেণীর পাদদেশে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে এই শহর অবস্থিত। গঙ্গায় যতগুলি ঘাট আছে, তার মধ্যে হর কি পৌড়ি সবচেয়ে সুন্দর। চারিদিক বাঁধানো একটি জলাশয়ের মতো। গঙ্গার ধারা এক ধার দিয়ে প্রবেশ করে অন্য ধার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। মাঝখানে ব্রহ্ম কুণ্ড। পুণ্যার্থীরা এই কুণ্ডে স্নান করেন, ঘাটে বসে সাধন ভজন করেন। ঘাটের উপরেই গঙ্গা গায়ত্রী রামচন্দ্র বদ্রীনাথ ও লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির। কুণ্ডের জলে মহারাজ মানসিংহের ছত্রি। মূল গঙ্গা ও হর কি পৌড়ির মাঝখানে প্রশস্ত ঘাট তীরের বাঁধানো ঘাটের সঙ্গে পুল দিয়ে যুক্ত। এরই এক পাশে উঁচু ঘণ্টা ঘরে দুটি পাথরের মূর্তি। তার মধ্যে একটি নেতাজীর।

রাস্তার ধার থেকে শিবালিক পাহাড় ক্রমে ক্রমে উপরে উঠে গেছে। মাথায় যে মন্দির আছে, তা মনসা দেবীর। প্রায় নশো বছরের পুরনো মন্দির। যাত্রীরা উপরে উঠে প্রতিমার তিন মাথা ও পাঁচ হাত দেখে আশ্চর্য হয়। পাশে দেবী অষ্টভুজা ও তাঁর ভৈরবের মন্দির। পিছনের দিকে আধ মাইল নিচে পূর্ণ কুণ্ড।

সূর্যাস্তের সময় যাত্রীরা পাতার ডালায় প্রদীপ জ্বেলে ব্রহ্মকুণ্ডের জলে ভাসিয়ে দেয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই দীপশিখার ছায়া পড়ে গঙ্গার জলে। স্রোতের টানে ভেসে চলে যায়। অসংখ্য দীপ শিখা। এ যেন বাসনার শিখা। যাত্রীরা ভাবে, তাদের মনের বাসনা ভেসে গেল গঙ্গার স্রোতে। অন্ধকার গভীর হলে গঙ্গার আরতি শুরু হয়। ব্রাহ্মণেরা ধূপদীপ কর্পূর নিয়ে আরতি করেন। কাঁসর ঘণ্টায় দশ দিক ধ্বনিত হয়। ব্রাহ্মণদের হাতের আলোয় যেন গঙ্গার জলে আগুন লাগে। অপরূপ দৃশ্য। এ দৃশ্যের তুলনা কোথাও নেই।

এখান থেকে মাইল দুই দক্ষিণে গঙ্গার তীরে ছিল দক্ষ প্রজাপতির বাসস্থান। এই স্থানের নাম এখন কনখল। পুরাণের দক্ষযজ্ঞ হয়েছিল

এইখানে। সতী এখানেই দেহত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু হরিদ্বার পীঠস্থান হয় নি। অনেকে অবশ্য বলেন যে সতীর অধর এইখানে পড়েছিল। দেবী ভৈরবী, আর ভৈরব বক্র। কনখলে এখন দক্ষের একটি মন্দির আছে। গঙ্গার ধারে ছায়া শীতল পরিবেশে এই মন্দিরে দক্ষেশ্বর মহাদেবও আছেন। কনখলের আর এক ধারে একটি কুণ্ড আছে, তার নাম সতী কুণ্ড। স্থানীয় লোক বলে যে এই কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে সতী দেহত্যাগ করেছিলেন।

হরিদ্বার ও কনখলের মধ্যে মায়াপুর একটি প্রাচীন স্থান। লোকে বলে যে রাজা বেণের জীর্ণ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখানে আছে। হরিদ্বারের প্রাচীন নাম যে মায়া ছিল, এ তারই প্রমাণ।

কুশাবর্ত তীর্থে ঋষি দত্তাত্রেয় দশ হাজার বছর তপস্যা করেছিলেন। এই তীর্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি কাহিনী শোনা যায়। গঙ্গার তীরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে তিনি যখন তপস্যা করছিলেন, সেই সময়ে গঙ্গা স্ফীত হয়ে ঋষির বস্ত্র দণ্ড ও কুশ ভাসিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঋষির তপস্যার প্রভাবে ব্যর্থ হন। সেই জিনিষগুলি গঙ্গার জলে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে গঙ্গাকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতারা এসে বাধা দেন। ঋষি বলেন, যদি আপনারা এই তীর্থে সারাক্ষণ বিরাজ করেন, তাহলেই আমি অভিশাপ দেব না। দেবতারা তথাস্তু বললে এই স্থানের নাম হয় কুশাবর্ত তীর্থ।

শ্রমননাথ মহাদেবের মন্দির এই তীর্থেরই নিকটে। মহাদেবের মূর্তি পঞ্চমুখ। শঙ্খ পাথরের বিরাট নন্দীশ্বর মূর্তি। শ্রমননাথ এক সাধুর নাম। তিনি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে তাঁর নামেই শিবের নাম। এই সাধুর নামে অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। একবার সন্ন্যাসী অতিথিদের আহারের জন্য ভাণ্ডারার সময় ঘি কম পড়ে যায়। সাধু শিষ্যদের বললেন, গঙ্গার কাছে চেয়ে নাও। শিষ্যরা গঙ্গার তীরে পৌঁছতেই আকাশ বাণী হল, টিন ভর্তি করে নাও। গঙ্গার জলই ঘৃতে পরিণত হল।

গঙ্গার অপর পারে যে পর্বত, তার নাম নীলপর্বত কেন হল সে সম্বন্ধেও

একটি কাহিনী আছে। অবন্তিকাপুরের এক ব্রাহ্মণের নাম অশ্বচিত্র। কঠিন দারিদ্র্যের জন্য সে চুরি করতে শুরু করে। চুরি করবার জন্য মায়াপুরে এসে এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে তার মন আধ্যাত্মিক ভাবে ভরে গেল। তারপর এই পাহাড়ে উঠে শিবের চিন্তায় মগ্ন হল। অনাহারে অনিদ্রায় কাটল সাত দিন সাত রাত। তারপর নীলকণ্ঠ মহাদেব তাঁকে দর্শন দিলেন। বর দিলেন যে তার নামে এই পর্বতের নাম নীল পর্বত হবে, আর অশ্বচিত্রের নামও এই সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকবে। সাত আট মাইল দূরে আর একটি পাহাড়ের উপরে চণ্ডী দেবীর মন্দির। সপ্ত সরোবর খুব দূরে নয়। গঙ্গা এখানে সাত ধারায় প্রবাহিত হয়ে আবার মিলিত হয়েছেন। পুরাকালে সপ্ত ঋষি এখানে তপস্যা করেছিলেন। ভীম-গোড়ার কুণ্ড ও মন্দির হর কি পৌড়ির খুব নিকটে। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের নামে ভীমগোড়া নাম।

হরিদ্বারে কুম্ভযোগ হয় চৈত্র মাসের মহাবিষুব সংক্রান্তিতে। সেদিন যে সময়ে কুম্ভ রাশির সঙ্গে বৃহস্পতি ও মেষ রাশির সঙ্গে রবির মিলন হয়, সেই সন্ধিক্ষণে হয় পূর্ণ কুম্ভযোগ। এই ঘটনা শুধু হরিদ্বারেই হয় বারো বছর পর পর। তাই হরিদ্বারের কুম্ভই শ্রেষ্ঠ। এই কুম্ভ স্নান করতে হয় ব্রহ্মকুণ্ডে, কিন্তু এ জায়গা লক্ষ লোকের এক সঙ্গে স্নানের উপযোগী নয় বলে শহর থেকে একটি শোভা যাত্রা বেরোয়। নির্দিষ্ট পথে গঙ্গার ধারে এসে এই কুণ্ডে স্নান করে নির্দিষ্ট পথে ফিরে যায়।

এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকেন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। শঙ্করাচার্য সাধুদের দশনামী সম্প্রদায় স্থাপন করে তাঁর চারটি মঠে অধিষ্ঠিত করে গেছেন। সন্ন্যাসীরা আখড়ায় শুধু ধর্ম চর্চাই করতেন না, ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ বিগ্রহও করতেন, আর শান্তির সময় করতেন ধর্ম প্রচার। ভালা অর্থাৎ বল্লম তাঁদের দেবতা। এই ভালা দেবতাকে সামনে নিয়ে শোভাযাত্রার প্রথমে থাকেন দশনামী সাধু সম্প্রদায়—নির্বাণী আখড়ার সঙ্গে অটল আখড়া, নিরঞ্জনী আখড়ার সঙ্গে অনিন্দ আখড়া, তারপর ধুনা আখড়ার সঙ্গে আবাহন ও অগ্নি আখড়া। তারপর বৈরাগী উদাসী ও নির্মলা

সম্প্রদায়। নানকপন্থীরা নির্মলা সম্প্রদায় এবং নানকের পুত্র শ্রীচাঁদ প্রতিষ্ঠা করেছেন উদাসী সম্প্রদায়। একজন নাগা সন্ন্যাসী ঘোড়ার পিঠে চড়ে দুটি জয়ঢাক বাজিয়ে চলেন। এর নাম দিগ্বিজয় ডঙ্কা, তার পিছনেই দিগ্বিজয় ঝাণ্ডা। আর এক নাগা সন্ন্যাসী ঘোড়ায় চড়ে গেরুয়া রঙের এক পতাকা বহন করে চলেন। এই দুটিই হল শঙ্করাচার্যের জয়ধ্বনি ও জয় পতাকা। তারপর কসরৎ দেখাতে দেখাতে চলবেন নাগা সন্ন্যাসীরা, কেউ ঘোড়ার পিঠে কেউ পায়ে হেঁটে। যুদ্ধের বাজনা বাজবে। পুরাকালে এই সন্ন্যাসীরা ধর্ম রক্ষার জন্য যে যুদ্ধ করেছিলেন, তারই অভিনয় হবে শোভাযাত্রায়। দণ্ডধারী ধুনাধারীরা যাবেন, হাতীর পিঠে যাবে নীল রঙের বিজয়ী ঝাণ্ডা আর গেরুয়া পতাকা। ব্রাহ্মণরা বেদ পাঠ করতে করতে যাবেন, হাতে চামর। প্রত্যেক আখড়ার আলাদা নিদর্শন, নামলেখা নিশান। তাদের ইষ্টদেবতা থাকবেন সোনা রূপা আর ফুলের মালায় সাজানো পাল্কীতে। আখড়ার মণ্ডলীশ্বররা কেউ যাবেন পাল্কীতে, কেউ হাতীর পিঠে চড়ে। মাথার উপরে জরির ছাতা, দুধার থেকে চামর দোলাবেন দু জনে। যেন কোন রাজা বা বাদশাহ চলেছেন। সাধু মহাত্মাদের শোভাযাত্রা শেষ হলে সাধারণ যাত্রী যাবে কাতারে কাতারে। ব্রহ্মকুণ্ডে একটা ডুব দিতে পারলেই জন্ম সার্থক।

হরিদ্বারে কয়েকটি হোটেল ও ধর্মশালা আছে। রেল স্টেশন রিটায়ারিং রুম ও শহরে ডাকবাংলো প্রভৃতি আছে। যাতায়াতের জন্য বাস ট্যাক্সি টাঙ্গা ও সাইকেল রিক্সা পাওয়া যায়।

ঋষিকেশ

হরিদ্বার থেকে ১৫ মাইল দূরে ঋষিকেশ হল হিমালয়ের সিংহদ্বার। যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ—এই চারধামের যাত্রা শুরু হয় ঋষিকেশ থেকে। এখানে যাবার জন্য হরিদ্বার থেকে ট্রেন ও বাস আছে। অনেকগুলি মন্দিরও আছে এখানে। তার মধ্যে প্রধান হল ভরতের মন্দির। আরও তিন মাইল উত্তরে লছমন ঝুলা। এই পথে কৈলাস আশ্রম,

শিবানন্দ আশ্রম স্বর্গাশ্রম গীতাভবন ও পরমার্থ নিকেতন। লছমন ঝুলায় গঙ্গার উপরে একটি ঝুলন্ত পুল আছে। কিংবদন্তী এই যে লক্ষ্মণ এখানে দীর্ঘ দিন তপস্যা করেছিলেন এবং হিমালয়ের পুণ্য তপোভূমি যাত্রার জন্য এখানে রজ্জু দিয়ে একটি সেতু নির্মাণ করেছিলেন। লক্ষ্মণের একটি মন্দিরও আছে। ঋষিকেশে অনেক ধর্মশালা আছে এবং হরিদ্বার থেকে নিয়মিত বাস যাতায়াত করে। ট্যাক্সি পাওয়া যায়, টাঙ্গা ও সাইকেল রিক্সারও অভাব নেই। যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী কেদারনাথ ও বদ্রীনাথের বাস ঋষিকেশ থেকেই ছাড়ে।

লছমন ঝুলা থেকে একটি পায়ে চলার উপযোগী পথ পুল পেরিয়ে ভাগীরথী ও অলকনন্দার সঙ্গম দেবপ্রয়াগে যায়। আরও কিছু দূর এগিয়ে অলকনন্দার এক তীরে কীর্তিনগর ও অন্য তীরে শ্রীনগর। কোটদ্বার রেলস্টেশন থেকে যে পথ উত্তরাখণ্ডে এসেছে, সেই পথ এসে মিলেছে শ্রীনগরে। মোটরের পথ গঙ্গার অন্য পার দিয়ে দেবপ্রয়াগে গেছে।

যমুনোত্রী

যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রীর ভিন্ন পথ। ঋষিকেশ থেকে নরেন্দ্রপুর ও টিহরি হয়ে উত্তরে যেতে হয়। শ্রীনগর থেকেও টিহরি আসা যায়। ভাগীরথীর পূর্ব পারে টিহরি, আর পশ্চিম পার দিয়ে গেছে যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রীর পথ। মসুরি দেরাদুন থেকেও সরাসরি টিহরিতে আসা যায়। যমুনোত্রী (১০,৮০০ ফুট) ঋষিকেশ থেকে ১৩৯ মাইল উত্তরে। এর মধ্যে ১১৬ মাইল পথ বাসে যাওয়া যায়, বাকি পথ হাঁটতে হয়। অবশ্য হাঁটার পথ এই অঞ্চলে প্রতি দিন কমছে, বাড়ছে মোটরের পথ। ধরাসু নামে একটা জায়গা থেকে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর পথ আলাদা হয়েছে। যমুনোত্রীর পথে বড়কোটে মসুরি থেকে সরাসরি বাস আসছে।

ঋষিকেশ থেকে যাত্রা শুরু করে ১০ মাইল দূরে নরেন্দ্রনগর (৩,৮৫০ ফুট)। এখান থেকে ৪০ মাইল দূরে ভাগীরথী ও গঙ্গার সঙ্গমে টেহরি (১,৭৫০ ফুট)। মসুরি এখানে থেকে ৪০ মাইল পশ্চিমে ও ৬৫ মাইল পূর্বে

কীর্তিনগর। ধরাসু (৩,৪০০ ফুট) ২৬ মাইল উত্তরে। টিহরি থেকে একটি পাহাড়ী পথ কেদার বদ্রীর পথে দেবপ্রয়াগে পৌঁছেছে। ধরাসু থেকে ৩৬ মাইল দূরে বড়কোট (৬,০০০ ফুট) মসুরির সঙ্গে ৬০ মাইল দীর্ঘ বাস পথে যুক্ত। এখান থেকে ৪ মাইল দূরে গাংনানিতে (৭,০০০ ফুট) যমুনার প্রথম দর্শন মেলে। এর পরে ৬ মাইল দূরে যমুনা চটি (৮০০০ ফুট), দণ্ডোতি (৯,০০০ ফুট) ৫ মাইল দূরে, হনুমান চটি (১০,০০০ ফুট) ৪ মাইল দূরে এবং আরও ৮ মাইল দূরে যমুনোত্রী। মাঝপথে খরসালি গ্রামে যমুনোত্রীর পাণ্ডাদের বাস। যমুনার পরপারে বিফ গ্রাম মার্কণ্ডেয় তীর্থ নামে পরিচিত। গন্ধকের প্রস্রবন আছে সেখানে।

যমুনোত্রী পৌঁছে সমস্ত কষ্টের অবসান হয়ে যায় সৌন্দর্য দেখে। সামনে বন্দর পুঁছ (২০,৭৩১ ফুট) পর্বতের উদার বিস্তার, তারই তলদেশ দিয়ে যমুনার ধারা নেমে আসছে। এখানেই যমুনার উৎস এবং যমুনা এখানে উত্তরবাহিনী বলে নাম যমুনোত্তরী বা যমুনোত্রী। একটি ছোট মন্দিরের মধ্যে যমুনার মূর্তি আছে। কিন্তু দেবতার চেয়ে প্রকৃতি এখানে অনেক বড়।

চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা বলে এ জায়গায় রাত্রিবাস এক রকম অসম্ভব। কয়েকটি গরম জলের কুণ্ড আছে। যাত্রীরা তাতে চাল ডাল ও আলু সেদ্ধ করে নেন গামছায় বেঁধে। তারপর অন্ধকার হবার আগেই নিচে নেমে আসেন। মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত যমুনোত্রী যাওয়া যায়। সেখানে একটি ধর্মশালা ও লগ কেবিন আছে। পথে অনেক জায়গায় ফরেস্ট রেস্টহাউস ধর্মশালা ও চটি আছে।

উত্তরকাশী

যমুনোত্রী থেকে ফেরার পথে যমুনাচটি ও গাংনানির মাঝে ২৫ মাইলে সিমলি (৩,৪০০ ফুট) নামে একটি জাগয়া থেকে হেঁটে গঙ্গোত্রীর পথে নাকুরি (৩,৫০০ ফুট) পৌঁছনো যায়। নাকুরি থেকে উত্তর কাশী (৩,৮০০ ফুট) ৭ মাইল দূরে। কিন্তু যাত্রীরা এখন পায়ে না হেঁটে বাসে ধরাসু

এসে উত্তর কাশীর বাস ধরেন। উত্তর কাশী ঋষিকেশ থেকে ৮১ মাইল দূরে এই নামের একটি জেলার প্রধান শহর। কিংবদন্তী আছে যে অর্জুনের সঙ্গে কিরাতবেশী শিবের যুদ্ধ হয়েছিল এইখানে এবং এইখানেই মহাভারতের জতুগৃহ দাহ হয়েছিল। গঙ্গার নাম এখানে ভাগীরথী। ভাগীরথীর তীরে শহর। এখানেও বরুণা ও অসি নদী আছে বলে উত্তর কাশীর মাহাত্ম্য বারাণসীর মতো। বিশ্বনাথের মন্দিরের নিকটে একটি ত্রিশূলের গায়ে প্রাচীন লিপি উৎকীর্ণ আছে। জয়পুরের মহারাজা একাদশ রুদ্রের যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাতে তিনশো সাধু বাস করতে পারেন। শক্তি পরশুরাম ও কালীর মন্দিরও আছে। মাইল খানেক দূরে উজেলি গ্রামে সাধুদের বাস। এখানে অনেক আশ্রম ও ধর্মশালা আছে। ছুটি সত্র থেকে সমস্ত সাধুদের খাদ্য বিতরণ করা হয়।

গঙ্গোত্রী

উত্তরকাশী থেকে গঙ্গোত্রী (১০,০০০ ফুট) ৭৫ মাইল উত্তরে। ঋষিকেশ থেকে ১৫৬ মাইল ও যমুনোত্রী থেকে ১৪০ মাইল দূরে অবস্থিত। উত্তর কাশীতে গঙ্গোত্রী যাত্রার সরকারী অনুমতি পত্র সংগ্রহ করতে হয়। এখান থেকে লঙ্কা পর্যন্ত বাসে যাওয়া যায়। লঙ্কা থেকে গঙ্গোত্রী ৭ মাইল দূরে। পায়ে হেঁটে ভাগীরথীর পুল পেরোতে হয়। তারপর গঙ্গোত্রী পর্যন্ত ৬ মাইল মোটর চলাচল করে।

যে স্থানে তপস্যা করে রাজা ভগীরথ স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে এনেছিলেন, সেই স্থানেই গঙ্গার মন্দির। এবং ভগীরথের নামেই ভাগীরথী নাম। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে পাণ্ডবরাও এই স্থানে দেবযজ্ঞ করেছিলেন। ভাগীরথী এখানে কিছু উত্তর বাহিনী বলেই এই স্থানের নাম গঙ্গোত্তরী বা গঙ্গোত্রী হয়েছে। বর্তমান মন্দিরটি অষ্টাদশ শতাব্দে গাড়োয়ালের গুর্খা সেনাপতি অমর সিং থাপা নির্মাণ করেছিলেন। মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এই মন্দির খোলা থাকে, তারপরে বরফে আবৃত হয়ে যায়। এখানে বাসের জন্য একটি লগ কেবিন, ফরেস্ট রেস্ট হাউস ও ধর্মশালা আছে।

গোমুখ

যমুনোত্রীর মতো গঙ্গোত্রীতে গঙ্গার উৎস নয়। গঙ্গার উৎস দেখতে হলে ১৪ মাইল পুর্বে গোমুখ (১২,৭৭০ ফুট) যেতে হয়। কিন্তু সেখানে যাবার পথ সুগম নয়। গাইড নিয়ে কষ্টসহিষ্ণু যাত্রীরাই সেখানে যেতে পারেন। ভুজবাসায় এক রাত্রি বাস করতে হয়। গঙ্গোত্রী হিমবাহ (১৩,৫৭৮ ফুট) বদ্রীনাথের নিকটে চৌখাম্বা শৃঙ্গ থেকে নেমে গোমুখ পর্যন্ত এসেছে। লোকের বিশ্বাস যে এই হিমবাহের নিচেই ভাগীরথীর জন্ম হয়েছে এবং গোমুখের গুহা মুখ থেকে বেরিয়ে ভাগীরথী নামে গঙ্গোত্রীর দিকে প্রবাহিত হয়েছে। দেবপ্রয়াগে অলকনন্দার সঙ্গে সঙ্গমের পর ভাগীরথীর নাম হয়েছে গঙ্গা।

কেদারনাথ

ঋষিকেশ থেকে ১৩৫ মাইল দূরে কেদারনাথ (১১,৭৫৩ ফুট) হিন্দুর সুন্দরতম তীর্থ। এখন ১২৫ মাইল পর্যন্ত বাসে আসা যায়। তারপর হেঁটে ঘোড়ায় বা ডাণ্ডিতে পৌঁছনো যায় কেদারনাথে। ঋষিকেশ থেকে ৪২ মাইল দূরে দেবপ্রয়াগ (১,৫৫০ ফুট)। রাবণ হত্যার পরে রাম এখানে তপস্যা করেছিলেন। এখানে তাই রঘুনাথজীর মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ২১ মাইল দূরে কীর্তিনগর। গঙ্গোত্রী থেকে ফেরার পথে টিহরি থেকে বাসে এই ৩৫ মাইল পথ আসা যায়। ৩ মাইল দূরে নদীর পর পারে শ্রীনগর এই অঞ্চলের বড় শহর। কমলেশ্বর শিবের মন্দির আছে এখানে এবং একটি বিরাট যাত্রীনিবাস আছে। কেদারনাথ ও বদ্রীনাথের পথ বিভক্ত হয়েছে ২২ মাইল দূরে রুদ্র প্রয়াগে (২০০০ ফুট)। এখানে মন্দাকিনী ও অলকনন্দার সঙ্গম। মন্দাকিনীর পথে কেদারনাথ যেতে হয়, আর বদ্রীনাথ অলকনন্দার পথে। গৌরীকুণ্ডের (৬,৫০০ ফুট) কাছাকাছি বাসে যাওয়া যায়। পথে অগস্ত্যমুনিতে (৩,০০০ ফুট)

অগস্ত্যের মন্দির, গুপ্তকাশীতে (৪,৮৫০ ফুট) চন্দ্রশেখর মহাদেব ও অর্ধনারীশ্বরের মন্দির। শীতে কেদার নাথের পূজা হয় এইখানে। কুণ্ড চটিতে মন্দাকিনীর পুল পেরোতে হয়। ওপারে গুপ্তকাশী, আর এপারে উখীমঠ (৪,২০০ ফুট) মুখোমুখি। উখীমঠের পথেও চামোলি হয়ে বদ্রীনাথে যাওয়া যায়। গৌরীকুণ্ডে উষ্ণ জলের কুণ্ড আছে। রাত্রিবাসের ভাল ব্যবস্থাও আছে। ডাকবাংলো টেম্পল কমিটির গেস্ট হাউস ও চটি আছে। নিরামিষ আহার পাওয়া যায়। গৌরীকুণ্ড থেকে ক্রমাগত চড়াই। মাঝ পথে রামবাড়া চটি। কেদারনাথে রাত্রিবাসের ভয় থাকলে যাত্রীরা এইখানে রাত্রিবাস করেন। হেঁটে ঘোড়ায় চেপে বা ডাণ্ডিতে কেদারনাথে যেতে হয়।

মহাপন্থ গিরিশৃঙ্গের নিচে অপরূপ সুন্দর পরিবেশে জ্যোতির্লিঙ্গ শিবের মন্দির। এই পথেই পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীকে নিয়ে মহাপন্থে যাত্রা করেছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে শিব মহিষের রূপ ধারণ করে পাণ্ডবদের সামনে থেকে পলায়নের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অসমর্থ হয়ে মাটির নিচে আত্মগোপনের চেষ্টা করেন। কেদারনাথের মন্দিরে তাঁর প্রস্তরীভূত পশ্চাদ্দেশ জেগে আছে। পাণ্ডবরা তারই উপরে মন্দির নির্মান করেছিলেন। শঙ্করাচার্য এই মন্দিরের সংস্কার করে তীর্থ উদ্ধার করেন। লোকের বিশ্বাস যে এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বত্রিশ বছর বয়সে। তাই এখানে তাঁর সমাধি প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

মন্দিরের অদূরে একটি হিমবাহে জন্ম হয়েছে মন্দাকিনীর। দুটি সরোবর আছে এই অঞ্চলে—বাসুকি তাল ও চোরাবালি তাল। চোরা-বালি তালের বর্তমান নাম গান্ধী সরোবর। মন্দিরের নিকটে উদক কুণ্ড ও পাহাড়ের উপরে ভৈরবের মন্দির।

কেদারনাথ থেকে মাইল খানেক দূরে দেব দেখনি নামে এক জায়গা থেকে মন্দিরটি প্রথম দেখা যায়। পিছনের বরফ পাহাড়ের সঙ্গে মিশে দিনের প্রসন্ন আলোয় রূপার মতো ঝক ঝক করে এই মন্দিরে। দেহের সমস্ত শ্রান্তি ভুলে যাত্রীরা 'জয় কেদার' বলে চেঁচিয়ে ওঠেন।

তারপরে মন্দাকিনীর পুল পেরিয়ে ছোট একটি পাহাড়ী শহর, তারই নাম কেদারনাথ। দোকান-পাট পাণ্ডাদের বাসগৃহ ধর্মশালা রেস্টহাউস হোটেল সবই আছে এখানে। খাবার দোকানও আছে।

মন্দিরটি পাথরের। উঁচু ভিতের উপরে নন্দী। তারপর দোচালা নাট মন্দিরের পিছনে গর্ভগৃহ, তার উপরেও একটি চালা আছে, চালের উপরে চূড়া। সমস্ত উত্তরাখণ্ডের মন্দিরই এই রকম, কারও নাট মন্দির আছে, কারও নেই। কোনও নাট মন্দির পাথরের, কোনটা বা টিনের। এই অঞ্চলের একটি মন্দির দেখলে সব মন্দিরই দেখা হয়ে যায়।

মন্দিরের দেবতা এক খণ্ড বিরাট পাথর। শিবলিঙ্গ নয়, ত্রিকোনাকার পাথর। প্রাণের আবেগে যাত্রীরা এই পাথর জড়িয়ে নতি স্তুতি করেন ও তার গায়ে ঘি মাখেন। সামনের দোকানে পূজার উপকরণ পাওয়া যায় শুকনো ফুল বেলপাতা আর বাসি মিষ্টান্ন। পাণ্ডারা ব্রহ্মকমলের কথা বলেন। সন্ধ্যার দিকে অনেক সময়ে বরফ পড়ে কেদারনাথে। সে এক আশ্চর্য সুন্দর পরিবেশ। বাহিরে যদি জ্যোৎস্না থাকে আর আকাশে চাঁদ তো মনে হবে স্বপ্নের দেশ কৈলাসে পৌঁছে গেছি। এই সুন্দর জগৎই তো শিব।

ত্রিযুগী নারায়ণ

গঙ্গোত্রী থেকে একটি পথ ত্রিযুগী নারায়ণের পথে কেদারনাথে এসেছে। যখন বাস চলত না যাত্রীরা তখন পায়ে হেঁটে এই পথেই আসতেন। এখন সোমপ্রয়াগের নিকটে নেমে যাতায়াত করতে হয়। কিংবা তার আগে পাটাগড় থেকে হাঁটতে হয়। তিন মাইল চড়াই পেরিয়ে ত্রিযুগী নারায়ণ (৬,০০০ ফুট) একটি তীর্থস্থান। পথে শাকম্ভরী বা মনসা দেবীর মন্দির। এখানে এসেও জীবন সার্থক হয়েছে বলে মনে হবে। এক দিক থেকে গঙ্গোত্রীর পথ ধীরে ধীরে নেমে এসেছে, অন্য দিক থেকে রুদ্র প্রয়াগের পথ উঠে এসেছে, আর তৃতীয় পথ সোমদ্বার বা সোমপ্রয়াগের দিকে ধীরে ধীরে নেমে কেদারনাথের পথে মিলেছে।

ত্রিযুগী নারায়ণ হলেন তিন যুগের সাক্ষী নারায়ণ, হরপার্বতীর বিবাহ দিয়েছিলেন এইখানে। সেই হোমের কুণ্ড আজও জ্বলছে। যাত্রীরা এই কুণ্ডের জন্য কাঠ কিনে দিচ্ছেন, কিংবা কাঠের দাম দিয়ে যাচ্ছেন কাঠ পোড়াবার জন্য। এই কুণ্ডের আগুন কোন দিন নিববে না, যাত্রীদের ভক্তিতেই চিরকাল জ্বলবে। চারটি জলের কুণ্ড আছে ত্রিযুগী নারায়ণে—ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ও সরস্বতীর নামে কুণ্ড। এই সব কুণ্ডে, যাত্রীরা স্নান তর্পন করেন। ত্রিযুগী নারায়ণে ধর্মশালা আছে, দোকান পাটও আছে। কাজেই রাত্রিবাসের অসুবিধা নেই। কিন্তু যাত্রীরা দেবতার দর্শনের পর দুপুরের আহার সেরে সোমপ্রয়াগের দিকে এগিয়ে যান। সাড়ে তিন মাইল উৎরায়ের পরে সোমদ্বার, আরও মাইল তিনেক দূরে গৌরীকুণ্ড।

পঞ্চ কেদার

কিংবদন্তী অনুসারে মহিষরূপী শিব যখন পাণ্ডবদের তাড়া খেয়ে মাটির নিচে অদৃশ্য হবার চেষ্টা করেছিলেন, তখন তাঁর দেহ পাঁচটি জায়গায় জেগে ছিল। এই পাঁচটি স্থানে তাঁর পাঁচ অঙ্গের পূজা হয়। দেহ কেদারনাথে, নাভি মদ্‌মহেশ্বরে (১১, ৪৭৪ ফুট), বাহু তুঙ্গনাথে (১২, ০২৭ ফুট), মুখ রুদ্রনাথে (১১, ৬৭০) এবং জটা কল্পেশ্বরে। এই পাঁচটি স্থানকে পঞ্চকেদার বলে।

গুপ্তকাশী থেকে ১৫ মাইল দূরে মদ্‌মহেশ্বর চৌখাম্বা শৃঙ্গের নিচে নদীর তীরে অবস্থিত। এই পথে তিন মাইল দূরে কালী নদীর তীরে কালিমটে মহাকালী মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর মন্দির। গৌরীশঙ্কর ও ভৈরবের মন্দিরও আছে। উখীমঠ থেকেও এখানে আসা যায়। তুঙ্গনাথ উখীমঠ থেকে চামোলির পথে ১৮ মাইল দূরে চন্দ্রশিলা পর্বতে উত্তরাখণ্ডের উচ্চতম স্থানে অবস্থিত মন্দির। ভারতে একমাত্র অমরনাথ এর চেয়ে ৬৫০ ফুট বেশি উঁচু। এই মন্দিরে দাঁড়িয়ে যমুনোত্রী থেকে বদ্রীনাথ পর্যন্ত সমস্ত তুষার শৃঙ্গগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। এই পথেই আরও কিছুটা এগিয়ে চতুর্থ কেদার রুদ্রনাথ। তুঙ্গনাথ থেকে মণ্ডল চটিতে নেমে ২ মাইল দূরে

অনসূয়া দেব (৬,৫০০ ফুট) ছাড়িয়ে ৫ মাইল উপরে এই তীর্থ। এই পথেই গোপেশ্বর হয়ে চামোলি পৌঁছতে হয়। চামোলি থেকে বদ্রীনাথের পথে বেলাকুচিতে নেমে ১৫ মাইল দূরে উরগম উপত্যকায় কল্পেশ্বরের মন্দির।

পঞ্চ প্রয়াগ

উত্তরাখণ্ডে প্রয়াগও পাঁচটি। এই পাঁচটি প্রয়াগ পঞ্চপ্রয়াগ নামে অভিহিত, ঋষিকেশ থেকে বদ্রীনাথের পথে ভাগীরথী ও অলকনন্দার সঙ্গমে দেব প্রয়াগ, অলকনন্দা ও মন্দাকিনী সঙ্গমে রুদ্র প্রয়াগ, অলকনন্দা ও পিণ্ডার নদীর সঙ্গমে কর্ণপ্রয়াগ, অলকনন্দা ও নন্দাকিনীর সঙ্গমে নন্দ-প্রয়াগ এবং অলকনন্দা ও ধৌলি নদীর সঙ্গমে বিষ্ণু প্রয়াগ।

পঞ্চবদ্রী

পঞ্চ কেদারের মতো পঞ্চবদ্রীও আছে বদ্রীনাথ অঞ্চলে। বদ্রীনাথ হল বিশালবদ্রী, যোগবদ্রী ১১ মাইল দূরে পাণ্ডুকেশ্বরে, ভবিষ্যবদ্রী যোশীমঠ থেকে ৪ মাইল দূরে তপোবন ছাড়িয়ে, বৃদ্ধবদ্রী যোশীমঠ থেকে পিপল-কোটির দিকে। আর আদিবদ্রী কর্ণপ্রয়াগ থেকে রাণীখেতের পথে ১১ মাইল দূরে। কর্ণপ্রয়াগ থেকে রাণীখেতের দূরত্ব ৬০ মাইল। রাণীখেত থেকেও বদ্রীনাথের পথে বাস যাতায়াত করে।

বদ্রীনাথ

ঋষিকেশ থেকে ১৮৫ মাইল দূরে নর ও নারায়ণ পর্বতের মধ্যে একটি ছোট উপত্যকায় অবস্থিত শ্রেষ্ঠ তীর্থের অন্যতম বদ্রীনাথ (১০, ২৪৪ ফুট)। পুরাকালে এই স্থানের নাম ছিল বদরিকাশ্রম। অনেকের বিশ্বাস যে বেদ ও উপনিষদের কিছু অংশ এইখানে রচিত হয়েছে। মহা-ভারতের কৃষ্ণ ও অর্জুন তাঁদের পূর্ব জন্মে এইখানে নারায়ণ ও নরঋষি রূপে তপস্যা করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে বাস করতেন দেবর্ষি নারদ। মহাভারত

রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস বদ্রীনাথের নিকটে মানা গ্রামের ব্যাস গুহায় বসে বেদ বিভাগ করেছিলেন।

ঋষিকেশ থেকে বাসে সরাসরি বদ্রীনাথে আসা যায়। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে বদ্রীনাথের পথ আলাদা হয়েছে। এই পথে কর্ণপ্রয়াগের পর নন্দ-প্রয়াগ ছাড়িয়ে চামোলির দূরত্ব ২০ মাইল। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে কেদার-নাথের পথ কুণ্ডচটি থেকে আলাদা হয়ে এই চামোলিতে এসে মিলেছে। কাজেই কেদারনাথের যাত্রী এ পথেও বদ্রীনাথে আসতে পারেন। বাণা- সুরের কন্যা উষার নামে উখীমঠ (৪,২০০ ফুট) এই পথে একটি তীর্থস্থান। কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। শিবের মন্দিরে এঁদের পূজা হয় পার্বতী ও মান্ধাতার সঙ্গে। শীতে কেদারনাথ ও মদ্‌মহেশ্বরের মন্দির যখন বরফে আবৃত হয়ে যায়, তখন তাঁদেরও পূজা হয় উখীমঠে।

চামোলি থেকে ২৯ মাইল দূরে যোশীমঠ (৬,১০৭ ফুট)। এখানে কয়েকটি প্রাচীন মন্দির আছে। তার মধ্যে নরসিংহ বাসুদেব ও নবদুর্গার মন্দির প্রধান। শীতের সময় বদ্রীনাথের পূজা হয় এইখানে। কালো পাথরের বিষ্ণু মূর্তিটি সাত ফুট লম্বা। আধ মাইল দূরে পাহাড়ের উপরে জ্যোতেশ্বরে শঙ্করাচার্যের মঠ।

এই অঞ্চলে হেমকুণ্ড-লেকপাল শিখদের তীর্থস্থান। অনতিদূরে ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স নামে নন্দনকানন। গোবিন্দ ঘাট থেকে সেখানে যেতে হয়।

কেদারনাথে শিব ও বদ্রীনাথে বিষ্ণু। বদ্রীনাথের প্রাচীন বিগ্রহ শঙ্করা-চার্য নারদকুণ্ড থেকে উদ্ধার করে তপ্ত কুণ্ডের নিকটে গরুড় গুহায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সাতশো বছর আগে গাড়োয়ালের রাজারা এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন বর্তমান মন্দিরে। মন্দিরের শিখর সোনায় মুড়ে দিয়েছেন ইন্দোরের রাণী অহল্যা বাঈ। গর্ভগৃহে বিষ্ণুর বাম পাশে নর ও নারায়ণ এবং কুবের ডান পাশে। সামনে গরুড়ের মূর্তি রূপার। এই প্রাঙ্গণে লক্ষ্মীর মন্দিরও আছে।

বদ্রীনাথ শহরটি কেদারনাথের চেয়ে বড়ো। বাসস্থানের কোন অভাব নেই। হোটেল রেস্তোরাঁ আছে, ভাল রেস্টহাউস ও ধর্মশালা আছে

একাধিক। অনেক প্রতিষ্ঠানের সুব্যবস্থা আছে। বাস এসে একটা খোলা ময়দানে দাঁড়ায়। মোটরে বা টুরিস্ট বাসে এলে অলকনন্দার পুলের কাছ পর্যন্ত আসা যায়। অপ্রশস্ত পুলের উপরে যানবাহন চলে না। হেঁটে এই মন্দির-শহরে প্রবেশ করতে হয়।

বাজারের রাস্তার উপরেই মন্দিরের বিপুলায়তন গেট শহরের প্রায় সব স্থান থেকেই দেখা যায়। যাত্রীরা তপ্ত কুণ্ডের গরম জলে স্নান করে মন্দিরে প্রবেশ করেন। বদ্রীনাথের মন্দির একেবারে ভিন্ন ধরনের। মন্দিরের চূড়া বা নাটমন্দির দেখা যাবে না। মন্দিরের সিংহদ্বারই সব আড়াল করে রাখে। রাস্তা থেকে অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরের দরজায় পৌঁছতে হয়। দক্ষিণ ভারতের মতো এখানে দূর থেকে দেবতাকে দর্শন করতে হয়। বিষ্ণুর পদ্মাসন মূর্তি, যেন যোগে বসেছেন। দক্ষিণ দেশের নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণেরা এখানে পূজারীর কাজ করেন। তাঁদের হাতেই যাত্রীদের পূজা নিবেদনের বিধি।

এই মন্দিরের আশেপাশেও কয়েকটি দর্শনীয় স্থান আছে। সূর্যকুণ্ডে তপ্তকুণ্ডের মতো উষ্ণ জল। ব্রহ্ম কপালে শ্রাদ্ধ তর্পনাদি হয়। এখানে যাবার পথে অলকনন্দার গান্ধীঘাট। মাইল খানেক দূরে শেষনেত্র, একটি পাথরের উপরে শেষনাগের নেত্র। চরণ পাদুকা মাইল দুই দূরে, এখানে ভগবানের পায়ের চিহ্ন আছে একটি পাথরের উপরে। ভোটিয়াদের গ্রাম মানার উল্টো দিকে মাতা মূর্তি মন্দির। ইনি বদ্রীনাথের মাতা। সরস্বতী নদী যেখানে অলকনন্দার সঙ্গে মিলেছে, সেই সঙ্গমের নাম কেশব প্রয়াগ। তারই নিকটে ব্যাস গুফা। ৫ মাইল দূরে বসুধারা (১২,০০০ ফুট) নামের জল প্রপাত থেকে আরও ৫ মাইল দূরে অলকাপুরীতে অলকনন্দার উৎস। শতপন্থ ও ভগীরথ খড়ক নামের দুটি হিমবাহ থেকে এই নদীর জন্ম। সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল বদ্রীনাথের মন্দিরের পিছনে ২১,৬৫০ ফুট উঁচু চির তুষারাবৃত নীলকণ্ঠ পর্বত। প্রত্যুষের প্রথম আলোয় এই শৃঙ্গটি রূপার মতো ঝকমক করে ওঠে।

কেদার-বদ্রীর পথে ডাকবাংলো আছে ঋষিকেশ দেবপ্রয়াগ শ্রীনগর

রুদ্রপ্রয়াগ কাটা গৌরীকুণ্ড কেদারনাথ উখীমঠ মণ্ডল চামোলি পিপলকোটি যোশীমঠ নন্দপ্রয়াগ কর্ণপ্রয়াগ বদ্রীনাথ ও আরও কয়েকটি স্থানে। টেম্প্‌ল্‌ কমিটির গেস্ট হাউস আছে গৌরীকুণ্ড কেদারনাথ যোশীমঠ ও বদ্রীনাথে। গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর পথে অনেকগুলি ফরেস্ট রেস্টহাউস আছে। কালী কমলিওয়ালার ধর্মশালা ও চটির কোনো অভাব নেই। চটিতে ও দোকানে খাবার পাওয়া যায়। সম্প্রতি হোটেল হয়েছে কেদারনাথ ও বদ্রীনাথে। যানবাহনের মধ্যে বাস ও ট্যাক্সি ডাণ্ডি কাণ্ডি ও ঘোড়া পাওয়া যায় এবং মাল বহনের জন্য পাওয়া যায় ঘোড়া ও কুলি।

পাহাড়ে পথঘাটের কাজ দ্রুত এগোচ্ছে এবং হাঁটার পথ সংক্ষিপ্ত হচ্ছে প্রতি দিন। যাত্রীদের বাসস্থান ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাও ভাল হচ্ছে। কাজেই হিমালয়ের পথে বেরোবার আগে টুরিস্ট অফিস থেকে নতুন সংবাদ সংগ্রহ করা দরকার। হরিদ্বার দেরাদুন কোটদ্বার ঋষিকেশ শ্রীনগর মসুরি ও রাণীখেতে সরকারি টুরিস্ট অফিস আছে।

নেপাল

পশুপতিনাথ

তন্ত্রচূড়ামণির মতে স্বাধীন দেশ নেপাল একটি পীঠস্থান। সতীর জানু পড়েছিল নেপালে। দেবী মহামায়া, তাঁর ভৈরব কপালী। কিন্তু পীঠস্থানটি নেপালের কোথায় তা জানা যায় না। সাধারণের ধারণা যে পশুপতিনাথ এই পীঠস্থানের ভৈরব এবং তাঁর মন্দিরের অনতি দূরে গুহ্যেশ্বরী এই পীঠস্থানের দেবী। সতীর গুহ্যমণ্ডল এখানে পড়েছিল বলেই দেবীর এই নাম হয়েছে। শিবচরিতের মতেও নেপাল মহাপীঠ, সতীর ডান জঙ্ঘা পড়ছিল নেপালে। দেবী মহামায়া বা নবদুর্গা এবং ভৈরব কপালী।

পশুপতিনাথ শিবের জন্য নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডু একটি প্রধান তীর্থে পরিণত হয়েছে। কাঠমণ্ডুতে ও নেপাল সীমান্তে বীরগঞ্জে এয়ারোড্রোম হয়েছে। বাঙলা দেশের রাজধানী ঢাকা এবং কলকাতা পাটনা ও দিল্লী থেকে প্লেন যাতায়াত করে। ট্রেনে রক্সৌল গিয়ে বাসে কাঠমণ্ডু যাওয়া যায়। কিন্তু শিবরাত্রি ছাড়া অন্য সময়ে সরকারী অনুমতি-পত্র সঙ্গে নিতে হয়।

শহর থেকে তিন মাইল দূরে বাগমতী নদীর তীরে পশুপতিনাথের মন্দির। মন্দিরের পিছনে বাগমতী নদী, জল পর্যন্ত বাঁধানো ধাপ নেমে গেছে। এই মন্দির ভারতের কোন মন্দিরের মতো নয়। প্যাগোডার মতো আকার এই মন্দিরের, কিছু বৌদ্ধ প্রভাব আছে। মন্দিরের গম্বুজ নেই, শিখরও নেই, তার বদলে চতুষ্কোণ ছাদ আছে তিনতলা। সূর্যকিরণে সোনার পাত ঝকমক করে। নিচে চারটি দ্বার উন্মুক্ত, কিন্তু ভিতরে প্রবেশের নিয়ম নেই। সকল যাত্রীকে দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে দেবতার দর্শন করতে হয়। পূজারী ভিতরে দাঁড়িয়ে ভোগ নিবেদন করে ফিরিয়ে দেন।

পশুপতিনাথের লিঙ্গমূর্তি, কিন্তু বৈদ্যনাথ বিশ্বনাথের মতো নয়। ভারতের কোন শিবলিঙ্গই এ রকম নয়। চারি ধারে চারটি মুখ আছে শিবলিঙ্গের। পঞ্চম মুখটি বোধহয় উপরে, তা দেখা যায় না। যাত্রীরা কেউ বলেন চার মুখ, কেউ পাঁচ মুখ বলেন। আরতির সময়ে নাকি পাঁচ মুখে পাঁচটি মুকুট পরানো হয়। পৌরাণিক মতে শিবের পাঁচ মুখ ও তিন চোখ—পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং।

বাহন নন্দীর স্থান মন্দিরের বাহিরে, বিরাট নন্দী। অন্য একটি মন্দিরে বীরভদ্র আছেন, আছেন আরও দেব দেবী। নেপালের রাজাদের মূর্তিও আছে।

এখান থেকে বেরিয়ে একটি পাহাড়ী নদীর ধারে ধারে খানিকটা পথ উপরে উঠে গেলে গুহ্যেশ্বরী মন্দির। নিচে রাস্তা থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজা। তারপর প্রাঙ্গণ। ছোট একটি মন্দিরে গুহ্যেশ্বরী দেবীর অধিষ্ঠান। কোন মূর্তি নয়, চিত্র নয়, একটি কুণ্ডের মধ্যে আছে জল, সেই জলের উপরেই দেবীর পূজা হচ্ছে।

মহাভারতের অর্জুন গোকর্ণ তীর্থে পশুপতিনাথ দর্শন করেছিলেন। গোকর্ণই কাঠমণ্ডু কিনা কে জানে।

তিব্বত

মানস সরোবর ও কৈলাস

একদা শুধু নেপাল নয়, মানস সরোবর ও কৈলাসও ছিল ভারতবর্ষের অন্তর্গত। কুবেরের বাস ছিল কৈলাসে। বনবাসের সময়ে পঞ্চপাণ্ডব এই অঞ্চলে এসেছিলেন। দ্রৌপদীর জন্য পদ্মসংগ্রহ করতে কুবেরের সৈন্যের সঙ্গে ভীমের যুদ্ধ হয়েছিল। কুবের শাপমুক্ত হয়েছিলেন বলে ভীমকে ক্ষমা করেছিলেন। পরবর্তী কালে এই অঞ্চলের নাম হল কিম্পুরুষ বর্ষ। এখন এই দেশের নাম তিব্বত, ভারতের সঙ্গে তার যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সম্প্রতি খুলে দেওয়া হয়েছে এই তীর্থ পথ।

কিছুদিন আগে যাত্রীরা ইচ্ছা মতো মানস সরোবর ও কৈলাসে তীর্থ করতে যেতেন। সেখানে যাবার তিনটি পথ ছিল। সবচেয়ে জনপ্রিয় পথ আলমোড়া থেকে গার্বিয়াং হয়ে লিপুলেক পাস পেরিয়ে। বদ্রীনাথ থেকে মানা পাস পেরিয়েও যাওয়া যেত, আর যাওয়া যেত যোশীমঠ থেকে ধৌলি নদীর উপত্যকা ধরে নিতি পাস ডিঙিয়ে।

তিব্বতের মালভূমিতে এক দিকে রাক্ষসতাল, অন্য দিকে মানস সরোবর (১৪,৯৫০ ফুট)। এরই মাঝখান দিয়ে কৈলাসের পথ। ২২,২০৮ ফুট উঁচু কৈলাস শৃঙ্গ একটি শিবলিঙ্গের মতো। ভারত-তিব্বত সীমান্ত থেকে মানস সরোবরে পৌঁছতে তিন দিন সময় লাগত। চতুর্থ দিনে কৈলাস পরিক্রমা করে সীমান্তের দিকে আসতে সময় লাগত দশ বারো দিন।

রাক্ষসতাল থেকে মানস সরোবরের দূরত্ব মাত্র দেড় মাইল। সেখানে প্রকৃতির এক বিরাট নগ্ন রূপ। নিরাবরণ পৃথিবী যেন শ্রান্ত দেহে বিশ্রামরত। ভোগের বাসনা এখানে জাগে না, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো আজীবন তপস্যার কথা মনে আসে। সত্যিই এই রূপের কোন তুলনা নেই। পৌরাণিক মতে মানস সরোবর একটি পীঠস্থান। সতীর দক্ষিণ হাত পড়েছিল এখানে। দেবী দাক্ষায়ণী, তাঁর ভৈরব অমর।

কৈলাস তিব্বতীদেরও পরম তীর্থ। বারো বছর পর পর তাদের কুম্ভের মতো যোগ আসে। মানস সরোবরের চারিদিকে ও কৈলাস পরিক্রমার পথে বৌদ্ধ লামাদের অনেক গোম্ফা আছে। তিরিশ মাইল পরিক্রমা করতে তিন দিন সময় লাগে। পথে গৌরীকুণ্ড। আধ মাইল পরিধির এই কুণ্ডটি সারা বছরই বরফে আচ্ছন্ন থাকে। কৈলাসের তুষারাবৃত শৃঙ্গ থেকে যে বরফের পাহাড় নেমে এসে গৌরীকুণ্ডের প্রান্তে মিলেছে, তার নাম পিনাক। এই দৃশ্য দেখে মনে হবে যে এত দিন যা দেখেছি সবই মিথ্যে, সত্য শুধু কৈলাস। পৃথিবীর এমন রূপ এর আগে আর কোথাও বুঝি দেখি নি। মনে হবে, এর চেয়ে বড় তীর্থ পৃথিবীতে আর নেই। তীর্থ আর দেবতা এখানে এক হয়ে গেছেন। এই তো প্রকৃত তীর্থ। প্রকৃতিই দেবতা।

সমাপ্ত